দুঃসাহসী রঞ্জু

সম্পাদনা

অজয় দাশগুপ্ত

সুবর্ণা প্রকাশনী
৬এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০৭৩

অপরাজেয়

প্র থ ম   অ ধ্যা য়

অন্ধকার—শুধুই অন্ধকার

॥ এক ॥

ভোর দেখে দিনের আভাস আঁচ করা যায় কিনা, বলা মুশকিল। তবে ঝালদিয়া হাইস্কুলে যে নতুন ছেলেটি এসে ভর্তি হলো, তার দুঃস্থ বাল্যজীবনে এমন কোনও অসাধারণ বৈশিষ্ট্য বা অস্বাভাবিকতা নজরে পড়েনি, যা থেকে তার পরবর্তী কালের বিচিত্র জীবনের নিশানা মিলতে পারে।

নতুন এই ছেলেটি অর্থাৎ রঞ্জু বা রঞ্জনকুমার চৌধুরী এসে ভর্তি হলো ঝালদিয়া হাইস্কুলের ক্লাস ফাইভে। বয়স আর কত হবে—বড়জোর দশ-এগারো বছর। অন্য এক জেলা থেকে সে এসেছে। মামাবাড়িতে থেকে পড়াশুনো করবে।

নতুন স্কুল। চার দিকে নতুন অচেনা মুখ। কিন্তু ছেলেটির মধ্যে তার স্বভাবে ও চালচলনে হয়তো এমন কিছু আছে, যাতে অল্পদিনের মধ্যেই সে বেশ মানিয়ে নেয় পরিবেশের সঙ্গে, আপন করে নেয় সবাইকে।

রঞ্জুর সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা জন্মায় কুনালের সঙ্গে। তারপর এ বয়সে যা সচরাচর ঘটে, ঘনিষ্ঠতা গভীর অন্তরঙ্গতায় পৌঁছুতে বিশেষ সময় লাগে না। কিছুদিনের মধ্যেই অভিন্নহৃদয় বন্ধু হয়ে দাঁড়ায় দুজনে।

খেলাধুলো, দৌড়ঝাঁপ, সাঁতার ইত্যাদিতে রঞ্জুর স্থান সবসময় মোটামুটি প্রথম সারিতে। ইস্কুলে ভর্তি হবার কিছুকাল পর থেকেই শরীরচর্চা, বক্সিং, সাঁতার ইত্যাদির দিকে তার বিশেষ ঝোঁক শুধু ছাত্রদের নয়, শিক্ষকমশাইদেরও কারও-কারও নজর এড়ায় না। কাজের চাপে বা ঝঞ্ঝাটে নিয়মিত হাজিরা হয়তো সম্ভব হয় না, তবে সুযোগ পেলেই সে চলে আসে ইস্কুলের ব্যায়ামাগারে।

আধময়লা ছেঁড়া সেলাই-করা শার্ট-হাফ প্যান্ট আর ছেঁড়া চপ্পল এটাই রঞ্জুর বিশেষ-অবিশেষ নির্বিশেষে সর্বক্ষণের পোশাক। তা নিয়ে যে দ্বিধা সঙ্কোচ বা অভিযোগ থাকতে পারে, রঞ্জুর হাবভাবে তা কখনই মনে হয় না।

কুনাল বা অন্যদের কাছেও এটা অস্বাভাবিক বা অবাক হবার মতো কিছু নয়। বিস্তারিত না জানলেও, এতদিনে সবাই প্রায় মোটামুটি জেনে গেছে যে, রঞ্জুর মা-বাবা নেই, সে অনাথ ও নিরাশ্রয়, আর গরিবের সন্তান তো বটেই। কী করে জেনেছে বলা শক্ত, তবে জেনেছে। তাই তো এরকম দুঃস্থ মামার আশ্রয় তাকে নিতে হয়েছে।

নিদারুণ অভাব-অনটনের সংসার তার মামা অনাদিবাবুর। চার নাবালক ছেলেমেয়ে, স্ত্রী ও নিজে, এ ছজনের সংসার নিয়ে যার সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়ার অন্ত নেই, নিরুপায় এ নিঃসম্বল না হলে কেউ কি কখনও তাঁর ঘাড়ে এসে চাপে? কাজেই রঞ্জুর সাজ-পোশাকের ও দুরবস্থায় ছাত্রেরা অবাক হয় না, অনেকে বরং সমবেদনা বোধ করে।

রঞ্জু কিন্তু নির্বিকার।

বন্ধুর জীর্ণমলিন জামাকাপড়ে কুনাল কষ্ট পেলেও চুপ করে থাকে, দেখে-দেখে চোখে ওটা সয়েও গেছে। তা ছাড়া সে করবেই বা কি! কিন্তু যা তার মনকে প্রচণ্ড নাড়া দেয়, তা হলো সময়-সময় রঞ্জুর আকস্মিক ভাবান্তর। মাঝে-মাঝে রঞ্জু অন্যমনস্ক হয়ে যায়, কী

এক চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকে। সে সময় প্রায়ই কী এক ব্যথায় থমথম করতে থাকে তার চোখমুখ।

ঝালদিয়া বেশ বড় বর্ধিষ্ণু গ্রাম। স্কুলটা তার প্রায় মাঝখানে বলা যায়। কুনালদের বাড়ি পুবপাড়ায় আর রঞ্জুর মামার বাড়ি পশ্চিম পাড়ায়। স্কুল বসার আগেই কুনাল এসে গেটে দাঁড়িয়ে থাকে রঞ্জুর প্রতীক্ষায়। দূর থেকে কুনালকে দেখে রঞ্জুর মুখে হাসি ফোটে। গতিও দ্রুততর হয়। এটা প্রায় নিত্যকার ঘটনা।

কিন্তু এক-একদিন কি যে হয়! দূর থেকে রঞ্জুকে মনে হয় বড় ক্লান্ত বিষণ্ণ। দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে কি এক কষ্ট। কেমন যেন বিহ্বল সে।

এসব অন্যদের নজরে পড়ে কিনা সন্দেহ, কিন্তু কুনালের চোখ এড়ায় না। রঞ্জুর কেন এই ভাবান্তর, কিসের চিন্তায় সে ডুবে থাকে, কী তার কষ্ট—জানার জন্যে সে ছটফট করতে থাকে। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। রঞ্জু চুপ করে থাকে। সময় সময় কথার মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়। কখনও বা বিব্রত কণ্ঠে বলে,—যেতে দে ভাই, ওসব কথা থাক।

সেদিন কুনালের পীড়াপীড়িতে একটু উত্যক্ত হয়ে সে বললে,—আমার জন্যে তুই কেন এত ভাবিস, বল তো? যে অভাগা, যাকে জন্ম-অভাগাই বলা যায়, তার তো কষ্ট থাকবেই। সেসব শুনে বা বলে কি লাভ? ওসব নিয়ে শুধু শুধু মাথা ঘামাসনে, বুঝলি।

রঞ্জু সম্বন্ধে কুনাল সব কিছুই বলে মাকে, সুযোগ পেলে বাবাকেও। কুনালরা এক ভাই এক বোন। বোন মঞ্জু কুনালের পাঁচ বছরের ছোট। রঞ্জুর কথা শুনতে-শুনতে ছোট্ট বুকটা তার ব্যথায় ভারি হয়ে ওঠে। মা সাবিত্রী দেবী নীরবে শোনেন, কোন মন্তব্য করেন না। কখনো বা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

সেদিনও কুনাল এসে জানাল রঞ্জু যা বলেছে। শেষে বললে,—জানো মা, রঞ্জুকে দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল। চোখ মুখ বসে গেছে, রাতে যেন ঘুমোয়নি, বোধহয় না খেয়েই স্কুলে এসেছে।

সাবিত্রী দেবী আজ আর চুপ করে থাকতে পারেন না। হাজার হোক, মায়ের মন তো। মৃদুকণ্ঠে বলেন,—আহা, সত্যিই ছেলেটা অভাগা। এমন মামার ঘরে এসে তাকে উঠতে হয়েছে, যার নিজেরই দিন চলে না। ও এখন মামার মস্ত গলগ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোদের বাবার কাছে শুনেছি, ছেলেটি নাকি অনাথ। ওর মামার ধরাপড়ায় স্কুলে ওকে শেষ পর্যন্ত হাফ-ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে, যদিও মামা চেয়েছিলেন পুরো ফ্রি করতে। মাসে-মাসে ও কটা টাকা দেবার সামর্থ্যও তাঁর নেই। পারিস তো ছেলেটিকে একদিন নিয়ে আসিস।

কুনালের বাবা নিরঞ্জন মজুমদার এ অঞ্চলের একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ, নামকরা ডাক্তার। পাশেই জেলার সদর শহরে তাঁর বড় ডিসপেনসরি। ঝালদিয়া হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটিরও তিনি অন্যতম সভ্য।

মায়ের কথার জবাবে কুনাল বলে,—হুঁ কতবার তো ওকে আনার জন্যে টানাটানি করেছি, কিন্তু ও কিছুতেই আসবে না। কারও বাড়িতেই যায় না।

তা হতে পারে। —কাজ করতে করতে শান্তকণ্ঠে বললেন সাবিত্রী দেবী, লজ্জা-সঙ্কোচ আছে তো! তোর কাছে যা শুনি, তা থেকে মনে হয়, নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে ও খুব ভাবে। ঈস্, কতটুকুনই বা বয়েস, দুধের বাচ্চা! এই বয়েসেই ওকে ভাবতে হচ্ছে এসব কথা।

॥ দুই ॥

কুনাল-রঞ্জুরা এখন সিক্স-এ উঠেছে। আর মঞ্জু দ্বিতীয় শ্রেণীতে।

সেদিন ছুটির দিন। ছেলেমেয়ে নিয়ে নিরঞ্জনবাবু খেতে বসেছেন। এটা-ওটা নানা কথা হচ্ছে, আর কুনাল উসখুস করছে।

শেষে আর থাকতে না পেরে সে বললে,—জানো, কাল না একটা খুব খারাপ খবর শুনলাম। ছুটির পর স্কুলে ফুটবল টিম গড়া নিয়ে একটা মিটিং ছিল। রঞ্জু কিছুতেই টিমে থাকতে রাজি না। অথচ সে না থাকলে টিমের জোর কমে যাবে। সে কিন্তু কিছুতেই বলবে না, কেন রাজি না। তেমনি ক্যাপ্টেন সুবোধদাও ছাড়ার পাত্তর না। অনেকক্ষণ টানাহ্যাঁচড়া চললো। মিটিংয়ে গেম-স্যার ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হয়েছে, তাঁকে এটা জানানো হবে।

সাবিত্রী দেবী বললেন,—এতে অবাক হবার কি আছে? হয়তো পড়াশুনোর ক্ষতি—

কুনাল বাধা দিলে,—আহা, শোনোই না আগে! মিটিংয়ের পর শম্ভু আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে বললে, রঞ্জুদা রাজি না, কেন জান? শম্ভু ক্লাস ফাইভে পড়ে। বললে, রঞ্জুদার মামার বাড়িতে কখনও গেছ? গেলে, সব বুঝতে পারতে। রঞ্জুদার মামি না খুব দজ্জাল —সাংঘাতিক ঝগড়াটে বদরাগী। তার মুখের জ্বালায় আশপাশের সব বাড়ির লোকেরা সবসময় তটস্থ। আর রঞ্জুদার কপালে তো দিন-রাত্তির দূর-ছাই লেগেই আছে। সে সব যদি শুনতে—উঠতে বসতে শুতে সে যে কী গালাগালি! রঞ্জুদা নাকি অপয়া অলুক্ষুণে, বাপ-মাকে খেয়েছে, এখন মামা-মামিকে খাওয়ার জন্যে ঘাড়ে এসে চেপেছে। খেতে বসলেও খোঁটা। দিনদিন রঞ্জুদার নাকি মোষের মতো চেহারা হচ্ছে, আর তার বিষনজরে পড়ে মামির বাছারা সব শুকিয়ে যাচ্ছে।

ঘরের কারও মুখে কথা নেই। সবাই স্তম্ভিত।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে কুনাল বলে চলে,—শম্ভু বললে, রঞ্জুদা ব্যায়াম করে, ইস্কুলের খেলাধুলো স্পোর্টসে নাম করেছে, ওর মামি তা সহ্য করতে পারে না, সাংঘাতিক সব কুকথা বলে। বলে—লজ্জা শরমের বালাই নেই, পরের ঘাড়ে চেপে রক্ত শুষে খাচ্ছে; কোথায় একটু সাহায্য করবে, তা না শুধু মস্তানি করে বেড়ানো।

বলতে-বলতে কুনালের গলা বুজে আসে। নিরঞ্জনবাবু গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, —তা শম্ভু এসব জানলো কি করে?

কুনাল বললে,—ব্যথায় তার গলা কাঁপছে,—আমিও সেকথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। শম্ভু বললে, বারে, আমাদের তো পাশাপাশি বাড়ি, মাঝে শুধু একফালি ফাঁকা জমি। শুধু কি আমরা, পাড়ার সবাই এসব জানে। মা-বাবা বড়োরা দুঃখ করেন, ইস অমন ছেলেটা শেষ হয়ে গেল! শম্ভু বললে, রঞ্জুদার মামির গলাটা তো শোননি। হঠাৎ প্রথম শুনলে আঁতকে উঠবে, ভাঙা কাঁসরের মতো দিন রাত্তির—

নিরঞ্জনবাবু বাধা দেন,—সংসারের কাজকর্মে রঞ্জু সাহায্য করে না? করা উচিত কিন্তু। এত দুরবস্থার মধ্যেও মামা যখন তার ভরণ-পোষণ চালাচ্ছেন—

বাধা দিয়ে অধীর কণ্ঠে কুনাল বলে,—হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমিও শম্ভুকে ঠিক ওই কথাটাই জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে কি বললে, জান? বললে, করে না আবার! রঞ্জুদা পড়ার সময় কখন পায়, সেটাই তো আশ্চর্য। সংসারের সমস্ত ফাইফরমাশ তো আছেই, সেইসঙ্গে চার ছোট মামাতো ভাইবোনের দেখাশুনোর ভারও তার। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মামির এসব

কথার উত্তরে রঞ্জু কি বলে? শম্ভু হাসতে-হাসতে বললে,—কিচ্ছু না। স্কুলে রঞ্জুদার গলা তবু শুনতে পাও, কিন্তু বাড়িতে একদম চুপ। মামির গালাগালির মধ্যেই জল তুলছে, ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, বাসন মাজছে, মামাতো ভাইবোনদের তদারক করছে, মুদিখানায় বা হাটবাজারে দৌড়চ্ছে, সব মুখ বুজে।

অ্যাঁ, রঞ্জুদা ঘরদোর ঝাঁট দেয়, বাসন মাজে! —মঞ্জু যেন আর্তনাদ করে উঠলো।

নিরঞ্জনবাবুর ভ্রূ কুঁচকে গেছে। কয়েক মুহূর্ত থেমে প্রশ্ন করেন,—তা, এ ব্যাপারে ওর মামা কিছু বলেন কিনা জিজ্ঞেস করেছিলি?

কুনাল ঘাড় কাত করে সায় দেয়,—হ্যাঁ। শম্ভু ঠোঁট বেকিয়ে বলেছিল, ওর মামার কথা আর বলো না। উনি তো ভীতুর ডিম। বড়োদের বলতে শুনেছি, বৌয়ের কাছে উনি একেবারে কেঁচো।

উঃ! এ যে শোনা যায় না! —ব্যথা ঝরে পড়ে সাবিত্রী দেবীর গলা থেকে ঃ কোন মা যে এরকম হতে পারে বিশ্বাস করা কঠিন। এর দশভাগের একভাগ সত্যি হলেও কী দুর্গতি ছেলেটার!

অদেখা রঞ্জুর জন্যে কষ্ট তখন অশ্রু হয়ে মঞ্জুর গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে।

নিরঞ্জনবাবু অসম্ভব গম্ভীর। একসময় ধীরে-ধীরে বললেন,—খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে, এসব কতটা সত্যি। তা ছাড়া ছেলেটার মা-বাবা নেই। অনাদিবাবু ওর মামা—স্বাভাবিক অভিভাবক। সে ক্ষেত্রে আমাদের মতো নিঃসম্পর্কীয় বাইরের লোক কতটুকু কি করতে পারে, বুঝতে পারছি নে। হিতে বিপরীত না হয়। যাই হোক, ভাবতে হবে।

॥ তিন ॥

দিন যায়। মন্থর ছন্দে কেটে চলে গ্রামের জীবন। কোনও পরিবর্তন চোখে পড়ে না।

স্কুলের সামনে সেদিনও কুনাল যথারীতি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু রঞ্জু এল না।

কি হলো? কুনাল প্রথমে অবাক হয়, তারপর শুরু হয় চিন্তা। রঞ্জু এল না কেন? আজ পর্যন্ত সে তো একদিনও স্কুল কামাই করেনি।

কুনালের মন অস্থির। ক্লাসের পড়া ঠিকমতো মাথায় ঢোকে না।

টিফিনের ঘন্টা পড়তে না পড়তেই সে দৌড়লো শম্ভুর খোঁজে। শম্ভুর কাছ থেকে যা শুনলো, তাতে তার মাথা ঘুরে যায়। রঞ্জু গতকাল রাত থেকে জ্বরে বেহুঁশ। শম্ভু বাড়িতে থাকা পর্যন্ত ডাক্তারবদ্যির কোনও ব্যবস্থা হয়নি। তারই মধ্যে সমানে চলেছে ওর মামির বকাঝকা-গঞ্জনা। তা থেকে শম্ভুদের মনে হয়েছে, গত দু-তিন দিন ধরে রঞ্জুর জ্বর চলছে।

বিস্তারিত শোনার জন্যে কুনাল আর দাঁড়ায় না; যেভাবে হোক, ছুটি তাকে এক্ষুণি পেতে হবে। একদৌড়ে হেডমাস্টারের ঘরের সামনে এসেই সে থমকে দাঁড়ালে। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটছে। হেডস্যার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডস্যার বিষম রাশভারি লোক। ছাত্ররা, বিশেষ করে নিচু ক্লাসের ছাত্রেরা পারতপক্ষে তাঁদের ছায়া মাড়ায় না।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলেও তো চলবে না। একপা একপা করে কুনাল গিয়ে ঢুকলো হেডস্যারের ঘরে। জিব-গলা শুকিয়ে বুঝি কাঠ হয়ে গেছে।

হেডমাস্টারমশাই চোখ তুলে তাকালেন,—কি চাই?

তোতলাতে-তোতলাতে আড়ষ্ট কণ্ঠে কুনাল বললে রঞ্জু সম্বন্ধে এইমাত্র যা শুনেছে শম্ভুর কাছ থেকে।

মৃদু হেসে হেডমাস্টারমশাই বললেন,—হুঁ, তুমি আর রঞ্জন বুঝি খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু? তা, রঞ্জনের অসুখে তোমার অত উতলা হবার কি আছে? তার মামা-মামি তো আছেন, তাঁরাই ব্যবস্থা করবেন।

নিরুপায় কুনাল। কি করবে, ঠিক করতে পারে না। কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে থেকে শেষে বাধ্য হয়ে তেমনি তোতলাতে-তোতলাতে সে সংক্ষেপে খুলে বললে রঞ্জুর ওপর তার মামির লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কথা—যা সে অদ্যাবধি জানতে পেরেছে।

শুনতে-শুনতে হেডমাস্টারমশাই বুঝি গুম হয়ে যান। কুনালের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,—বুঝলাম। কিন্তু বাবা, রঞ্জনের অসুখের ব্যাপারে তুমি কি করবে?

ব্যাগ্রকণ্ঠে কুনাল বললে,—ছুটি পেলে এক্ষুণি স্যার, বাড়ি যাবো। বাবা এখন বাড়িতেই আছেন। তাঁকে বলবো রঞ্জুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে।

মুহূর্তে হেডমাস্টারমশাইয়ের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বললেন,—ও-হো, মনেই ছিল না, তুমি নিরঞ্জনবাবুর ছেলে। বেশ, বেশ তাই যাও বাবা।

খুশিতে ঝলমল করে উঠলো কুনালের চোখমুখ। একলাফে সে হেডস্যারের পায়ে টিপ করে এক প্রণাম সেরেই, দ্বিতীয় লাফে ঘরের বাইরে এসে পড়লো। তারপর দে ছুট।

কুনাল ছুটছে তীরবেগে। পনেরো সেকেন্ডে বোধহয় পার হয়ে গেল পনেরো মিনিটের পথ।

ঘর্মাপ্লুত কলেবরে সে যখন বাড়ি এসে পৌঁছোয়, দম তার ফুরিয়ে যাবার জোগাড়। এই অসময়ে তাকে ওই অবস্থায় ফিরতে দেখে সাবিত্রী দেবী তো বিষম উদ্বিগ্ন। নিরঞ্জনবাবুও উৎকণ্ঠায় বিছানায় উঠে বসলেন।

রুদ্ধশ্বাসে কুনাল বলে গেল সব ঘটনা। বলতে-বলতে সে কেঁদে ফেলে।

নিরঞ্জনবাবু নীরব। চিন্তামগ্ন।

তারপর তিনি নামলেন খাট থেকে। তাড়াতাড়ি বেশবাস পালটে নিধুর হাতে ঢাউস ডাক্তারি ব্যাগটা দিয়ে কুনালকে বললেন,—চলো। আগে চলো তোমাদের স্কুলে।

বেরুবার মুখে সাবিত্রী দেবীকে বলে গেলেন,—বুঝতে পারছি নে, ছেলেটিকে শেষ পর্যন্ত এখানে এনে তুলতে হবে কিনা। মনে-মনে তৈরি থেকো।

মঞ্জুর মর্নিং স্কুল। সে ঘুমুচ্ছে। এসবের কিছুই সে জানতে পারলো না।

স্কুলে এসে নিরঞ্জনবাবু একান্তে আলোচনায় বসেন হেডমাস্টারের সঙ্গে। ইতিহাস ও অঙ্কের দুই প্রবীণ শিক্ষকও যোগ দেন সে আলোচনায়। তাঁরা স্থানীয় বাসিন্দা এবং অনাদিবাবুর পারিবারিক ব্যাপারও জানেন কিছু-কিছু। শম্ভুকে ডেকেও জিজ্ঞেস করা হয়।

শেষে ইতিহাস ও অঙ্কের দুই শিক্ষককে নিয়ে নিরঞ্জনবাবু রওনা হলেন অনাদিবাবুর বাড়ির দিকে। কুনাল ও নিধু ছাড়াও শম্ভু গেল সঙ্গে।

অনাদিবাবুর বাড়ির কাছাকাছি হতে মাঝে-মাঝে তাঁদের কানে আসতে থাকে এক তীক্ষ্ণ খনখনে নারীকণ্ঠ। অর্গলবদ্ধ ঘরের ভেতর থেকে আসা সে কণ্ঠ কার যেন বাপান্ত করছে, চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছে আর ধিক্কার জানাচ্ছে নিজের ভাগ্যকে। চূড়ান্ত দৈন্যের ছাপ বাড়িটার সর্বাঙ্গে।

দরজায় টোকা মারতেই নারীকণ্ঠ চুপ। দরজা খুলে বাইরে এসে আগন্তুকদের দেখেই অনাদিবাবুর চোখ কপালে উঠলো। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা! তাঁর দরজায় এঁদের উপস্থিতি তিনি বুঝি কল্পনাও করতে পারেন না।

নিরঞ্জনবাবু সংক্ষেপে তাঁদের আসার কারণ জানাতেই তটস্থ হয়ে উঠলেন তিনি। সাদরে নিয়ে গেলেন ভেতরে।

প্রায়ান্ধকার ঘরে বড় একটা খাটের দূর প্রান্তে ঘোমটা টেনে বসে আছেন একজন মহিলা। তার পরে চারটি ছোট ছেলেমেয়ে পরপর ঘুমিয়ে আছে। কনিষ্ঠটি একেবারেই শিশু। খাটের এ প্রান্তে, বোঝা যায়, অনাদিবাবুর বিছানা।

আর স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা মাটির মেঝেয় এক শতছিন্ন মাদুরের ওপর ততোধিক ছেঁড়া ময়লা কাঁথায় আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে কিশোরবয়সী একটি ছেলে। সে-ই যে রঞ্জু, তা বুঝতে নিরঞ্জনবাবুর অসুবিধা হয় না।

কান্নাভেজা গলায় 'রঞ্জু' বলে কুনাল তার দিকে ছুটে যেতেই, নিরঞ্জনবাবু বাধা দিলেন, —খুব কাছে যেও না, খোকন। কি রোগ, ছোঁয়াচে কিনা আগে পরীক্ষা করতে হবে।

কুনালের বুক ঠেলে কান্না উথলে উঠছে। অস্ফুটে সে ডেকে চললো,—রঞ্জু... রঞ্জু... রঞ্জু...

অনাদিবাবু এদিকে মহাবিব্রত। মাননীয় আগন্তুকদের কোথায় বসাবেন, ভেবে পাচ্ছেন না। ঘরে একখানামাত্র হাতলভাঙা নড়বড়ে চেয়ার।

নীরস কণ্ঠে তাঁকে নিরস্ত করে, জানলাগুলো খুলে দিতে বলে নিরঞ্জনবাবু রোগীর পাশে বসতে যেতেই, শশব্যস্তে একটা ছেঁড়া শতরঞ্চি বিছিয়ে দেন অনাদিবাবু।

প্রথম নজরেই অসুস্থ ছেলেটিকে ভাল লেগেছে নিরঞ্জনবাবুর। দেখলে কেমন যেন মায়া হয়। নিবিষ্ট চিত্তে তিনি পরীক্ষা করেন রঞ্জুকে। গায়ে তার ধুম জ্বর। শ্বাসপ্রশ্বাসে খুব কষ্ট। বুকেও যথেষ্ট শ্লেষ্মা জমেছে।

অনাদিবাবু ও শিক্ষকমশাই দু-জনকে নিয়ে নিরঞ্জনবাবু শেষে ঘরের বাইরে এলেন এবং জানালেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস রঞ্জু ব্রংকোনিউমোনিয়ায় আক্রান্ত এবং আক্রমণটা যথেষ্ট গুরুতর। এখুনি ঠিকমতো চিকিৎসা ও ওষুধপথ্যাদির ব্যবস্থা না করলে মারাত্মক হবার বিশেষ সম্ভাবনা।

অনাদিবাবুর মাথায় বুঝি আকাশ ভেঙে পড়ে। দু-হাত কচলাতে-কচলাতে ককাতে-ককাতে তিনি যা বললেন, তার সারমর্ম হলো, তাঁর মতো নিঃসম্বল মানুষের পক্ষে যেখানে একবার ডাক্তার ডাকারই সামর্থ্য নেই, সেখানে এত বড় রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা কী করে সম্ভব?

নিরঞ্জনবাবু চিন্তা করেন কয়েক লহমা, তারপর বললেন,—তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু রোগ তো তা শুনবে না। তা আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো, রঞ্জুকে আমি নিজের বাড়িতে নিয়ে চিকিৎসা করতে পারি।

আপত্তি! অনাদিবাবুর কাছে অভাবনীয় এ প্রস্তাব, আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো। তবু কেমন যেন একটু ইতস্তত ভাব। পরক্ষণে 'একটু সবুর করুন ডাক্তারবাবু' বলেই তিনি সাঁৎ করে ঢুকে গেলেন ভেতরে।

দরজার আড়ালেই দাঁড়িয়ে ছিলেন গৃহকর্ত্রী। ফিসফিস করে বললেন,—এক্ষুণি রাজি হয়ে যাও। আপদ বিদেয় করো।

ফিসফিস করে বললেও খনখনে সে ভাঙা গলার এমনি মাহাত্ম্য যে, অন্যদের তা কানে যেতে অসুবিধে হয় না।

এদিকে ঘুম থেকে উঠে মঞ্জু মায়ের মুখে খবরটা শুনেই সেই যে পাঁচিলের বাইরে রাস্তার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে, আর ভেতরে ঢোকেনি।

শেষে একসময় দূরে পশ্চিমে রাস্তার বাঁকে, সে দেখলে, বাবা, দাদা, নিধুদা এবং আরও কয়েকজন লোক কাকে যেন ধরাধরি করে নিয়ে আসছে। সে ছুটলো বাড়ির ভেতরে মাকে খবর দিতে।

আলোর আভাস

॥ এক ॥

রঞ্জুকে প্রথম দেখেই সাবিত্রী দেবীর মাতৃহৃদয় ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠেছিল। ছেলেটির চোখেমুখে এমন মিষ্টি আলগা একটা শ্রী যে, মন কিছুতেই মানতে চায় না, সে শিক্ষাদীক্ষাহীন গরিব ঘরের ছেলে। তবু মনকে তিনি বুঝিয়ে দেন, বাস্তব জীবনে কি সম্ভব আর কি সম্ভব নয়, বলা মুশকিল। অধম হাভাতে ঘরেও যে অদ্ভুতসুন্দর পদ্মফুল ফুটতে পারে, ইতিহাসে তার ভূরিভূরি নজির আছে। সে যাই হোক, ওসব পরের কথা। ছেলেটার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা আগে দরকার।

এখানে এসে রঞ্জুর অবস্থার কিন্তু আরো অবনতি ঘটলো। আগে থেকেই রোগের আক্রমণ ছিল গুরুতর। তার প্রকোপ আরও বেড়ে গেল।

নিরঞ্জনবাবু চিন্তিত। সাবিত্রী দেবীরও দৈনন্দিন কাজকর্মে এলোমেলো দশা। রঞ্জুকে নিয়েই কাটে তাঁর বেশির ভাগ সময়। তেমনি মাথায় উঠেছে কুনাল ও মঞ্জুর সব রুটিন। সকালে মঞ্জুর আর দুপুরে কুনালের স্কুলে না গিয়ে উপায় নেই। বাদবাকি সময় দুজনেই হাজির রঞ্জুর খাটের পাশে।

দিন যায়। সঙ্কটের ভিতর দিয়ে রঞ্জু চলেছে। এক-এক সময় তা এত গুরুতর হয়ে দাঁড়ায় যে, নিরঞ্জনবাবুরও হাল ছেড়ে দেবার মতো অবস্থা।

শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি মানুষের জয় হয়। জয় হয় বুকভরা ভালোবাসা ও চেষ্টাযত্নের। রঞ্জুর অবস্থা মোড় নিলো ভালোর দিকে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন নিরঞ্জনবাবু ও সাবিত্রী দেবী।

সেদিন দুপুরে সাবিত্রী দেবী রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত। এক ছুটে মঞ্জু গিয়ে পেছন থেকে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলে,—আচ্ছা মা, ওকে আমি কি বলে ডাকবো?

—কাকে? রঞ্জুকে? কেন, সোনাদা।

অ্যাঁ, সোনাদা? —মঞ্জু নেচে উঠলো ঃ বাঃ বাঃ! সোনাদা—কী মিষ্টি নাম! তুমি না, মা, ভারি সুন্দর নাম দিতে পার।

পরক্ষণে নাচ থামিয়ে ভারিক্কি চালে আবার বলে,—ঠিকই বলেছ মা, সোনাদার নাম সোনাদাই হওয়া উচিত। দেখতে ঠিক সোনার মতোই সুন্দর, তাই না?

মৃদু হাসেন সাবিত্রী দেবী। মঞ্জু ততক্ষণে আবার এক ছুটে রঞ্জুর খাটের পাশে টুলের ওপর গিয়ে বসেছে। মনে চলছে গুঞ্জরণ ঃ সোনাদা... সোনাদা... সোনাদা...

ধীরে-ধীরে রঞ্জু একদিন চোখ মেললো। ঠিক সেই মুহূর্তে তার বিছানার পাশে কেউ

নেই। স্কুলে এক অনুষ্ঠান থাকায় মঞ্জুর ফিরতে দেরি হচ্ছে। কুনাল একটু আগে উঠে গেছে স্কুলে যাবার জন্যে তৈরি হতে।

রঞ্জুর চোখে অপার বিস্ময় ঃ এ সে কোথায়? কি করে এখানে এল? কবে এল?

সে তাকায় চারদিকে ঃ সবকিছুই অপরিচিত—ঝকঝকে তকতকে, সাজানো-গোছানো। খাটের ওপর ধবধবে পরিষ্কার নরম বিছানায় সে শুয়ে আছে। কী সুন্দর বিছানা। বর্তমানে তো শীত গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে মেঝেয় ছেঁড়া মাদুর আর ছেঁড়া ময়লা কাঁথাই তার সার। আঃ কতকাল এমন বিছানায় শোয়নি! সে কবে—কতকাল আগে? রঞ্জু চোখ বোজে। বুকের ভেতর কি যেন করছে! চোখের সামনে ভাসছে মা-বাবার উজ্জ্বল মুখ।

দুর্বল মস্তিষ্ক—তন্দ্রাচ্ছন্ন। বেশিক্ষণ ভাবতে পারে না।

হঠাৎ কপালে ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ লাগতেই সে চোখ মেললে। কে? কুনাল! নির্বাক বিস্ময়ে সে তাকিয়ে থাকে কুনালের দিকে। তার পরেই অদ্ভুত এক হাসি ছড়িয়ে পড়লো তার সারা মুখে।

কুনাল আনন্দে আত্মহারা। রঞ্জু চোখ মেলেছে! তার ওপর কিনা ওই হাসি! কুনালের মনে হয়, অমন সুন্দর হাসি পৃথিবীতে দুর্লভ। রঞ্জুর মাথায় কপালে সে হাত বুলোয়।

আমি কোথায় রে? —ক্ষীণ অস্পষ্ট কণ্ঠে রঞ্জু জিজ্ঞেস করে।

কেন, আমাদের বাড়িতে। —কুনাল জবাব দেয় ঃ তোর অসুখের খবর পেয়েই বাবা, অঙ্কের ও ইতিহাসের দুই স্যার, শম্ভু, নিধুদা আর আমি গিয়ে তোকে মামারবাড়ি থেকে নিয়ে আসি। ইস, এত দিন তোকে নিয়ে কী সাংঘাতিক অবস্থা গেছে! দাঁড়া, মাকে ডাকি।

খবর পেয়েই সাবিত্রী দেবী এসে ঘরে ঢুকলেন।

রঞ্জুর চোখে বুঝি পলক পড়ে না। তার পরেই অন্তরের বাঁধভাঙা শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আনন্দ সব যেন একাকার হয়ে শুভ্র হাসিতে ঝলমল করে উঠল তার চোখমুখ। ক্ষীণ কণ্ঠ থেকে অস্পষ্ট বেরিয়ে এল ঃ মা—কাকিমা।

আঃ, কী অপূর্ব হাসি আর কী মিষ্টি ডাক! চুমুতে-চুমুতে সাবিত্রী দেবী ভরে দেন রঞ্জুর কপাল ও চোখ।

কি এক অনির্বচনীয় সুখ ও আনন্দের জোয়ারে রঞ্জু কথা বলতে পারে না, তাকিয়েও থাকতে পারে না। সে ধীরে-ধীরে চোখ বোজে। কতকাল পরে আবার সেই মায়ের স্নেহ! রঞ্জুর মনের পর্দায় একের পর এক অতীতের ছবি ভেসে চলে।

মঞ্জু ইস্কুল থেকে ফিরে মায়ের কাছে খবরটা শুনতেই, দৌড়ে গিয়ে দেখে, রঞ্জু ঘুমোচ্ছে। তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে জলযোগ সেরে সে বসল রঞ্জুর পাশে টুলের ওপর। শুরু হলো অধীর প্রতীক্ষা।

তন্দ্রা, ঘুম আর জাগরণের ভেতর দিয়ে রঞ্জু চলেছে। একসময় জেগে সে দেখে মঞ্জুকে। চোখে তার মুগ্ধ দৃষ্টি ঃ কী মিষ্টি চেহারা—ঠিক যেন ফুলের মতো!

মঞ্জু তখন আনমনে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থেকে ক্ষীণকণ্ঠে রঞ্জু ডাকে,—মঞ্জু!

ভীষণ চমকে উঠলো মঞ্জু। টুল থেকে পড়ে যেতে-যেতে সামলে নেয়। তার পরেই হাততালি দিতে-দিতে কলকল করে উঠলো,—অ্যাঁ, তুমি জেগেছ! স্কুল থেকে ফিরে মায়ের কাছে শুনলাম, তুমি চোখ মেলেছ, কথা বলেছ। সেই থেকে তো বসে আছি। ধ্যেৎ, হঠাৎ ওইভাবে ডাকতে হয় বুঝি, আমি তো পড়েই যাচ্ছিলাম টুল থেকে। ইস, তোমাকে নিয়ে

এতদিন সবার কী ভয় গেছে। আচ্ছা, তুমি আমায় চিনলে কি করে, নাম জানলে কি করে?

রঞ্জুর চোখেমুখে হাসি উপচে পড়ে,—বাঃ! আমি গোনাপড়া জানি, জান না?

—ধ্যেৎ, বাজে কথা। বলো না, কী করে জানলে?

খুশিতে উচ্ছল রঞ্জুর মুখ। সেদিকে তাকিয়ে মঞ্জু যেন সম্মোহিত।

কী দেখছো? —রঞ্জু জিজ্ঞেস করে ঃ বলো তো আমি কে?

—কেন, তুমি তো সোনাদা।

—সোনাদা! এবার রঞ্জুর অবাক হবার পালা,—সোনাদা? সে আবার কে?

—কেন, তুমিই তো। —মঞ্জু বলে ঃ তুমি সোনার মতো সুন্দর তো, তাই মা বলেছে তুমি সোনাদা। আচ্ছা সোনাদা তুমি মাথায় তেল দাও না কেন, চুল আঁচড়াও না কেন? যেদিন তুমি এলে, তোমার একমাথা চুল জট পাকিয়ে ছিল। কতকাল তাতে তেল চিরুনি পড়েনি।

নিমেষে রঞ্জুর চোখের আলো যেন নিভে গেল। চোখ জ্বালা করতে থাকে ঃ যার দুবেলা পেট ভরে খাওয়া জোটে না, প্রতি গ্রাসের সঙ্গে যাকে নিয়ত খেতে হয় অকথ্য গালাগালি, তার মাথায় কিনা তেল, সে আঁচড়াবে চুল।

রঞ্জুর এ ভাবান্তর মঞ্জু লক্ষ্য করে না। লক্ষ্য করার মতো বয়সও তার নয়। পাকা গিন্নির মতো হাত-পা নেড়ে সে তখন বলে চলেছে—ঝামেলা কি কম! চুলের জট ছাড়াতে, পাট করতে হয়েছে কত আস্তে-আস্তে। তোমার যাতে কষ্ট না হয়, ব্যথা না লাগে, সেদিকেও তো লক্ষ্য রাখতে হবে। শুধু ওই টুকুন নাকি? তোমার মাথায়, মুখে, ঘাড়ে কানের এ-পিঠে ও-পিঠে কত যে ময়লা জমে ছিল, তা যদি দেখতে! অসুখ সারলে তোমাকে আচ্ছা করে সাফ করতে হবে, বুঝলে—

রঞ্জু ধীরে-ধীরে নিজের মাথায় হাত দেয়। হাতে ঠেকে পাট-করা-আঁচড়ানো চিকণ চুল।

দাঁড়াও, একটা আয়না নিয়ে আসি। দেখলে বুঝতে পারবে। —বলেই মঞ্জু ছুট দিলে...

আয়নায় রঞ্জু কতকাল নিজের মুখ দেখেনি। সে যেন চোখ ফেরাতে পারে না। একটু রোগা ছাড়া ঠিক সেই আগেকার রঞ্জু, মা যখন নিজের হাতে তাকে সাজিয়ে দিতেন। মাঝখানের এই বর্তমান কালটা—কত দিনের হবে—হঠাৎ যেন ছাঁটাই হয়ে গেছে। আয়নার দিকে রঞ্জু তাকিয়ে থাকতে পারে না। নিরুপায় কান্নায় মন মাথা কুটছে। মনের আয়নায় ভাসছে মা আর বাবার দীপ্ত সুন্দর মুখ।

নিরঞ্জনবাবু ঘরে ঢুকলেন। রঞ্জু তাঁকে আগেও দু-একবার দেখেছে দূর থেকে। অভিভূতের মতো সে তাকিয়ে থাকে। সে দৃষ্টি থেকে অন্তরের উজাড়-করা শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ছে যেন।

নিরঞ্জনবাবু তার কপালে হাত রাখেন। স্টেথিসকোপ দিয়ে বুকপিঠ পরীক্ষা করে শেষে বললেন,—যাক, বাবা, তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছো। আর ভয় নেই। এ অসুখ একদিনে হয়নি। মাসের পর মাস স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা মেঝেয় শোবার ফলেই হয়েছিল। অনাদিবাবুর সঙ্গে কথা বলে এর একটা বিহিত করতে হবে।

অনেক চেষ্টা করেও উদ্গত অশ্রু রঞ্জু চেপে রাখতে পারে না।

নিরঞ্জনবাবু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন,—আরে কি হলো? এই দেখ, পাগল ছেলের কাণ্ড!

রঞ্জুর চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে সাবিত্রী দেবী বললেন,—চোখের জল ফেলে না, বাবা। অসুখ তাহলে আবার বেড়ে যাবে। তোমার কাকাবাবু তো ঠিক কথাই বলেছেন। ওভাবে মানুষ তো দূরের কথা, গরুছাগলও টিকতে পারে না।

সাবিত্রী দেবীর কথায় রঞ্জুর এতদিনের অবরুদ্ধ কষ্ট ও অভিমান বুঝি উত্তাল হয়ে ওঠে। চাদরে সে মুখ ঢাকলো।

অনাদিবাবু এদিকে রোজই এসে নিয়মিত রঞ্জুর খবর নিয়ে যান। অসুখের যখন বাড়াবাড়ি, তখন দুবেলাও এসেছেন। কিন্তু সন্ত্রস্ত সবসময়। দীনহীনের মতো বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেছেন। খবরটা শোনামাত্রই যেন পালাতে পারলে বাঁচেন। নিজের অকিঞ্চিৎকর শিক্ষাদীক্ষা, রোজগারে অক্ষমতা এবং নিদারুণ অভাব-অনটনই বোধহয় তাঁকে নির্বোধ ব্যক্তিত্বহীন হীনম্মন্যতার এই শেষ ধাপে এনে দাঁড় করিয়েছে।

॥ দুই ॥

যত দিন যায়, রঞ্জুর স্বভাবে সাবিত্রী দেবী ততই আকৃষ্ট হন আর তার বংশ পরিচয় জানার জন্যে ততই আগ্রহ বোধ করতে থাকেন। অদ্যাবধি রঞ্জুর মুখ থেকে তার মামা-মামির বিরুদ্ধে একটা কথাও শোনা যায়নি। মামাবাড়ি সম্বন্ধে তার যেন কোনও অভিযোগই নেই। কতটুকুনই বা বয়েস, কুনালের বয়সীই হবে; অথচ তার কথাবার্তায় ব্যবহারে প্রকাশ পায় এমন এক ধরনের স্নিগ্ধ রুচিবোধ ও শালীনতা যা নিয়ে সাবিত্রী দেবী ও নিরঞ্জনবাবুর মধ্যে কথাও হয়েছে।

সেদিন দুপুরবেলা। পিঠে বালিশ দিয়ে রঞ্জু খাটে বসে আছে। পাশে বসে সাবিত্রী দেবী কথা বলছেন তার সঙ্গে। অন্য ঘরে মঞ্জু ঘুমোচ্ছে। বিশ্রাম করছেন নিরঞ্জনবাবুও।

খুব সাবধানে সাবিত্রী দেবী একসময় কথাটা পাড়লেন, রঞ্জুকে জিজ্ঞেস করলেন তার পূর্ব পরিচয়। এ ব্যাপারে, দেখা গেল, রঞ্জুর কোনও সংকোচের বালাই নেই। সাবিত্রী দেবীর প্রশ্নের জবাবে খোলামনে সে ধীরে-ধীরে একের পর এক বলে চললো তার ছোট্ট জীবনের ইতিহাস।

সাবিত্রী দেবী তো স্তম্ভিত। এ কী শুনছেন তিনি! এ ধরনের পারিবারিক ইতিহাস শোনার জন্যে তো তিনি কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না।

তিনি শোনেন ঃ রঞ্জু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলে। মা-বাবার একমাত্র সন্তান, নয়নের মণি। তার বাবা ধরণীমোহন চৌধুরী ছিলেন এম.এ., হাইস্কুলের শিক্ষক এবং খুব স্বাস্থ্যবান—লম্বাচওড়া জোয়ান। মা-ও ছিলেন স্বাস্থ্যবতী এবং বি.এ. পাস। বাবার বন্দুক ছিল জমিজমাসম্পত্তি ছিল আর ছিল যথেষ্ট প্রভাবপ্রতিপত্তি। দেশের লোক, বিশেষ করে গাঁয়ের গরিবরা এবং চাষিরা বাবাকে খুব ভালোবাসতো, শ্রদ্ধা করতো। তাদের হয়ে তিনি কথা বলতেন বলে দেশের জমিদারের রাগ ছিল তাঁর ওপর। ধরণীমোহনের এই ভালো অবস্থা ও প্রভাবপ্রতিপত্তির জন্যে জ্ঞাতিরাও তাঁকে খুব হিংসা করতো, তাঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করতো এবং তাঁর বিরুদ্ধে রঙ ফলিয়ে নানা কথা তুলতো জমিদারের কানে। কিন্তু তার বাবা ওসব গ্রাহ্যও করতেন না।

বলতে-বলতে রঞ্জুর গলা ধরে আসে। চোখ বড় বড় করে সাবিত্রী দেবী নির্নিমেষ তাকিয়ে আছেন তার দিকে। অমন মা-বাবার যে একমাত্র আদরের ধন, তার আজ কেন

এই দশা, তা অনুমান করতেও তাঁর বুকের স্পন্দন বুঝি থেমে আসে। একটু সামলে নিয়ে থেমে থেমে হতভাগ্য কিশোর বলে যায় তার অশ্রুতপূর্ব কান্নাভেজা কাহিনী।

এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ রঞ্জুদের ওই এলাকায় এক নতুন ধরনের মারাত্মক কলেরা মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়লো। চারদিকে লোকজন মরতে লাগলো। তাদের জ্ঞাতিদের সংসারেও কয়েকজন মারা পড়লো। এলাকার যারা পারলো, দেশ ছেড়ে পালালো। দেশের মানুষদের বাঁচাতে ও রোগ ঠেকাতে তার বাবা ধরণীমোহন তখন ভলান্টিয়ার-দল গড়ে দিনরাত পরিশ্রম করছেন। তিনি মাকে বললেন রঞ্জুকে নিয়ে কিছুদিনের জন্যে মামাবাড়ি গিয়ে থাকতে। কিন্তু বাবাকে একলা ফেলে মা যেতে রাজি হলেন না। তখন তাদের বিশ্বাসী পুরনো গোমস্তা মনোহর হাজরা-কে দিয়ে বাবা তাকে মামাবাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

তারপর মাসের পর মাস কেটে যায়। মা-বাবার কোনও খবরই রঞ্জু পায় না। শেষে একদিন তার মনোহর জ্যাঠা এল, তাকে জানাল, সে সবদিক দিয়েই সর্বস্বান্ত। তার বাবার ওই কলেরা রোগ হয়েছিল, তাতেই তিনি মারা যান। বাবার শোকে মা শয্যা নেন। শেষ পর্যন্ত ওই রোগে তিনিও চলে গেলেন। জমিদার ও জ্ঞাতিদের ষড়যন্ত্রে বাড়িঘর লুঠ হয়ে গেছে, জমিজমাও সব বেদখল হয়ে গেছে। সেই থেকেই সে মামাবাড়িতে আছে।

রঞ্জু এতক্ষণ নিজেকে যাহোক সংযত রাখছিল, আর পারলো না। হেঁটমাথায় আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লো। আর সাবিত্রী দেবী! রঞ্জুকে তিনি কি সান্ত্বনা দেবেন? নিজে তিনি বোবা হয়ে গেছেন। এ কী অকল্পনীয় মর্মান্তিক বিপর্যয়!

নিঝুম দুপুরে নীরবে কেঁদে চলে দুটি প্রাণী।

রঞ্জু দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছে। আজ হোক কাল হোক, আবার তাকে ফিরে যেতে হবে মামার কাছে। তাকে নিজেদের কাছে রাখতে পারলে সবচেয়ে স্বস্তি পেতেন নিরঞ্জনবাবু এবং সাবিত্রী দেবী। কিন্তু উপায় নেই। তাতে চূড়ান্ত দুর্নাম রটবে অনাদিবাবুর নামে। অথচ রঞ্জু যে অবস্থায় তাঁর কাছে ছিল, সে অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না।

অনেক ভেবেচিন্তে তাঁরা স্থির করলেন, রঞ্জু মামাবাড়ি থাকলেও তার আর্থিক ও অন্যান্য দায়দায়িত্ব তাঁরাই গ্রহণ করবেন। এছাড়া গত্যন্তরও নেই। এজন্য অনাদিবাবুর বাড়ির বারান্দার একটা অংশ মজবুত বেড়া দিয়ে ঘিরে একখানা ঘর তৈরি করা হবে। সেখানে প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র সহ ছোট একটা খাট ও লেখাপড়ার টেবিল থাকবে। এটাই হবে রঞ্জুর পড়াশুনো ও শোবার ঘর।

উপরন্তু মঞ্জুকে পড়াবে রঞ্জু। সে বাবদ মাসে ২৫ টাকা করে অনাদিবাবুকে দেওয়া হবে রঞ্জুর খাইখরচের জন্যে।

অনাদিবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই। এ প্রস্তাব যে তাঁরা শোনামাত্র লুফে নেবেন, তা চোখ বুজে বলা যায়। সমস্যা হলো রঞ্জুকে নিয়ে। এ কদিনে রঞ্জুকে তাঁরা যেটুকু বুঝেছেন, এ প্রস্তাবে তাকে রাজি করানো হবে এক বিষম মুশকিলের ব্যাপার।

এবং হলোও তাই। প্রস্তাব শুনে রঞ্জু সোজা বেঁকে বসলো ঃ না, এটা কখনই হতে পারে না। মামাবাড়িতে সে আগে যেমন ছিল, তেমনি থাকবে।

কুনালের সমবয়সি হলেও, গত বছর দুয়েক ধরে নিষ্ঠুর ভাগ্য তার জীবন নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলছে, ডোবাতে-ডোবাতে যেভাবে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে, তাতে তার মনের বয়স বেড়ে গেছে অনেকখানি। উচ্চশিক্ষিত অবস্থাপন্ন মা-বাবার একমাত্র আদরের ধন আজ কাঙালেরও অধম—এ নির্যাতন সে যে এই কচি বয়সে

মুখ বুজে সইতে পারছে, তার পেছনে সম্ভবত কাজ করেছে মা-বাবার আদর্শ শিক্ষা আর পারিবারিক মর্যাদাবোধ। তাই নিরঞ্জনবাবুদের প্রস্তাবে সে কিছুতেই সায় দিতে পারে না। যত অকাট্য যুক্তিই তাঁরা দেখান, অবুঝের মতো সে সমানে মাথা নেড়ে চলে,—না, না, না...

শেষে একসময় সে কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে। আর তার পরেই জয় হলো মাতৃস্নেহের। সাবিত্রী দেবী তাকে বুকে টেনে নিলেন। তার মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন,—বাবা, এ স্কুলে তোমার ভর্তি হবার পর থেকে কুনালের মুখে তোমার কথা আমরা কতবার যে শুনেছি, তার ইয়ত্তা নেই। তার পর এই অসুখ—তুমি এলে আমাদের কাছে। কিন্তু তখন আর মোটেই অপরিচিত নও। এসবের ফল কি হয়েছে, তুমি তা বুঝতে পার কি না জানিনে। আগে আমাদের ছিল একছেলে একমেয়ে। এখন হয়েছে দু-ছেলে একমেয়ে। মা-বাবা সন্তানের মঙ্গলের জন্যে যে ব্যবস্থাই করুক, তাতে তোমার আপত্তি থাকবে কেন? আগেই বলেছি, কেন এই লোক-দেখানো ব্যবস্থা করতে হচ্ছে, কেন তোমাকে আমাদের কাছে রাখতে পারছিনে। আমরা নিশ্চিত যে, আমাদের এ ব্যবস্থা বৃথা যাবে না। অনেক—অনেক বড় হবে তুমি।

রঞ্জু এর পর শান্ত হয় ধীরে-ধীরে।

নিরঞ্জনবাবুর ব্যবস্থায় সস্ত্রীক অনাদিবাবু যে কিভাবে বর্তে গেছেন, তা কহতব্য নয়। রঞ্জুর জীবনেও আজ স্বস্তি অনেকখানি। মামার সংসারের কাজ সে আগের মতো করলেও মামির দুর্ব্যবহারের তোড় বিশেষভাবে কমে গেছে। মামির ভয়, তাঁর তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে রঞ্জু যদি ডাক্তারবাবুর বাড়ি চলে যায় তো সর্বনাশ। তাই রসনা তাঁর যথেষ্ট সংযত। তবু কথায় বলে স্বভাব যায় না মলে। রঞ্জু অবিশ্যি ওটুকু গায়ে মাখে না।

কুনালদের বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক অল্পদিনেই পুরোপুরি সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে আসে, পরিবারের একজন হয়ে ওঠে সে। কে বলবে, সে ও কুনাল সত্যিকার দুই ভাই নয়!

রঞ্জুকে মাস্টার হিসাবে পেয়ে মঞ্জুর ফুর্তি সবচেয়ে বেশি। স্কুলের পড়া সে দিন থাকতে আগেই তৈরি করে রাখে। কোনওটা বুঝতে অসুবিধে হলে মাকে জিজ্ঞেস করে নেয়।

সেদিন ঠাট্টাচ্ছলে সাবিত্রী দেবী বললেন,—হ্যাঁরে, তোর তো মাস্টার আছে। আমাকেই যদি সব বলে দিতে হয় তো মাস্টারের কি দরকার?

মঞ্জু চটে উঠলো,—তুমি না, মা, কিচ্ছু বোঝ না। সোনাদার কাছে এইসব পড়তে গিয়ে শুধু শুধু সময় নষ্ট করবো নাকি? আমি অত বোকা না, বুঝলে? সোনাদার কাছে তো বেশির ভাগ সময় গল্প শুনি। কী সব চমৎকার গল্প! যদি শুনতে তো তোমারও নড়তে ইচ্ছে করতো না।

সত্যি তাই, মঞ্জু মিথ্যে বলেনি। সাবিত্রী দেবী আড়াল থেকে শোনেন, অপূর্ব সেসব গল্প-কাহিনী। দেশ-বিদেশের গল্প, অভিযানের গল্প, ইতিহাসের গল্প, বিজ্ঞানের গল্প, মহাকাশের গল্প, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের গল্প, এমনি সব গল্প-কাহিনী রঞ্জু বলে যায় একের পর এক, আর হাঁ করে যেন গিলতে থাকে মঞ্জু। আর ওইটুকুন ছেলের জ্ঞানের পরিধি দেখে মুগ্ধ হন সাবিত্রী দেবী।

রঞ্জুর বিকেলের জলখাবার কুনালদের বাড়িতে বাঁধা। এক-একদিন মামার বাড়িতে পৌঁছুতে তার সন্ধ্যা উতরে যায়। নিধু হারিকেন নিয়ে তাকে পৌঁছে দিয়ে আসে।

কোনও কারণে রঞ্জু যদি একদিন বিকেলে না আসতে পারে তো, পরদিন তার দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। মঞ্জুর মান ভাঙাতে তার কালঘাম ছোটার জোগাড় হয়। প্রথম দিকে বন্ধুর এ বিপদে সাহায্যের জন্যে কুনাল এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু রঞ্জুর ধমক খেয়ে নিরস্ত হয়েছে।

এক-একদিন শত সাধ্য-সাধনাতেও যখন মঞ্জুর অভিমানে চিড় ধরানো যায় না, রঞ্জু তখন শেষ অস্ত্র ছাড়ে, নকল অভিমানের সুরে বলে,—বেশ, আমি তা হলে চলে যাচ্ছি। আর এসেই বা কি করবো? কাকিমা, আমি কিছু খাব না, চলে যাচ্ছি।

সঙ্গে-সঙ্গে শোনা যায় মঞ্জুর শাসানি—সোনাদা, ভালো হবে না, বলে দিচ্ছি। মোটেই ভালো হবে না।

বলতে-বলতে সে একলাফে উঠে বসে। নিমেষে সব গোল মিটে যায়।

ছাইচাপা আগুন জ্বলে ওঠে

॥ এক ॥

ক্লাসের পড়াশুনোয় বা পরীক্ষায় প্রথম-দ্বিতীয় হওয়া নিয়ে রঞ্জু কতটুকু মাথা ঘামায় বা আদৌ ঘামায় কিনা বলা দুষ্কর। মোটামুটি ভালোভাবে পাস করে ক্লাসে উঠতে পারলেই সে যেন খুশি।

কিন্তু পাঠ্যবইয়ের বাইরের পড়াশুনোয়? অবস্থাটা সেখানে সম্পূর্ণ অন্যরকম। ইস্কুলের লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগারে কোন-কোন বিষয়ে কি কি বই, বিশেষত বাংলা বই আছে না-আছে, তার পুরো খবর অন্য ছাত্রেরা কতটুকু রাখে বা আদৌ রাখে কিনা বলা কঠিন। কিন্তু রঞ্জুর তা বোধহয় ঠোঁটের আগায়।

এ ব্যাপারে তার পড়াশুনো বা জ্ঞান কতখানি, তা কিছুটা আঁচ করা যায়, যখন বাইরের কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা ওঠে বা কোনও বিতর্ক-সভার আয়োজন হয়। সে ক্ষেত্রে রঞ্জুকে চ্যালেঞ্জ জানানোর হিম্মৎ খুব কম ছাত্রেরই আছে। স্বভাবতই তারা উপরের শ্রেণীর।

কিছুকাল যাবৎ কুনাল দেখছে, লাইব্রেরিতে বাংলা বইয়ের অভাব নিয়ে রঞ্জুর মনে যেন নানা অভিযোগ ক্রমশ দানা বাঁধছে। লাইব্রেরি থেকে বই এনে সে-ও পড়ে মাঝে-মাঝে। কোনও অভিযোগের বালাই নেই। রঞ্জুর এই খুঁতখুঁতানি তাই সে বিশেষ গায়ে মাখে না।

এইভাবে যাহোক চলছিল একরকম। হালে রঞ্জু বেশ একটু গম্ভীর, লাইব্রেরি সম্পর্কে বিশেষ উচ্চবাচ্য করে না। কুনালও তাই নিশ্চিন্ত। কিন্তু তার পরেই ঘটলো অঘটন।

অষ্টম শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষা তাদের সবে শেষ হয়েছে। রঞ্জু হঠাৎ জানালো লাইব্রেরির বইপত্রের ঘাটতি সম্বন্ধে সে এবার একটু উঠে-পড়ে লাগবে। আগামীকাল দেখা করবে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের সঙ্গে।

স্কুলের গ্রন্থাগারের মূল দায়িত্বে আছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার নৃপেন্দ্রনাথ ঘটক। বিষম রাশভারী লোক ও ছাত্রদের ধারণায় বদরাগীও বটে।

রঞ্জুর কথায় কুনালের আক্কেলগুড়ুম হবার উপক্রম। মস্তকে যেন অশনি-সম্পাত ঘটলো। হাঁ করে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে হাউমাউ করে উঠলো,—অ্যাঁ, বলিস কি!

অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডস্যারের সঙ্গে যাবি দেখা করতে? বইয়ের ঘাটতি নিয়ে কথা বলতে? খেপেছিস? তুই কি পাগল, না ছাগল? নাকি গাড়ল হয়ে গেলি?

মোট্টেই না। —ধীরকণ্ঠে রঞ্জু বলে ঃ আমাতে আমি ঠিকই আছি। স্যারের সঙ্গে দেখা করায় দোষের কিচ্ছু নেই।

এর পর দুজনের মধ্যে আরম্ভ হয় তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ—যাকে বলে কথায় কোস্তাকুস্তি। শেষে যুক্তিতর্কে না পেরে কুনাল বকাতে শুরু করে,—তোর সব থেকে মস্ত দোষ কি জানিস? তুই বড্ড একগুঁয়ে জেদী। কী দরকার তোর ও ব্যাপারে মাথা গলাবার? সবার চলতে পারলে, তোর কেন চলবে না? আবার বলছি, বাঘের গুহায় পা দিস নে, বিপদে পড়বি। আর মামা-মামির কাছে তখন তোর লাঞ্ছনা গঞ্জনার শেষ থাকবে না। মা-বাবাও অসুবিধেয় পড়বেন।

রঞ্জু ধমকে উঠলো,—চুপ কর। বাজে বকবি নে। কাকাবাবু-কাকিমাকে টানবি নে এর মধ্যে। আমি কিছুমাত্র অন্যায় করছি নে।

অতএব পরদিন রঞ্জু অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের কামরায় গিয়ে হাজির হলো।

ভাঙা মন নিয়ে কুনাল চললো, পেছন পেছন। তার সঙ্গী হলো জগা, হারু, নসে প্রভৃতি কয়েকজন সহপাঠী। তারা যাচ্ছে রঞ্জুর হদ্দ বেহাল দশা পরিদর্শনে—তাদের কথায় শ্রীমান রঞ্জনকুমারকে শেষ বিদায় জানাতে। কামরায় পাশের জানলায় গিয়ে তারা ওত পাতলো।

নৃপেন্দ্রবাবু কাজ করছিলেন। রঞ্জুর গলার আওয়াজে মুখ তুললেন,—কিছু বলবে?

সে-জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর কানে যেতেই কুনাল পাশে দাঁড়ানো জগার ঘাড় খামচে ধরলো। আর জগা চেপে ধরলো জানলার সিক। স্যারের চোখে ব্যাঘ্র-ভ্রূকুটিও তারা যেন স্পষ্ট দেখতে পায়।

মাথা নিচু করে রঞ্জু তখন বলছে,—বলছিলাম স্যার, আমাদের লাইব্রেরিতে গল্প, উপন্যাস, কবিতা বা ওই ধরনের বই যা আছে, তার তুলনায় অন্যান্য বই বেশি নেই। ওইসব বই আরও কিছু থাকলে ভালো হয়, স্যার।

—'অন্যান্য বই' মানে?

স্যারের ওই রক্ত-জল-করা প্রশ্ন শুনেই কুনালের বুক ধড়ফড় করে উঠলো। ফিসফিস করে নসে বললে,—গেল! জ্যাঠামো করতে গিয়ে রঞ্জন চৌধুরী ফেঁসে গেল। এক্কেরে দফারফা!

কিন্তু না, তারা শুনলো, সপ্রতিভ বিনীত কণ্ঠে রঞ্জু বলছে,—অন্যান্য বই বলতে আমি, স্যার বোঝাতে চাইছি দেশ-বিদেশের কথা, জন্তু-জানোয়ারের কথা, মানুষের বড় হবার কাহিনী, অভিযান ও আবিষ্কারের গল্প, শিকারের গল্প, পৃথিবীর উৎপত্তি এবং জীবনের সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশের কাহিনী, সহজ বাংলায় লেখা ভূগোল, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, এইসব বিষয়ের বই।

নিস্তব্ধ ঘর। রঞ্জুর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন নৃপেন্দ্রবাবু। দেয়াল-ঘড়ির টিকটিক শব্দও কুনালের কাছে ঠেকছে হাতুড়ি-পেটার আওয়াজের মতো।

নৃপেন্দ্রবাবু বললেন,—হ্যাঁ, ওসব বই কম আছে সত্যি। তবে যা আছে, সেগুলো পড়েছ কি? সেগুলো আগে শেষ করো, তারপর দেখা যাবে।

সসংকোচে রঞ্জু বললে,—সেগুলো শেষ করেছি, স্যার। তাই তো আপনার কাছে এলাম।

অ্যাঁ, পাষণ্ডটা বলে কি! আর একটু হলেই জগা হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছিল, অন্যেরা ধরে সামলে নিলে।

অবাক হন অভিজ্ঞ প্রবীণ শিক্ষক নৃপেন্দ্রবাবু বলেন,—পড়েছ? সব?

বিস্মিত দৃষ্টি তাঁর চোখে। আবার জিজ্ঞেস করেন,—ওসব বই পড়তে তোমার বুঝি ভালো লাগে? ভূগোল, বিজ্ঞান, অ্যাস্ট্রনমিও?

রঞ্জু হেঁটমাথায় দাঁড়িয়ে রইল।

আর কুনালের সাথীরা? রঞ্জুর বিকৃত বিস্বাদ রুচির ধাক্কায় তারা হাঁসফাঁস করছে। জগা নিস্তেজ গলায় ফিসফিসিয়ে উঠলো,—ঈহ্! ভূগোল বিজ্ঞান অ্যাস্ট্রনমি! আমার গা বমি-বমি করছে।

খুবই স্বাভাবিক। —হারু ঘাড় নাড়ে।

জগাকে তারা ধরাধরি করে জামগাছটার তলায় বসিয়ে দিলে। জগা চিৎ হয়ে পড়লো।

এদিকে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডস্যারের গলা কানে যেতেই আবার তারা হুড়মুড় করে দৌড়লো জানলামুখো। নিজের কানকে তারা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। স্নেহমাখা কণ্ঠে নৃপেন্দ্রবাবু বলছেন,—শুনতে বড় ভালো লাগছে, বাবা। কিন্তু গল্প কবিতা উপন্যাসও তো পড়া উচিত। জীবনে ওটা রসের দিক। কথাটা এখন হয়তো ঠিকমতো বুঝতে পারবে না।

ওসব বইও পড়ি, স্যার। —বিনীত কণ্ঠে রঞ্জু বলে ঃ লাইব্রেরি থেকে নিয়েই পড়ি।

আবার ঘর নিস্তব্ধ।

ফিসফিস করে নসে বললে,—এই হারু দেখি তোর নাকটা এগিয়ে দে তো; চিমটি কেটে দেখি, আমরা জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি?

কেন, নিজেরটা কি হলো? —চাপা গলায় হারু রুখে উঠলো ঃ রাতে পরের বাড়ির হাঁড়ি সাফ করতে গিয়ে ছাঁটাই হয়েছে নাকি?

নসে তেড়ে উঠতে যাবে, এমনসময় আবার শোনা গেল প্রবীণ শিক্ষকের কোমল গলা, —কিন্তু বাবা, তুমি যেসব বিষয়ের কথা বলছো, বাংলা ভাষায় সেসব বই তো বেশি নেই। সহজ ইংরেজি ভাষায় লেখা ওসব বই প্রচুর আছে। আমাদের লাইব্রেরিতেও আছে বেশ কিছু।

ওঃ! জানতাম না, স্যার। —রঞ্জুর ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে ঃ বাংলা ভাষায় ওসব বই এত কম, জানা ছিল না। ইংরেজি বইগুলো, স্যার, নাড়াচাড়া করে দেখেছি, কিন্তু ঠিকমতো বুঝতে পারি নে। বহু শব্দের মানেও জানি নে। বাড়িতে ডিক্‌শনারিও নেই যে, তা থেকে মানে জানবো। আচ্ছা স্যার, তা হলে যাই—

নমস্কার করে রঞ্জু ফিরতেই নৃপেন্দ্রবাবু ডাকলেন,—শোনো।

স্নিগ্ধ উজ্জ্বল চোখে তিনি তাকিয়ে আছেন রঞ্জুর দিকে। বয়স আন্দাজে সাধারণ বাঙালি ছেলের তুলনায় রঞ্জু লম্বা ও বলিষ্ঠকায়। দেখতেও সুশ্রী। মাথাভরা ঝাঁকড়া চুল, টিকলো নাক, চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট। মা-বাপহারা ছাত্রটিকে নৃপেন্দ্রবাবু আজ যেন আবার নতুন করে দেখছেন।

সস্নেহে তিনি বললেন,—শোন, ছেলেদের মধ্যে ওসব বইয়ের সত্যিকার পড়ুয়া কেউ আছে, জানতাম না। এবার থেকে তাই বাংলায় ও জাতিয় বই যা পাওয়া যায়, সব খুঁজে পেতে কেনার চেষ্টা করবো। কিন্তু বেশি কিছু মিলবে বলে ভরসা হয় না। এক হয়, যদি ইংরেজি শেখ! তা হলে নানান বিষয়ের বহু বই পড়ার সুযোগ পাবে, বাবা।

ডাগর চোখ তুলে রঞ্জু সাগ্রহে বললে,—শিখতে তো খুব ইচ্ছে করে, স্যার। কিন্তু কি করে শিখবো?

শুভ্র আনন্দে শিক্ষাগুরুর চোখমুখ যেন ঝলকে উঠলো।

এদিকে কুনালদের চোখে বুঝি পলক পড়ছে না। দম আটকে তারা দেখছে এক নতুন নাটক। অপূর্ব সে-দৃশ্যে বুঝি সম্মোহিত।

স্নেহঝরা কণ্ঠে নৃপেন্দ্রবাবু বললেন,—বেশ বাবা, বেশ। আমি শেখাব। কাল থেকে তুমি আসতে পার। ছুটির পর আসবে। ওইসব ইংরেজি বই পড়তে-পড়তে ইংরেজি শিখবে —কেমন?

ক্ষণেকের জন্যে রঞ্জুকে বড় বিচলিত বোধহয়। ভেতরের আবেগ দমাতে সে বুঝি প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তার পরেই শিক্ষাগুরুর পায়ে গড় হয়ে এক প্রণাম করেই সে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কুনাল ও তার সাথীরাও বেরিয়ে এল গুপ্তস্থান থেকে। তাদের চোখে রঞ্জনকুমারের প্রেস্টিজ তখন প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। হিরো সে—মস্ত বড় হিরো তাদের চোখে।

রঞ্জু হাঁটছে হনহন করে।

পেছন থেকে চাপা গলায় কুনাল ডাকলে,—রঞ্জু! এই রঞ্জু!

রঞ্জু ফিরেও তাকায় না।

কুনালের সঙ্গীরা হতভম্ব। এ ওর মুখের দিকে তাকায় ঃ রঞ্জুর হলো কি?

আর কুনাল? সে-ও প্রথমে অবাক হয়েছিল। তার পরেই তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটু আগে দেখা অনির্বচনীয় সেই নাটক আর তার মধুর দৃশ্যগুলি। ভয়ঙ্কর কঠোর ও রাগী বলে যিনি পরিচিত, সেই স্যারের অপরূপ স্নেহের পরশ ও আশাতীত প্রস্তাব রঞ্জুর স্নেহকাঙাল মনকে কিভাবে নাড়া দিয়েছে, তা কতকটা আন্দাজ করতে পেরে, ভাগ্যাহত বন্ধুর জন্যে প্রাণ তার কেঁদে ওঠে।

সে পেছিয়ে পড়লো। সঙ্গীদের বললে,—থাক। ওকে যেতে দে।

॥ দুই ॥

রঞ্জু পড়ছে নৃপেন্দ্রবাবুর কাছে। শুধু ইংরেজি নয়, অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ও সে জেনে নেয় দরকার মতো। আর ততই পাঠ্যবিষয়গুলির প্রতি বাড়তে থাকে তার আগ্রহ ও আকর্ষণ। বিদ্যাজগতের যেসব দিক সে এতকাল অনেকটা অবহেলা করে এসেছে, তার আলো এসে পড়ে তার মনোরাজ্যে। দ্রুত সরে যেতে থাকে কালো আবরণ। তার চোখে নৃপেন্দ্রবাবু আজ শুধু অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডস্যার নন, ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতের চিরবরেণ্য ঋষিপ্রতিম শিক্ষাচার্য যেন। জ্ঞানস্পৃহা ও মনুষ্যত্বের পাঠ নিয়ে চলে সে তাঁর পায়ের কাছে বসে। রঞ্জুর বুঝি নবজন্ম হতে থাকে।

রঞ্জুর মেধা ও অধ্যবসায় দেখে নৃপেন্দ্রবাবুও মুগ্ধ চমৎকৃত। দীর্ঘ শিক্ষকজীবনে রঞ্জনকুমারের মতো মেধাবী ও অধ্যবসায়ী ছাত্র তিনি আর পেয়েছেন বলে স্মরণ করতে পারেন না। অপুত্রক প্রবীণ শিক্ষক তাই পুত্রাধিক স্নেহ দিয়ে রঞ্জুর সামনে খুলে ধরেন জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন দিগন্ত। রঞ্জুর জীবনকে নতুন করে গড়ে তুলতে শুরু হয় তাঁর নিরলস নিঃস্বার্থ প্রয়াস।

অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডস্যারের কাছেই শুধু রঞ্জুকে নিয়মিত হাজিরা দিতে হয় না, দিতে

হয় আরো এক জায়গায়। সে হলো কুনালদের বাড়িতে মঞ্জুর কাছে। নিয়মিত আসা যে তার পক্ষে কত কঠিন, মঞ্জুকে তা কে বোঝাবে? মঞ্জুর এক কথা, দিনে অন্তত একবার, বিশেষত ইস্কুলের পর সোনাদা অল্প সময়ের জন্যে হলেও একবার আসবে এবং তাকে গল্প বলবে। এর ব্যতিক্রম হলে আর রক্ষা নেই, কেঁদেকেটে সে বাড়ি মাথায় করে। কাজেই একটা হাজিরা রঞ্জুর নিজের প্রয়োজনে, অন্যটি স্নেহের টানে।

নৃপেন্দ্রবাবুর শিক্ষাদানের ফল ফলতে কিন্তু বিশেষ দেরি হয় না। নবম শ্রেণীর যান্মাসিক পরীক্ষায় রঞ্জু ক্লাসে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলো। আর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হলো রেকর্ড নম্বর পেয়ে। এবার অন্য শিক্ষকদেরও, বলতে গেলে গোটা স্কুলের, বিশেষ নজর পড়ে রঞ্জুর ওপর।

দেখতে-দেখতে এসে গেল স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা। ফল বেরুনোমাত্র শুধু স্কুলের নয়, তুমুল সাড়া পড়ে গেল সারা এলাকায়। কারণ সমগ্র জেলায় এই প্রথম ঝালদিয়া হাইস্কুলের ছাত্র রঞ্জনকুমার চৌধুরী প্রথম দশজনের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। প্রথম জনের সঙ্গে তার তফাৎ মাত্র বারো নম্বরের। রঞ্জুকে নিয়ে তাই স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র এবং গ্রামের সবার মধ্যে সে কী আনন্দ-হুল্লোড়!

রঞ্জু গিয়ে নৃপেন্দ্রবাবুকে প্রণাম করতেই তিনি তাকে বুকে টেনে নিলেন। তাঁর চোখে আনন্দাশ্রু টলটল করছে। পরক্ষণে তা ঝরে পড়লো রঞ্জুর মাথায়—পিতৃপ্রতিম শিক্ষাগুরুর হৃদয়নিংড়ানো নীরব আশীর্বাদ যেন। কাঁদছে রঞ্জুও। সে দৃশ্যে অভিভূত রঞ্জুর সাথীরাও—কুনাল, জগমোহন, হরেন প্রভৃতি যারা এবার রঞ্জুর সঙ্গেই পাস করেছে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা।

শুধু স্কলারশিপের টাকায় কলকাতায় থেকে পড়াশোনা, থাকা-খাওয়া, বইপত্তর কেনা ইত্যাদির খরচ চলে না। স্বাভাবিকভাবেই স্থির হয়, সে খরচ বহন করবেন নিরঞ্জনবাবু। নৃপেন্দ্রবাবুও সে দায়িত্বের ভাগ চেয়েছিলেন। গরিব শিক্ষককে নিবৃত্ত করেছেন নিরঞ্জনবাবুই।

এসব খবর শোনার পর থেকেই রঞ্জু মুখ লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। একদিকে তার এতবড় সাফল্য, অন্যদিকে নিজের দীনহীন অনাথ দশা, আর সেইসঙ্গে মা-বাবাকে ঘিরে কত মধুর বাল্যস্মৃতি তাকে যেন তাড়া করে ফিরছে। সবার কাছ থেকে তাই সে পালিয়ে থাকতে চায়।

কুনাল খুঁজছে তাকে। দুপুরের পর থেকে তার পাত্তা নেই। তার মামাবাড়িতে, স্কুলে, কোথাও সে নেই। অন্য সহপাঠীদের বাড়িতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তা হলে? কোথায় গেল রঞ্জু?

পাগলের মতো খুঁজতে-খুঁজতে কুনাল শেষে তাকে আবিষ্কার করলো মাঠের এক কোণে। নিরালায় সে বসে আছে। দূর দিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ।

কুনাল হই-হই করে ওঠে। কিন্তু রঞ্জুর মুখের দিকে নজর পড়তেই সে থেমে গেল। পায়ে-পায়ে বসলো গিয়ে তার পাশে।

রঞ্জুকে যে সবচেয়ে চেনে, স্বভাবতই সে হলো কুনাল। কৈশোর ও তারুণ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আজ সে বুঝি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারে বন্ধুর মনের নিরুপায় ব্যথা আর অন্তহীন দ্বন্দ্ব। এক দিকে প্রচণ্ড মর্যাদাবোধ, অন্য দিকে মানুষ হবার দুর্জয় বাসনা, এ দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের বুঝি শেষ নেই।

রঞ্জুর এ ব্যথায় কি সান্ত্বনা দেবে কুনাল? প্রিয়তম বন্ধুর ক্ষতবিক্ষত অন্তরের এই মূক আর্ত কান্না যখন সে শুনতে পায়, তখন যে তার নিজের মনেই অলক্ষ্যে অশ্রু ঝরতে থাকে। কথা হারিয়ে তাই পাশাপাশি বসে থাকে দুটি কিশোর প্রাণ।

পশ্চিমাকাশ রক্তে রাঙিয়ে সূর্য অস্ত যায়। দিগন্ত-বিসারী বিলের প্রান্তে তেমনি বসে থাকে দুই কিশোর বন্ধু।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে অবিরাম। ঝোপেঝাড়ে বিন্দুবিন্দু জোনাকির আলো—জ্বলছে আর নিভছে। ওপরে উন্মুক্ত নিঃশব্দ আকাশ। তারকাখচিত সেই চাঁদোয়ার নিচে রঞ্জুর ডান হাতটা কুনাল কখন নিজের হাতে টেনে নিয়েছে। একসময় সে ধীরে-ধীরে ফিসফিস করে বললে,—রঞ্জু, তুই তো জানিস, মা-বাবার কাছে আমরা দুই ভাই এক বোন। অন্যেরাও তাই মনে করে।

কুনালের হাতের মধ্যে রঞ্জুর হাতটা কাঁপছে থরথর করে। কিছুক্ষণ পরে অতি-মৃদু প্রায় অস্পষ্ট গলায় সে বললে,—আমি তা জানি।

নিরঞ্জনবাবু কলকাতায় গিয়ে কুনাল ও রঞ্জুকে কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি করে দিয়ে এলেন। ঝালদিয়ার পাশের গ্রাম বাগড়ার নীলকান্ত পোদ্দার নিরঞ্জনবাবুর খুবই ঘনিষ্ঠ। কলকাতায় তাঁর হোটেলের ব্যবসা। মোটামুটি বেশ ভালো হোটেল। সেখানে দোতলায় বড় একখানা ঘরে দু-খানা খাট আর দুখানা করে চেয়ার ও টেবিল সমেত কুনাল ও রঞ্জুর থাকার ব্যবস্থা হলো। নীলকান্ত পোদ্দার লোক ভালো। কুনাল ও রঞ্জুর স্থানীয় অভিভাবক হিসাবে তাঁর ওপর নিরঞ্জনবাবু নির্ভর করতে পারেন অনেকখানি।

ঝালদিয়া থেকে বিদায়ের কালটি হয় বড় বেদনাবিধুর।

দুই ছেলেকে কাছছাড়া করতে মা সাবিত্রী দেবীর বাঁধন ছেঁড়ার কষ্ট ও যন্ত্রণা যেমন মর্মদাহী, তেমনি পুত্রাধিক রঞ্জুকে বিদায় জানাতে অপুত্রক নৃপেন্দ্রবাবুর মূক বেদনা বিদায়-লগ্নটিকে অশ্রুসজল করে তোলে।

কিন্তু ঝামেলা বাঁধে মঞ্জুকে নিয়ে। তার এক কথা, সোনাদাকে ছেড়ে সে কিছুতেই থাকতে পারবে না। কতভাবে তাকে বোঝানোর চেষ্টা হয়, তবু অবুঝ মঞ্জুর কান্না থামে না। শেষ পর্যন্ত রঞ্জুই তাকে শান্ত করে। রঞ্জুকে কথা দিতে হয়, সপ্তাহে অন্তত একখানা করে চিঠি সে লিখবে মঞ্জুকে এবং সে চিঠি হবে বেশ বড়সড়।

সবচেয়ে যা অবাক করে সবাইকে, তা হলো বিদায়ের ক্ষণে রঞ্জুর মামা অনাদিবাবুর ও তার মামিমার আচরণ। শিশুর মতো সারাক্ষণ অশ্রুবর্ষণ করে গেলেন অনাদিবাবু, রঞ্জুকে জড়িয়ে ধরে তার মামিমার সে কী ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্না! মুখে কুলুপ এঁটে রঞ্জু দাঁড়িয়ে থাকে নতমস্তকে।

হায়রে বেচারা! কী ফ্যাসাদ! কুনালের দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

খ্যাতির বিড়ম্বনা

॥ এক ॥

ব্যায়াম বা শরীরচর্চার দিকে কুনালের আগ্রহ নেই কোনদিনই। তবু গ্রামে থাকতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে ইস্কুলের ব্যায়ামাগারে হাজিরা দিতে হতো। রঞ্জুর জবরদস্তিই ছিল তার একমাত্র কারণ। বর্তমানে তা একদম ছাটাই হয়ে গেছে তার দৈনন্দিন জীবন থেকে। তবু মনে স্বস্তি নেই।

তার বড় আশা ছিল, কলকাতার কলেজী পরিবেশে পড়ে রঞ্জুও মুক্ত হবে ওই বিদঘুটে রোগের খপ্পর থেকে। তার মানে, নিজেও সে তা হলে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু মনে-মনে সে ক্রমেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, যখন দেখে, রোগ নিরাময় হওয়া তো দূরের কথা, রঞ্জুর মধ্যে তার প্রকোপ দিনে-দিনে বৃদ্ধির দিকে। নামকরা এক ব্যায়ামাগারেই সে শুধু ভর্তি হয়নি, সেইসঙ্গে রাইফেল-শুটিং, যুযুৎসু, লাঠি-ছোরা খেলা, সাঁতার ইত্যাদিতে তালিম নিতে শুরু করেছে প্রায় নিয়মিত।

নৈরাশ্যে প্রপীড়িত কুনাল। তার সমস্ত প্রত্যাশাই ধূলিসাৎ। শেষে একদিন আর থাকতে না পেরে সে খিঁচিয়ে উঠলো রঞ্জুর ওপরে,—তুই তাহলে বাইসেপ্‌স্ বাজিয়ে ষণ্ডামি করেই খাবি? বেশ-বেশ তা হলে পড়াশুনোয় আর কি দরকার? ওই সঙ্গে ভাঙা ব্লেডের স্বাধীন ব্যবসাটাও এক ফাঁকে শিখে নে মাস্‌ল্‌ওলা গুরুর কাছ থেকে।

তার মানে? —রঞ্জু জিজ্ঞেস করে।

—মানে আবার কি? এ কি আরবি-ফারসি নাকি যে, কথায়-কথায় মানে বলতে হবে?

কুনালের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে রঞ্জু বললে,—হুঁ, বুঝতে পারছি। তা পাঠ্য বইয়ের কোথায় আছে বলো তো রাসভ পণ্ডিত, শরীর সুস্থ রাখার জন্যে ব্যায়াম বা লাঠি-ছোরা খেলা ইত্যাদি রোজ এক-আধঘণ্টা ব্যয় করলে পড়াশুনোর ক্ষতি হয় বা সময়ের অপব্যয় হয়? নাকি উলটোটাই আছে যে, সুস্থ দেহেই সুস্থ মন ও মগজের বাস? কি, কথা বলছিস না যে? যাক গে, কাজের কথায় আসি। কথাটা বলবো-বলবো ভাবছিলাম, তা ভালই হলো। শোন চাঁদ, তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

কোথায়? —কুনাল সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে।

—জিম্‌নাসিয়্যামে। নিয়মিত।

'বিদ্যুৎস্পৃষ্ট' বলে একটা কথা কুনাল সাহিত্যে পড়েছে। আজ এই মুহূর্তে কথাটার খাঁটি অর্থ তার বোধগম্য হলো। এমন একটা প্রস্তাব কলকাতার কলেজ-জীবনে এসে রঞ্জু তার কাছে এই মুহূর্তে করতে পারে, সে কল্পনাও করতে পারে নি। আচমকা আঘাতে তাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সে লাফিয়ে উঠলো,—জিম্‌নাসিয়্যাম? আমি? নিয়মিত?

হ্যাঁ—নির্লিপ্ত কণ্ঠ রঞ্জুর ঃ নয় কেন? অত অবাক হবার কি হলো?

কুনালের বাক্‌স্ফূর্তি বন্ধ। শুধু বাক্‌স্ফূর্তিই বা কেন, বিস্ময়ে মনস্তাপে সব ফূর্তিই লোপ পাবার মতো।

মুচকি হেসে রঞ্জু বললে,—কী, ওরকম ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছিস যে? কলকাতার কলেজী আবহাওয়ায় এসে ব্যায়াম করাটা একটা রুচিহীন বিশ্রী ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছ নাকি? কিন্তু শুনে রাখ লম্বকর্ণ, ওটা মোটেই ঠিক নয়। হাত-পা-টিং টিং লম্বোদর সিংরাই শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষাসংস্কৃতি ও রুচির ধারকবাহক, কোন মহাপুরুষের এ অমূল্য বাণী কোথায় পড়েছ শুনি?

রঞ্জুর প্রতি-আক্রমণে কুনাল বেসামাল।

রঞ্জু আবার কথা বললে। কথা তো নয়, কুনালের কাছে মনে হচ্ছে যেন একঝাঁক বিষাক্ত হুল। বললে,—ভীম না হলে বৃকোদর হওয়া যায় না, বুঝলে পেটুকেশ্বর বাহাদুর? বৃকোদরী কাজটা ওভাবে বেশি দিন চালানো অসম্ভব।

কী! তার বর্তমান খাদ্য তালিকা নিয়ে বিনা হীন কটাক্ষ! কথাটা মনে হতেই দুরন্ত রাগে কুনালের আবার বাক্‌স্ফূর্তি ঘটলো। গর্জে উঠলো সে,—অর্থাৎ যণ্ড পণ্ডিতের ভাষ্য

অনুযায়ী আমাকে তার জন্যে কিংকং, গামা, হাতি, গণ্ডার, দানো পালোয়ান হতে হবে, তাই তো?

রাগে সে আর ভাষা খুঁজে পায় না।

রঞ্জু কিন্তু নির্বিকার। হাসতে-হাসতে বলে,—হ্যাঁ, বৃকোদরী কর্মটা যদি চালিয়ে যেতে চাও।

রঞ্জুর হাবভাব আর কথার ধরনে কুনাল আরো চটে যায়। জুতসই যুক্তি মাথায় আসে না। হাঁকপাঁক করতে-করতে সে গোঁ-গোঁ করে উঠলো,—আর তা নয় তো?

সহজ কণ্ঠে রঞ্জু বললে,—তা নয় তো দেহযন্ত্রটাকে সুস্থ সবল কর্মক্ষম রাখতে এক-আধঘণ্টা ব্যায়াম করলেই যথেষ্ট, যা আমি করছি। এর দ্বারা তুমি কারোরই উপকার করছো না, বুঝলে পেটুকচাঁদ, একমাত্র নিজের ছাড়া। তারপর সারাদিন ফ্যাশান সংস্কৃতি, রেস্তোরাঁ চষে বেড়াও, কোনও বাধা নেই। শেষেরটা অবিশ্যি একটু কম চষাই বিধেয়, নয়তো আখেরে পস্তানোর সম্ভাবনা।

রঞ্জুর মুখে তেমনি হাসি।

নাচার কুনাল কথার খেই হারিয়ে খাটের ওপর চিৎ হয়ে পড়লো। ততক্ষণে তার আর বুঝতে বাকি নেই যে, রঞ্জু তার সব খবরই মোটামুটি রাখে, আর ও যেরকম জেদী ও একগুঁয়ে তাতে যুক্তিতর্কে হার হওয়া মানে আর রেহাই নেই।

এবং হলোও তাই। কুনালের ভাগ্যে নেমে আসে সেই হৃদয়বিদারক ঘটনা। রঞ্জুর সঙ্গে জিম্‌নাসিয়্যামে তাকে যেতে হয় নিয়মিত। অকারণ গরহাজির নিষিদ্ধপ্রায় ঘটনা।

প্রথম প্রথম মাথাধরা, পেটকামড়ানি, শরীর ম্যাজম্যাজ ইত্যাদি এমন সব অসুখে কুনাল মাঝে-মাঝে আক্রান্ত হতে আরম্ভ করলো, যা বাইরে থেকে ধরা যায় না। কিন্তু রঞ্জুর হাত থেকে তবু নিস্তার নেই।

একদিন তো কুনাল বাথরুমে গিয়ে আশ্রয় নিলে। কি ব্যাপার? না, পেটের অবস্থা কাহিল।

পাঁচ মিনিট যায়, দশ মিনিট যায়। রঞ্জু ঠায় দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, তাড়া দেয়,—এই, কি হলো রে?

ভেতর থেকে কুনালের গলা খাঁকারি শোনা যায়। তার তখন বিবাগী হবার মতো মনের অবস্থা। কাঁহাতক আর ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা যায়! তেড়েফুঁড়ে সে বেরিয়ে এল ঃ রঞ্জুকে এই মারে কি, সেই মারে। রঞ্জুর কিন্তু ভাবান্তর নেই। ওর হাত ধরে সে রওনা হলো। তারপর যথারীতি আবার চলতে থাকে সেই নিত্যকর্মের ধারা—নিয়তির মতো যা থেকে কুনালের বুঝি রেহাই নেই।

॥ দুই ॥

রঞ্জু ও কুনাল তখন কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সেদিনও বিকেলে তারা আখড়ায় চলেছে। হ্যাঁ, কুনাল আজো জিম্‌নাসিয়্যাম বা ব্যায়ামাগার বলে না, বলে আখড়া। প্রথম প্রথম রঞ্জু এক-আধবার জানিয়েছিল। তারপর চুপ করে গেছে। মনে-মনে সে হাসেঃ বলুক গে, ঠিকমতো কাজ করলেই হলো।

পথ চলতে-চলতে নিজেদের মধ্যে তারা আলোচনায় মশগুল। হঠাৎ হই-চই—

চেঁচামেচি শুনে থমকে দাঁড়াল। রাস্তার দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলো দুজনে ঃ কী সর্বনাশ!

লালজামা গায়ে একটা বাচ্চা মেয়ে হেলেদুলে রাস্তা পার হচ্ছে। আর অন্য দিক থেকে শিং বেঁকিয়ে ধেয়ে আসছে প্রকাণ্ড এক ধর্মের ষাঁড়। তার দু-চোখ রক্তবর্ণ, মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরুচ্ছে। ষাঁড়টা খেপে গেছে, বোঝা যায়।

মেয়েটা এদিকে হই-চই শুনে আর ষাঁড়টাকে ছুটে আসতে দেখে ভয়ে রাস্তার মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। 'গেল-গেল' বলে চেঁচাচ্ছে সবাই, কিন্তু এগুচ্ছে না কেউ।

কুনাল কিছু বোঝার আগেই চোখের পলকে ছুটে গেল রঞ্জু এবং রাস্তা থেকে মেয়েটিকে তুলে নিয়েই উলটো ফুটপাথে গিয়ে উঠলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভোঁসভোঁস করতে করতে তীরবেগে বেরিয়ে গেল ষাঁড়টা। আর এক মুহূর্ত দেরি হলে মেয়েটি বা রঞ্জু কেউই আস্ত থাকতো না।

ষাঁড়টার এদিকে কি খেয়াল হলো, কিছুদূর গিয়েই ফিরে দাঁড়াল। তারপর আবার ছুটলো মেয়েটিকে লক্ষ্য করে।

পাশেই ফুটপাথের ধারে ঝাঁপতোলা এক পানবিড়ির দোকান। হ্যাঁচকা টানে তার একখানা বাঁশ টেনে নিয়েই রঞ্জু রাস্তায় এসে পড়লো।

হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল দোকানি। পরক্ষণে খ্যাপা ষণ্ড মূর্তির দিকে নজর পড়তেই, 'ই বাপ-অ জগড়নাথ-অ' বলে পেছন ফিরেই চোঁচা দৌড়। কোমরের সামনের দিককার কাপড় চেপে ধরে মুক্তকচ্ছ মহাপ্রভুর অনুচর নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল পাশের গলিতে।

এমনি অবস্থা কমবেশি আরো অনেকের। কারো কারো পরিধেয় নষ্ট হবার মুখে।

ষাঁড়টা এদিকে তেড়ে আসতেই, রঞ্জু পাশ কাটাল। তারপর কি যে ঘটলো, হুমড়ি খেয়ে পড়লো ষাঁড়টা। বাঁশটা দেখা গেল তার দুই পায়ের ফাঁকে, আর রঞ্জু তার দুই শিং মাটিতে চেপে ধরেছে। তার চিৎকার শোনা গেল,—ওর পেছনের পা দুটো বেঁধে ফেল। শিগগির—শিগগির!

রঞ্জুর জন্যে কুনাল ঘামে নেয়ে উঠেছে। রঞ্জুর চিৎকারে তার বুঝি সংবিৎ ফিরে এল। সে ছুটে গেল। ছুটে গেল আরো অনেকে। দুর্দান্ত খ্যাপা ষাঁড় ঝুটোপুটি করছে। সকলের মিলিত চেষ্টায় তার চার পা-ই বেঁধে ফেলা হলো।

এত বড় সাংঘাতিক ঘটনাটা ঘটতে দু-তিন মিনিটের বেশি সময় লাগেনি।

পরে শোনা গেল, ষাঁড়টা ইতিমধ্যে জনা পাঁচেককে জখম করে এসেছে। তার মধ্যে একজনের অবস্থা সঙ্কটজনক।

এর পর যা শুরু হয়, তাতে রঞ্জুর অবস্থা সঙ্কটজনক। স্থানীয় লোকজন ও পথচারীদের উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ ও অভিনন্দনের মধ্যে দ্রুত পট-পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পুলিশবাহিনী নিয়ে অচিরে হাজির হন বড় দারোগা। মেজো, সেজো ও ছোটরাও বাদ যান না। তার পরেই অকুস্থলে ঘটে ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের আবির্ভাব।

এরপর সদলবলে থানায় গমন। সেখানে রঞ্জুর প্রশংসায় সবাই যখন পঞ্চমুখ, তখন এসে হাজির হলো খবরের কাগজের রিপোর্টার এবং প্রেস ফটোগ্রাফাররা। তাদের প্রশ্নের তোড়ে রঞ্জু বিব্রত নাজেহাল। দায়সারা জবাব দিয়ে অনেক প্রশ্ন সে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কুনাল তা বরদাস্ত করতে নারাজ। বন্ধুগর্বে সে তখন টইটম্বুর। ফলে জবাবে কোন ঘাটতি থাকে না।

পরদিন দৈনিক কাগজে রঞ্জুর ফোটো ও চমকপ্রদ নানা হেডিংসহ ফলাও করে বের হয় সংবাদটি। যেসব মন্তব্য করা হয়, তার নির্গলিতার্থ হলো—কৃতী ছাত্র শ্রীমান্ রঞ্জনকুমার দেশের ছাত্র-তরুণদের আদর্শ। বাঙলার অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে বাঙালি কিশোর তরুণ সমাজকে আজ লেখাপড়ায় এবং শৌর্যবীর্যে অর্থাৎ শক্তি, সাহস ও বীরত্বে শ্রীমান রঞ্জনকুমারের মতো হতে হবে, তাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ব্যস, খ্যাতির দাপট রঞ্জুকে যেন রাতারাতি পেড়ে ফেলল। শুরু হলো আর একদফা বেধড়ক কাণ্ড—হোটেলে, পাড়ায়, ব্যায়ামাগারে, কলেজে সর্বত্র, তাকে ঘিরে অভিনন্দন আর অভ্যর্থনার ধুন্ধুমার কাণ্ড।

সব কিছুর যোগফলে রঞ্জুর অন্তরাত্মা তখন আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' বলে। আর সময়ে অসময়ে দাঁত খিচোচ্ছে সে কুনালের ওপর ঃ তোর জন্যেই তো এই অবস্থা! তুই কেন অতসব বলতে গেলি।

কুনাল কখনও মুচকি মুচকি হাসে, কখনো বা গোবেচারার মতো চোখ পিটপিট করে।

এ যেন তার ব্যায়াম করা নিয়ে রঞ্জুর জবরদস্তির প্রতিশোধ। হালে রঞ্জুর অন্তত তাই মনে হচ্ছে।

খবরের কাগজে খবরটা পড়ে দেশ থেকে ছুটে এলেন নিরঞ্জনবাবু ও নৃপেন্দ্রবাবু। সঙ্গে শ্রীমতী মঞ্জুরানীও। কেউ তাকে আটকাতে পারেনি। এসেই সে তারই একমাত্র সোনাদাকে জড়িয়ে ধরলো। ধুমধাড়াক্কা শুরু হবার পর এই প্রথম রঞ্জুর মুখে হাসি ফুটলো।

জলেজঙ্গলে কিসের ইঙ্গিত

॥ এক ॥

ইন্টারমিডিয়েট ফাইনাল পরীক্ষাতেও রঞ্জু তৃতীয় স্থান অধিকার করলো। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সাধ তার বহুদিনের। কিন্তু রাজসিক খরচ তাতে। এমনিতে পিতৃপ্রতিম কাকাবাবু এবং মাতৃসমা কাকিমার কাছে তার কৃতজ্ঞতা ও ঋণের শেষ নেই। তার ওপর আবার এই বোঝা? রঞ্জুর কাছে তা অচিন্তনীয়।

তার এই গোপন বাসনার কথা কুনাল জানতো কিছুটা। কথাটা সে একদিন পাড়তেই রঞ্জু শাসিয়ে উঠলো,—সাবধান কুনু, এ সম্বন্ধে তুই যদি দ্বিতীয়বার কোনও কথা উচ্চারণ করিস আর তা যদি কোনওভাবে কাকাবাবু-কাকিমার কানে যায়, তা হলে আমি কিন্তু পড়াশুনোই ছেড়ে দেব।

কুনাল চেনে বন্ধুকে। মুখে সে কুলুপ এঁটে দিল।

কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে রঞ্জু ভর্তি হলো বি.এস-সি. ক্লাসে। আর কুনাল বি.এ-তে। অনার্স নিলো সে ইকনমিকসে।

রঞ্জুর সহপাঠী রথীন মণ্ডল। রঞ্জুকে তার ভারি পছন্দ। রঞ্জুর সঙ্গেই তার বেশির ভাগ সময় ওঠাবসা। মাঝে-মাঝে হোটেলেও সে চলে আসে।

রথীনের বাড়ি ক্যানিং। তাদের বাড়িতে যাবার জন্যে রঞ্জু ও কুনালকে সে বারবার অনুরোধ জানিয়েছে। বলেছে, ইচ্ছে করলে বাদা বা সুন্দরবনেও যাওয়া যেতে পারে। তাদের বন্দুক আছে। আর রাইফেল-শুটিংয়ে রঞ্জুর যেরকম পাকা হাত, তাতে চাই কি শিকারটিকারও চলতে পারে। যাতায়াতের লঞ্চ ও অন্য যাবতীয় বন্দোবস্তের দায়িত্ব রথীনদের।

প্রস্তাবটা লোভনীয় সন্দেহ নেই, বিশেষত রঞ্জুর কাছে। সুন্দরবন দেখার ইচ্ছা তার বহুকালের। সুন্দরবনের কথা সে বইতে পড়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করেছে বিভিন্ন অভিজ্ঞজনের সঙ্গে। তবু নানা কারণে প্রস্তাবটা এতদিন প্রস্তাবই থেকে গেছে।

কিন্তু টনক নড়লো ফোর্থইয়ারে বা চতুর্থ বর্ষে উঠে। রথীনের কথাটা তার মনে ধরলোঃ কলেজ-জীবনে এটাই তো শেষ বছর। এরপর কে যে কোথায় ছিটকে পড়বে, কে জানে!

অতএব শীত পড়তেই তোড়জোড় শুরু হয়। দলে কুনাল তো আছেই, খবর পেয়ে আরো তিনজন সহপাঠী এগিয়ে এল। রথীন সেইমতো বাড়িতে জানিয়ে দিলো বাবা ও দাদাকে। নিজেও মাঝে একদিন গিয়ে তদারক করে এল সবকিছু।

কুনালের কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হলো না। রওনা হবার আগের দিন রাতে তার হলো জ্বর। সামান্য হলেও এই জ্বরগায়ে যাওয়া ঠিক নয়—বিশেষত জলজঙ্গল এলাকায়। অথচ এই শেষ পর্যায়ে যখন সব ব্যবস্থাই পাকা, তখন যাত্রা স্থগিত রাখাই বা কি করে সম্ভব? কাজেই কুনালের পীড়াপীড়িতে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রওনা হতে হয় রঞ্জুকে। যাবার সময় হোটেলমালিক নীলকান্তবাবুকে সে বারবার বলে যায় কুনালের দিকে বিশেষ নজর রাখতে...

নদীর ধারে ক্যানিং শহর রঞ্জুর বেশ ভালো লাগে। যাত্রার সমস্ত আয়োজনই দেখা গেল নিখুঁত ও সম্পূর্ণ। ভাড়া করা লঞ্চটাও রঞ্জুরা দেখে এল একসময়। মাঝারি আকারের জলযানটিতে তাদের বেশ মনে ধরে। আর দুপুর ও রাত্রে খাওয়াদাওয়ার বিবরণ দিয়ে কি লাভ! সে এক রাজসিক ব্যাপার।

পরদিন ভোরবেলা রথীন-রঞ্জুরা তৈরি হয়ে লঞ্চ ঘাটে এসেই হতভম্ব। লঞ্চের সারেং বেঁকে বসলো, সে যেতে পারবে না।

কেন? কেন? কেন?

কোনও প্রশ্নেরই সারেং সন্তোষজনক জবাব দেয় না। যেটুকু বলে, তা ভাসা-ভাসা, আজেবাজে, আর ঘাড় নেড়ে স্পষ্ট জানায়, তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

লজ্জায় অপমানে রথীন প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গেছিল। তার পরেই যেন খেপে উঠলো। সারেংয়ের সঙ্গে হাতাহাতি বাধে আর কি!

খবর পেয়ে বাড়ি থেকে ছুটে এলেন রথীনের বাবা, দাদা এবং আরও অনেকে।

লঞ্চ ঘিরে শুরু হলো হই-হল্লা।

রথীনের বাবা বিশ্বনাথবাবু ধীরস্থির গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। সারেংকে বললেন,—শোন দিবাকর, চার-পাঁচদিন আগে তোমার সঙ্গে কথা পাকা হয়েছে। গতকাল সকালের দিকেও দেখা হয়েছে, কথাও হয়েছে তোমার সঙ্গে। তখনো সব ঠিক ছিল। এখন যাত্রার শেষ মুহূর্তে কিনা এই কাণ্ড! কাজেই বাজে অজুহাত ছাড়, আসল ব্যাপারটা খুলে বলো। এত বড় কথার খেলাপ ও অপমান যে কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যায় না, তা তোমার বোঝা দরকার। এভাবে তুমি কি এখানে কাজকারবার চালাতে পারবে, মনে করো?

আরও কিছু কথা চালাচালি ও চাপের পর শেষ পর্যন্ত ফাঁস হলো আসল রহস্য। স্থানীয় বাসিন্দা সাতকড়ি বিশ্বাস অনেক বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে গতকাল সন্ধ্যার পরে এসে ভাড়া করেছে লঞ্চটা। তার কাছ থেকে মোটা টাকা আগামও নিয়েছে দিবাকর সারেং।

দালালি-টাউটগিরি করে সাতকড়ির সংসার চলে। ইতিমধ্যে সে এসে পৌঁছোতেই সবাই ঘিরে ধরলো তাকে। সবার দাবি ঃ তাকে বলতে হবে, কে সেই শাঁসালো মক্কেল যার হয়ে সে শেষ মুহূর্তে এসেও অত টাকার লোভ দেখিয়ে সবকিছু ওলটপালট করার স্পর্ধা দেখাতে পারলো?

ক্রমেই বাড়ছে লোকজনের ভিড় ও জটলা। তাদের মধ্যে সাতকড়ি বা দিবাকরকে সমর্থন করার মতো কেউ নেই। কিন্তু সাতকড়ির ভাবখানা যেন ওসব সে থোড়াই কেয়ার করে! মুখে তার কথার খই ফুটতে থাকে—আগড়ুমবাগড়ুম উলটো-পালটা কথার ফুলঝুরি। আর থাকতে না পেরে রথীনের দাদা সুধীন গিয়ে সাতকড়ির জামার কলার চেপে ধরলো। রুখে গেল আরও কয়েকজন। হাটুরে মার শুরু হয় আর কি! বিশ্বনাথবাবু নিরস্ত করেন সবাইকে।

এদিকে দিবাকর সারেংয়ের মুখ চুন। পারলে সে তক্ষুনি লঞ্চ নিয়ে সরে পড়ে। কিন্তু উপায় নেই, লঞ্চে কড়া পাহারা।

নিরুত্তাপ কণ্ঠে সাতকড়িকে বললেন বিশ্বনাথবাবু,—ঝামেলা বাড়িও না, বাপু। আসল কথাটা খুলে বলো। বুঝতেই পারছো, এত বড় অন্যায্য কাজ করে তুমি বা দিবাকর পার পাবে না।

সাতকড়ির তা আর বুঝতে বাকি নেই। জনতার মেজাজ না ধরতে পারার মতো বোকা সে নয়। তবু যাত্রা দলের ভীমের অভিনয় করে চলেছিল এতক্ষণ। কিন্তু বিশ্বনাথবাবুর কথায় সাহসিকতার সে মুখোশটুকুও এবার খসে পড়লো। হড়বড় করে যা সে বলে গেল, তার সারমর্ম হলো—এখানে ক্যানিংয়ে দু-জন শ্বেতাঙ্গ সাহেব এসেছে। তারা অগাধ টাকার মালিক। সুন্দরবন ঘুরতে চায়। তার জন্যেই এই লঞ্চ ভাড়া। গতকাল সন্ধ্যায় এখানে আর কোনও লঞ্চ ভাড়া ছিল না। গোড়ায় দিবাকর অবিশ্যি বলেছিল, তার লঞ্চ ভাড়া হয়ে গেছে। কিন্তু সে অনেক বেশি ভাড়া কবুল করায় ও মোটা টাকা আগাম দিতে চাওয়ায় দিবাকর রাজি হয়ে যায়। সাহেবরা বলে দিয়েছিল, যত টাকা লাগে লাগুক, আজকের জন্যে লঞ্চ একটা চাই-ই চাই।

বিশ্বনাথবাবুর মুখে নীরস ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে। কঠিন কণ্ঠে তিনি বললেন,—আর তুমিও অমনি দুটো পয়সার লোভে ঝাঁপিয়ে পড়লে! ন্যায়-অন্যায় বিচার করলে না। না বাপু সাতকড়ি, মান-সম্মান লজ্জা-শরম তোমার বা দিবাকরের না থাকতে পারে, কিন্তু অন্যদেরও কি তেমনি মনে করো? বেয়াদবির—

বলতে-বলতে থেমে যান বিশ্বনাথবাবু। দূরে দেখা গেল, দুই শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক দ্রুতপায়ে এদিকে আসছেন। সবাই কেমন একটু হকচকিয়ে যায়। পায়ে-পায়ে ভিড়টা সরে যায় কিছুটা।

রঞ্জু একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। নীরব দর্শক ও শ্রোতা সে। সাদা চামড়ার মোহিনী শক্তি ও মাহাত্ম্য দেখে সে মনে-মনে হাসে। প্রায় দুশো বছরের গোলামি আর ভেজাল শিক্ষা ও অশিক্ষারই এটা নিটফল।

শ্বেতাঙ্গ দুজনের একজন বয়সে প্রবীণ, অন্যজন তরুণ। দুজনেই লম্বাচওড়া জোয়ান। কথা বলতে-বলতে তাঁরা আসছেন। প্রবীণকে, মনে হলো, কিঞ্চিৎ বিরক্ত ও উত্তেজিত।

সাহেবদের দেখেই সাতকড়ির আগের চেহারা আবার ফিরে এল। উৎসাহে সে চনমন করে ওঠে।

প্রবীণ শ্বেতাঙ্গটি সাতকড়িকে জিজ্ঞেস করলেন,—ব্যাপার কি?

সঙ্গে-সঙ্গে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি সহকারে সাতকড়ির মুখ থেকে অনর্গল বেরোতে শুরু করে এমন এক শব্দস্রোত যার অর্থ না বুঝতে পারেন শ্বেতাঙ্গ দুজন, না পারেন এদেশিয়রা। শ্বেতাঙ্গ দুজন হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রঞ্জু লক্ষ্য করছিল বিদেশি দুজনকে। এবার সে ধীরপায়ে এগিয়ে গেল। সাতকড়িকে থামিয়ে দিয়ে অভিবাদন জানালে আগন্তুক দুজনকে,—গুডমর্নিং স্যার, ওয়েলকাম ইন আওয়ার ল্যান্ড।

আগন্তুক দুজন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সোৎসাহে তাঁরা প্রত্যাভিবাদন জানান, মর্নিং-মর্নিং।

তার পরেই প্রবীণ ভদ্রলোকটি যোগ করেন, নিজেদের পরিচয় দি। আমার নাম জর্জ মেলস্যাম অর এ আমার ছেলে রবার্ট। আমরা কানাডার বাসিন্দা। তোমার নাম জানতে পারি কি?

নিশ্চয়ই। আর. কে. চৌধুরী।

থ্যাঙ্কিউ মিস্টার চাওধ্‌রি। —মিঃ মেলস্যাম জিজ্ঞেস করেন ঃ বলতে পারো, এখানে কিসের গণ্ডগোল?

ক্ষণকাল কি যেন ভাবে রঞ্জু, তারপর মৃদু হেসে বললে,—পারি। কিন্তু আপনারা বিদেশি, আমাদের অতিথি সত্যি কথা বললে কিছু মনে করবেন কিনা ভাবছি।

মোটেই না। —মিঃ মেলস্যাম বললেন ঃ তুমি নিঃসংকোচে বলতে পার, কিচ্ছু মনে করবো না।

বেশ, খুশি হলাম। —ধীরে-ধীরে রঞ্জু বলে ঃ শুনলাম, আপনারা নাকি বিরাট ধনী লোক, অগাধ অর্থের মালিক। সবচেয়ে বড় গণ্ডগোল বেধেছে ওইখানে—আপনাদের টাকার গরম দেখাতে যাবার ফলে। আপনাদের মনে রাখা উচিত, আমরা ভারতীয়রা অর্থের দিক থেকে গরিব হতে পারি, কিন্তু মানসম্মানবোধ আপনাদের চেয়ে কিছুমাত্র কম থাকবে কেন? এখানকার সবাইকে কি আপনারা ওই সাতকড়ির মতো দালাল টাউট মনে করেছেন?

স্তম্ভিত আগন্তুক দুজন। কান তাঁদের লাল হয়ে উঠেছে।

শুনতে-শুনতে মৃদুকণ্ঠে একসময় 'এ কী শুনছি—' বলে চুপ করে গেছিলেন মিঃ মেলস্যাম। রঞ্জুর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষে শুকনো গলায় বললেন,— এ কী গুরুতর অভিযোগ! ভারতে এসে এই প্রথম এ ধরনের অভিযোগ শুনতে হলো। কিন্তু কেন, তা কিন্তু এখনও জানতে পারিনি, মিস্টার চৌধুরী। টাকার গরম দেখানোর বা তোমাদের সম্মানে আঘাত দেবার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কী ঘটেছে, দয়া করে একটু খুলে বলবে কি?

সাহেব দুজনের হাবভাবে ও কথায় রঞ্জুর মনেও খটকা লেগেছে। আদ্যোপ্রান্ত সমস্ত ঘটনার বিবরণ সে দিয়ে গেল সংক্ষেপে।

শুনতে-শুনতে মিঃ মেলস্যামের ভ্রু কুঁচকে গেছে। রবার্ট নিশ্চল, হতভম্ব। দুজনেরই মুখ লাল হয়ে উঠেছে। শেষে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সাতকড়ির দিকে বারেক তীব্র দৃষ্টি হেনে গভীর কণ্ঠে মিঃ মেলস্যাম বললেন,—তুমি যা বললে মিঃ চৌধুরী, তাতে তোমাদের অপমান বোধ করাটা সম্পূর্ণ জাস্টিফায়েড। তবে বিশ্বাস করো, দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এ ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানি না। মুশকিল হচ্ছে, তোমাদের ওই সাৎক্যারির কথা আমরা বুঝি নে, আমাদের কথাও

ও বোঝে না। দয়া করে তুমি কি ওকে একবার জিজ্ঞেস করবে, কে ওকে এভাবে টাকার খেল দেখিয়ে লঞ্চ ভাড়া করতে বলেছে?

ব্যাজার মুখে সাতকড়ি দাঁড়িয়ে আছে। রঞ্জু তার দিকে কেবল ফিরেছে, এমনসময় দূরে দেখা গেল, একটা জিপ আসছে। মুহূর্তে জনতা সচকিত হয়ে উঠলো। গুঞ্জন ওঠে,—পুলিশ! পুলিশের জিপ আসছে!

পুলিশ! রঞ্জুর চোখমুখ মুহূর্তে কঠোর হয়ে ওঠে। বিশ্বনাথবাবু এগিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে সুধীন, রথীন প্রভৃতিও।

ভ্রূ কুঁচকে তীক্ষ্ণ চোখে মিঃ মেলস্যামের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে রঞ্জু বললে, —পুলিশ? পুলিশ কেন? পুলিশকে কেন খবর দিয়েছেন আপনারা? পুলিশ দিয়ে লঞ্চ দখল করবেন?

পুলিশ আসছে শুনে মিঃ মেলস্যামও কম হকচকিয়ে যাননি, তেমনি রবার্টও যথেষ্ট বিচলিত। বিব্রত কণ্ঠে মিঃ মেলস্যাম বললেন,—উত্তেজিত হয়ো না, মিঃ চৌধুরী। আজ সকালটা দেখছি তাজ্জব কাণ্ডে ঠাসা। দয়া করে একটু ধৈর্য ধরো, সব পরিষ্কার হবে।

জিপ এসে থামতে, তা থেকে পুলিশবাহিনী নিয়ে নেমে এলেন যে অফিসার, রঞ্জু শুনলো তিনিই বড় দারোগা। তাঁর সঙ্গে নেমে এলেন কেতাদুরস্ত সাহেবী পোশাক পরা আর একজন ভারতীয়।

ম্লান হেসে বড় দারোগার দিকে এগিয়ে গেলেন বিশ্বনাথবাবু। আর মিঃ মেলস্যাম ও রবার্টকে দেখে দ্রুতপায়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসেন ওই পরিপাটি সাহেবী পোশাকের ভদ্রলোকটি। মুখে তাঁর মোলায়েম বিনীত হাসি।

রুক্ষ চাপা কণ্ঠে মিঃ মেলস্যাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, এসব কি ব্যাপার, মিঃ মিশ্র? তুমিই কি থানা থেকে পুলিশ এনেছো?

হ্যাঁ, স্যার। —সবিনয়ে ঘাড় নাড়েন মিঃ মিশ্র।

কেন? কে তোমাকে বলেছে থানায় যেতে, পুলিশ আনতে? আমাদের না জানিয়ে থানায় যাবার কারণ কি? —গভীর বিরক্তি ও অসন্তোষ ফুটে ওঠে মিঃ মেলস্যামের কণ্ঠে।

নিদারুণ ঘাবড়ে যান মিঃ মিশ্র। আমতা-আমতা করে বললেন,—সাতকড়ি বিশ্বাসের মুখে শুনলাম, এখানে উত্তেজিত জনতার ভিড়। তাই আপনাদের নিরাপত্তার জন্যে—

থাম তুমি! —মিঃ মেলস্যামের কণ্ঠে যেন চাপা সিংহগর্জন। তার পরেই তিনি এগিয়ে গেলেন দারোগার দিকে, তাঁকে অভিবাদন জানালেন,—সুপ্রভাত, মিঃ ও. সি।

দারোগাবাবু প্রত্যাভিবাদন জানাতে, মিঃ মেলস্যাম নিজের ও ছেলের পরিচয় দিয়ে বললেন,—আপনার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী, মিঃ ও.সি। আমার লোক অকারণে আপনাকে এ পর্যন্ত টেনে এনে খুবই অন্যায় করেছে। আপনার এই অযথা সময় নষ্ট ও হয়রানির জন্য আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত ও দুঃখিত।

দারোগাবাবু সহাস্যে বললেন,—না, না, মিঃ মেলস্যাম, অত কুণ্ঠিত হবেন না। এই যে মিঃ বিশ্বনাথ মণ্ডলকে দেখছেন, ইনি এ অঞ্চলের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁকে এখানে দেখে অবাক হয়েছিলাম। মনে হয়, কিছু ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার ঘটেছে।

ঠিকই ধরেছেন। —সঙ্গে-সঙ্গে সায় দেন মিঃ মেলস্যাম ঃ সে ভুল বোঝাবুঝির নিরসন আমাকেই করতে হবে এবং তা এখানেই এবং এখুনি।

দারোগা বিদায় নিতে রঞ্জুর মারফৎ তিনি পরিচিত হলেন বিশ্বনাথবাবু এবং অন্য সকলের সঙ্গে। তারপর সীমাটুকু বজায় রেখে চোস্ত ভাষায় তাঁকে যতখানি ধোলাই করা সম্ভব, তাই করলেন।

মিঃ মেলস্যামের অনুরোধে রঞ্জু তাঁর কথা বাংলায় তর্জমা করে শুনিয়ে দেয় সাতকড়িকে।

ততক্ষণে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, মিঃ মেলস্যাম ও রবার্টের অজ্ঞাতসারে লঞ্চ সংক্রান্ত সমস্ত কাণ্ডটা মিঃ মিশ্রই ঘটিয়েছেন সাতকড়ির সহযোগিতায়।

সবশেষে ম্লানকণ্ঠে মিঃ মেলস্যাম বললেন,—বুঝলে মিঃ মিশ্র, নিজের দেশ ও দেশবাসীকে যারা ভালোবাসে না, তারা বড় অভাগা। তাই দেশের মানুষকে তারা চিনতেও পারে না। তাদের হাতে বিপন্ন হয় দেশের ও দেশবাসীর ন্যায্য স্বার্থ ও মানসম্মান। কয়েক দিন পরে আমরা নিজের দেশে ফিরে যাব। তুমি থাকবে এ দেশে। এটাই তোমার জন্মভূমি। আজকের এই অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা মনে রাখলে, তোমার উপকার হবে, বুঝলে?

এবার দিবাকর সারেংকে ডাকেন মিঃ মেলস্যাম এবং রঞ্জুর মাধ্যমে তাকে জানান,—আমাদের পক্ষ থেকে যে টাকা তোমাকে আগাম দেওয়া হয়েছিল, তা ফেরত দাও। আমরা যাচ্ছি না, মিঃ চৌধুরী ও তার দল যাবে। কথার খেলাপ করে তুমি অত্যন্ত নোংরা কাজ করেছ।

ভয়ে ভাবনায় দিবাকরের তখন করুণ অবস্থা। সুতরাং মিঃ মেলস্যামের নির্দেশমিতো কাজ করতে একমুহূর্ত সময়ও সে অযথা নষ্ট করে না।

রঞ্জু এদিকে চমৎকৃত। স্বল্পকালীন এই ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে মানুষ হিসাবে মেলস্যামের যে পরিচয় বেরিয়ে এসেছে, তা অসামান্য মনে হয় তার কাছে। প্রবীণ কানাডীয় ভদ্রলোকটির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা তাকে মুগ্ধ করেছে।

দিবাকর টাকাটা ফেরত দিতেই সে বললে,—আমাদের একটা আর্জি আছে, মিঃ মেলস্যাম। সুন্দরবনে আপনারা কিজন্যে যাচ্ছেন—নিছক বেড়ানোর উদ্দেশ্যে, না অন্য কোনও কারণে—জানি না। আমাদের একান্ত অনুরোধ, আপনারাও চলুন আমাদের সঙ্গে। বেড়ানো ছাড়া আর কোনও কাজ যদি আপনাদের থাকে, অনায়াসে তা করতে পারবেন। আমাদের কোনও অসুবিধেই হবে না। কারণ আমরা যাচ্ছি স্রেফ সুন্দরবন দেখতে। আপনারা গেলে সবাই আমরা অত্যন্ত খুশি হবো।

রঞ্জুর কথার সমর্থনে অন্যেরাও হই-হই করে উঠলো। মেলস্যাম সাহেবের চোখের তারা বুঝি চকচক করে ওঠে। রঞ্জুর চোখে চোখ রেখে কি ভাবেন তিনি ক্ষণকাল, তারপর বললে,—তা হয় না, মিঃ চৌধুরী। টাকাটা ফেরত নেবার আগে এটা বললে না? উঁহুঁ আর যাওয়া চলে না।

সে কী! বোকা-বোকা মুখে রঞ্জু বললে : তাতে আবার কি দোষ হলো? এ দেশে আপনারা আমাদের মাননীয় অতিথি। আমাদের বেড়ানোর লঞ্চ ভাড়া আপনারা দেবেন, এটা কি শোভন, না সঙ্গত? তা ছাড়া আপনিই তো বললেন, আপনাদের পক্ষ থেকে এভাবে লঞ্চ ভাড়া করাটা অন্যায় হয়েছে। যাই হোক মিঃ মেলস্যাম, আজকের ঘটনার মধ্য দিয়ে যে দৃষ্টান্ত আপনি স্থাপন করলেন, তাতে আপনার জন্মভূমি কানাডা আমাদের চোখে অত্যন্ত বড় হয়ে উঠেছে। দয়া করে আপনারা চলুন, অমত করবেন না।

ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বিশ্বনাথবাবুও অনুরোধ জানান। অন্যরাও গলা মেলালো।

মেলস্যাম সাহেব ইতস্তত করেন, শেষে তাকান রবার্টের দিকে। রঞ্জুর অনেকটা সমবয়সীই হবে রবার্ট।

সমস্ত ঘটনা সে এতক্ষণ নীরবে দেখেছে ও শুনেছে, আর বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছে রঞ্জুকে। নিচু গলায় সে বললে,—আমার আপত্তি নেই। চলো যাওয়া যাক।

রঞ্জুর কাঁধে জোরে এক থাবা মেরে মিঃ মেলস্যাম বললেন,—তুমি ভারি দুষ্টু বুঝলে। ভেবো না, মানুষ চেনার ক্ষমতা আমার নেই। এশিয়া ও ভারতের নানা জায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু আজকের মতো অভিজ্ঞতা কোথাও হয়নি। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে একটা লাভ হলো, তা হচ্ছে তোমার সঙ্গে পরিচয়। তোমাকে মনে থাকবে। বেশ, চলো, আমরা যাব। তোমার সঙ্গে আরও আলাপ করা যাবে। তা শোনো, মিঃ মিশ্র এবং আমাদের আর এক সহকারী মিঃ স্মিথকে সঙ্গে নিতে কোন আপত্তি আছে কি?

একদম না। —রঞ্জু জানালে।

লঞ্চ ঘুরছে সুন্দরবনের জলেজঙ্গলে। বিস্তীর্ণ সুন্দরবনের বুকে সর্বত্র জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে নদী খালনালা আর জলার এক বিচিত্র গোলকধাঁধা।

লঞ্চ কখনও চলেছে চওড়া উত্তাল নদীর কুল ঘেঁসে, কখনো বা খালের ভেতর দিয়ে। দুপাশে বনভূমি। কোথাও ঘন ও গভীর। কোথাও বা পাতলা কিছুটা। সরু খাল বা নালা দিয়ে যাওয়ার সময় নুয়ে পড়া গাছগাছালির পাতা ডালপালা বুঝি হাত বাড়িয়ে ধরা যায়।

রঞ্জুর চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি। দু-চোখ ভরে সে দেখছে সবুজে শ্যামলে মনোহর সুন্দরবনকে, যা সে কল্পনায় দেখেছে অসংখ্যবার। শান্ত নিস্তব্ধ অরণ্য। কান পাতলে শোনা যায় নদীখালের কলধ্বনি। মাঝে-মাঝে কানে আসে পাখির কলকাকলি আর বনমর্মর। কখনও-সখনও নজরে পড়ে গাছে-গাছে বানরকুলের লম্ফঝম্প-মাতামাতি। বনাধীশ ব্যাঘ্র মহারাজের দেখা না মিললেও, দূর থেকে সুন্দরবনকে মনে হয় রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর, অনভিজ্ঞ নবাগতদের কাছে ভয়ঙ্কর মনে হওয়াও আশ্চর্য নয়।

রওনা হবার পর রঞ্জুর অন্যতম প্রধান কাজ হয়েছিল দুজন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করা। একজন লঞ্চের সারেং দিবাকর আদক, অন্যজন বদর শেখ।

সুন্দরবনের পোড়-খাওয়া অভিজ্ঞ গাইড বৃদ্ধ বদর শেখকে বিশ্বনাথবাবুই পাঠিয়েছেন দলের সঙ্গে। তাঁর নির্দেশ, সুন্দরবনে বদর শেখের কথাই আইন। সবাইকে তা মেনে চলতে হবে বিনা ওজর-আপত্তিতে।

সরলপ্রাণ বুড়ো মানুষটি সুন্দরবন সম্পর্কে রঞ্জুর আগ্রহ ও পড়াশুনো দেখে খুশি হয়ে ওঠে। সবচেয়ে খুশি হয় তার খোলামনের অন্তরঙ্গ অমায়িক ব্যবহারে। মন খুলে সে বলে যায় সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলের কথা আর অরণ্যের গভীরে তার দীর্ঘজীবনের নানা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কাহিনী, যা কখনও হিংস্র ভয়াল, কখনও বা মধুর সুন্দর। সুন্দরবনই বৃদ্ধ মানুষটির প্রাণ, তার খাওয়াপরার একমাত্র উৎস। রঞ্জু তন্ময় হয়ে শোনে তার কথা। বদর শেখকে তার মনে হয়, পুরনো ও হাল আমলের সুন্দরবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার এক অফুরন্ত খনি।

বুড়ো গাইডের মন পেতে রঞ্জুকে বলতে গেলে কোনও বেগই পেতে হয়নি। কিন্তু দিবাকরের বেলায় তা হয় না—বেশকিছু কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। রঞ্জুর ওপর মন তার

তেতো হয়ে আছে সেই সকাল থেকেই। ইংরেজি ভাষা সে বোঝে না। মেলস্যাম সাহেবের দোভাষী হিসাবে রঞ্জুর ভূমিকায় তার মনে তাই জমেছে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মেঘ। তা ছাড়া অতীতের বিভিন্ন ঘটনায় এইসব শহুরে লেখাপড়াজানা ছোকরা বাবুদের সম্বন্ধে সে সতর্ক ও সন্দিহান সবসময়।

তার নির্লিপ্ত উদাসীন ব্যবহারে রঞ্জু কিন্তু অবাক হয় না। এজন্য সে মনে-মনে হয়তো প্রস্তুতও ছিল কিছুটা। তাই ক্ষণেক ভেবে আলোচনার মোড় সে ফেরাল সকালের ঘটনার দিকে। বিদেশি আগন্তুকদের কেন্দ্র করে সকালে যেসব কাণ্ড ঘটেছে, তা সে সবিস্তারে অকপটে খুলে ধরলো দিবাকরের সামনে। বাদ দেয় না কিছুই। শেষে তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলে, —এবার বলো দাদা, দেশের এবং আমাদের সকলের মানসম্মান রক্ষা করতে এছাড়া আমার আর কি করার ছিল?

শুনতে-শুনতে দিবাকরের মনের আকাশ ততক্ষণে প্রায় স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। রঞ্জুর মুখে আজ সে এমন সব কথা শুনছে, যা এতদিন কেউ তাকে এমন করে কখনও বলেনি।

রঞ্জুর আকস্মিক প্রশ্নে তাই সে থতমত খেয়ে যায়। কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে থেকে শেষে ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,—স্বীকার আমাকে করতেই হবে যে লোভে পড়ে মোটেই ঠিক কাজ করিনি।

পাশে বসা রঞ্জু তাকে দু-হাতে প্রায় জড়িয়ে ধরলো।

এমনি করে রঞ্জুর নিষ্কলুষ দরাজ হৃদয়ের স্পর্শে দিবাকরের মনের কোন কপাটই আর বন্ধ থাকতে পারে না। অচিরে দুজনের মধ্যে গড়ে ওঠে এক মিষ্টি মধুর সম্পর্ক।

দিবাকর বা বদর শেখের কাছ থেকে রঞ্জু শুধু সুন্দরবনের কথাই শোনে না, শোনে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনীও। শুনতে-শুনতে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছায়াচ্ছন্ন দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত সব অবজ্ঞাত জীবনের ছবি। তা যেমন হাসিকান্নায় মেদুর, তেমনি ক্ষতবিক্ষত বেঁচে থাকার নিরন্তর লড়াইয়ে।

ভ্রমণ-সূচির একটা মোটামুটি ছক আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল। বিশ্বনাথবাবুর উপস্থিতিতে বদর শেখ, দিবাকর, রথীন প্রভৃতি তৈরি করেছিল ওটা।

কিন্তু মেলস্যাম সাহেবরা সঙ্গে আসায় এবং অন্যদের তাগিদে বাস্তবে তার নানা অদলবদল ঘটতে থাকে। আর প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যায়, রঞ্জুকেই তার ব্যবস্থা করতে হয়। বলা বাহুল্য, বদর শেখ ও দিবাকরের পুরো সমর্থন থাকে তার পেছনে।

কুমির, বাঘ, হরিণ, পাখি ইত্যাদির প্রধান আস্তানাগুলো দেখতে হলে, কোন-কোন নদী ও খাল দিয়ে গেলে সহজে যাওয়া যাবে, অকারণে ঘুরতে হবে না, সেসব স্থির করার দায়িত্বও বদর শেখ, দিবাকর, রথীন প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হয় রঞ্জুকে।

সব দেখে-শুনে মেলস্যাম সাহেবদের ধারণা হয়, রঞ্জুই গোটা দলটার মাথা এবং এইসব ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তারই সবচেয়ে বেশি।

লঞ্চ ক্রমেই ঢুকছে সুন্দরবনের গভীরে।

বিদেশি আগন্তুকদের রঞ্জু পরিচয় করিয়ে দেয় সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে। মিঃ মেলস্যাম ও মিঃ স্মিথের এটা-ওটা প্রশ্ন থেকে রঞ্জু বোঝে, সুন্দরবন সম্বন্ধে তাঁরা একেবারে অজ্ঞ নন, এ এলাকার মানচিত্র ও পুঁথিগত বিবরণ জানা আছে কিছুটা। তাঁদের অনুরোধে লঞ্চের মুখও কয়েকবার ঘোরাতে হয় অন্য দিকে।

মেলস্যাম সাহেবদের প্রশ্নের জবাবে রঞ্জুকে বলতে হয় গাঙ্গেয় বদ্বীপ ও সুন্দরবনের

ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। বলে চলে সে সুন্দরবনের নদী-নালা-খাল-বিল অরণ্য এবং তার জল-স্থলের বন্য প্রকৃতি, জীবজন্তু ও মানববসতির কথা আর তার অতীত ও বর্তমান ইতিহাস।

শুনতে-শুনতে চমৎকৃত হন মেলস্যাম সাহেবরা। তাঁদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে সুন্দরবনের এক সামগ্রিক চিত্র। তেমনি নির্বাক বিস্ময়ে শুনছে রঞ্জুর সহপাঠীরাও। অনেক কিছুই তারা আজ নতুন শুনছে।

সহাস্যে মিঃ মেলস্যাম একসময় বললেন,—সুন্দরবনের ব্যাপারে তুমি দেখছি এক এন্‌সাইক্লোপিডিয়া, মিঃ চৌধুরী। এই বয়েসেই এখানকার বনেজঙ্গলে খুব ঘুরেছ মনে হচ্ছে। পড়েছ তো বটেই।

রঞ্জু হেসে ফেলে,—আমি? আমি সুন্দরবনের এন্‌সাইক্লোপিডিয়া? দাঁড়ান, আমি এখুনি আসছি।

তার পরেই সে গিয়ে নিয়ে এল বদর শেখ এবং দিবাকর আদককে। বললে,—এঁদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দি। ইনি হলেন বদর শেখ, আমাদের সুন্দরবনের গাইড এবং আমার বদর চাচা। সেই কোন বাচ্চা বয়েস থেকে ঘুরছেন সুন্দরবনের সর্বত্র, তার আনাচেকানাচে। সুন্দরবনেরই মানুষ, সুন্দরবন এঁর জীবনের সবকিছু আর অন্তর উজাড় করে ভালবেসেছেন সুন্দরবনকে। আর ইনি হলেন দিবাকর আদক, এই লঞ্চের সারেং আর আমার দিবাকরদা। দীর্ঘকাল ধরে লঞ্চ নিয়ে ইনি টহল দিচ্ছেন সুন্দরবনে, বলা যায় তাকে চষে ফেলছেন। সুন্দরবনে সম্ভবত হেন জায়গা নেই, যেখানে ইনি ঢুঁ মারেননি। সুন্দরবনের এন্‌সাইক্লোপিডিয়া সত্যিই কেউ যদি এখানে থাকেন তো তাঁরা এঁরাই, আমি নই।

মেলস্যাম সাহেবরা আন্তরিকভাবে করমর্দন করেন বদর শেখ ও দিবাকর আদকের সঙ্গে এবং রঞ্জুর মাধ্যমে তাদের সঙ্গে কিছু বাক্যালাপও করেন।

কিন্তু যা তাঁদের মনকে সবচেয়ে নাড়া দিয়েছে তা হলো রঞ্জুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। যে কৃতিত্ব ও প্রশংসা ন্যায়ত ওরই প্রাপ্য, তার প্রতি ওর কোনও মোহ নেই। কতখানি বলিষ্ঠ ও উদার মন হলে, একজন ব্যক্তি কিছুমাত্র ইতস্তত না করে দুজন অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষকে এনে নির্বিকার চিত্তে বলতে পারে, যা কিছু খ্যাতি-প্রশংসা তা এদেরই প্রাপ্য!

বদর শেখ ও দিবাকর আদক চলে গেলে, সপ্রশংস দৃষ্টিতে রঞ্জুর দিকে তাকিয়ে সস্নেহ কণ্ঠে মিঃ মেলস্যাম বললেন,—কিন্তু মিঃ চৌধুরী, এটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এদের ওই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তোমার তো আছেই তার ওপর আছে এ অঞ্চল সম্পর্কে তোমার সামগ্রিক জ্ঞান, যা ওদের একেবারেই নেই। এ থেকে বুঝতে পারা যায়, সুন্দরবন নিয়ে তুমি যেমন অনেক পড়াশোনা করেছো, তেমনি ঘোরাঘুরিও করেছ যথেষ্ট।

রঞ্জু এবার একটু বিব্রত বোধ করে। কিঞ্চিৎ সংকোচের সঙ্গে বললে,—কিছু মনে করবেন না মিঃ মেলস্যাম, আপনার শেষের ধারণাটা কিন্তু মোটেই ঠিক নয়। এর আগে আমি কখনও সুন্দরবনে আসিনি। এই প্রথম এলাম।

সে কী! —হতভম্ব মিঃ মেলস্যাম ও মিঃ স্মিথ, যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

অসম্ভব! —রবার্ট নিজের বাঁ-হাতের তালুতে ডান হাতের ঘুষি মেরে বুঝি রুখে উঠলোঃ একেবারে বাজে কথা!

কিন্তু না, রঞ্জুর কথা যে বর্ণেবর্ণে সঠিক, রথীন ও অন্য সহপাঠীদের কথায় তা প্রমাণিত হয়।

তা হলে? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে, এ ধরনের বাস্তব জ্ঞান কি করে সম্ভব?

মেলস্যাম সাহেবদের পীড়াপীড়িতে রঞ্জুকে শেষে, সংক্ষেপে হলেও, কবুল করতে হয় ঃ পড়া আর শোনাই হলো সুন্দরবনসংক্রান্ত তার কাণ্ডজ্ঞানের আসল উৎস ও বনিয়াদ। এ বিষয়ে যাহোক কিছু বইপত্র ও মানচিত্র সে ঘেঁটেছে সন্দেহ নেই; সেইসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেছে বদরচাচা ও দিবাকরদার মতো সুন্দরবন-অভিজ্ঞ নানা ব্যক্তির সঙ্গে। ওই সঙ্গে মিশেছে তার নিজের কল্পনা। আজ সুযোগ পেয়ে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সে মিলিয়ে নিচ্ছে সেই ধারকরা পরোক্ষ জ্ঞান ও কল্পনাকে। এই হলো তার বিদ্যার দৌড়।

মুগ্ধ বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন মেলস্যাম সাহেবরা। অন্যরাও কমবেশি তথৈবচ।

সময় গড়িয়ে চলে। ইতিমধ্যে বদর শেখের সম্মতি নিয়ে লঞ্চ কয়েক জায়গায় কূলে ভিড়েছে। ডাঙায় নেমেছে সবাই।

প্রায় দুপুর হতে চললো। গাইডের নির্দেশে লঞ্চ এক চরে এসে ভিড়লো। আড়েদিঘে চরটা মস্ত বড়। দুপুরের খাওয়াদাওয়া এখানেই সারা হবে ঠিক হয়। চরে যেমন একলপ্তে শুকনো ঘাসজমি আছে অনেক, তেমনি দূরে দেখা যায় জলাজমি আর হোগলা ও নলখাগড়ার পাতলা জঙ্গল। সেখানে যাযাবর পাখির মেলা। আসল বন আরো অনেক দূরে।

রথীনরা সঙ্গে এনেছে রান্না-করা খাবার আর বিস্তর রান্নার সামগ্রী ও সাজসরঞ্জাম। পথে আসতে জেলেদের কাছ থেকে টাটকা মাছও কেনা হয়েছে। মেলস্যাম সাহেবরাও শুকনো খাবার সঙ্গে এনেছিলেন। সেই খাবার ও রথীনদের আনা খাবারের একাংশ দিয়ে প্রাতরাশাদি সারা হয়েছে।

জলায় পাখির ঝাঁক দেখে দলের অনেকেরই মুখ চুলবুল শুরু হয়। সঙ্গে-আনা অন্যান্য সুখাদ্যের সঙ্গে নধর পক্ষিমাংস যদি যুক্ত হয়, তা হলে আর কথা কি—সে হবে এক ভোজের মতো ভোজ। সরকারি অনুমতি পত্র যখন সঙ্গে আছে, বন্দুকও আছে আর লক্ষ্যভেদে কলির সব্যসাচী রঞ্জনকুমার যখন উপস্থিত, তখন আর অযথা দেরি কেন? কাজে নেমে পড়লেই তো হয়!

রঞ্জুর মনে কিন্তু দারুণ অস্বস্তি। পাখি প্রকৃতির এক অনুপম সৃষ্টি। সেই পাখিই কিনা তাকে মারতে হবে! শুধু পাখি কেন, নির্বিরোধী বন্য প্রাণী শিকার করাটাকেই সে ক্ষতিকর এবং কাপুরুষোচিত অপকর্ম বলে মনে করে।

তার কাঁধে এক চাপড় মেরে মুচকি হেসে মিঃ মেলস্যাম বললেন,—আরে চৌধুরী, তুমি কি বুদ্ধের শিষ্যত্ব নিয়েছ, অহিংসার বাণী প্রচারে নেমেছ? উঁহুঁ, তা তো নয়। তা হলে কক্ষনও রাইফেল চালাতে শিখতে না। শুনলাম, রাইফেলে তোমার নাকি অব্যর্থ লক্ষ্য। চলো, চলো, আর দেরি করো না।

রঞ্জুর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে দিবাকর। ঠোঁট আর জিভের এক বিচিত্র শব্দ করে টিপ্পনী কাটলে,—পাখি-ভাই। গুরুর কৃপায় ওসব খানা পাকানোর আমার সামান্য কিছু এলেম আছে। যে মুসলমান গুরুর কাছে সারেংগিরির তালিম নিয়েছিলাম, বাবুর্চির কাজেও হাত পাকাই তার কাছে। চান তো, চিড়িয়ার বিরিয়ানিও হতে পারে। সে যে কী তোফা চিজ, কি বলবো!

সোল্লাসে সবাই হই-চই করে উঠলো।

রঞ্জু নাচার। বিশেষ করে বিদেশি আগন্তুকদের আগ্রহ দেখে সে আর না করতে পারে না। ম্লান হেসে বন্দুক নিয়ে রওনা হলো।

রঞ্জু-রথীনদের সহপাঠী পরিমল কবিপ্রকৃতির মানুষ। শিকারজাতীয় হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ তো দূরস্থান, রান্নাবান্নার মতো স্থূল জাগতিক ব্যাপারেও তার রুচি বা মতি নেই।

তাই এদিকওদিক ঘোরে সে—উদ্দেশ্যহীন। আর গুনগুন করে নিজের মনে।

অন্যমনস্ক পরিমল। হঠাৎ বন্দুকের শব্দে চমকে উঠলো। থমকে দাঁড়িয়ে সে গোনে —একবার... দুবার... তিনবার... ওই আবার।

পরিমল আবার হাঁটতে শুরু করে। চিন্তার জাল একেবারে ছিঁড়ে গেছে।

হঠৎ সে থমকে দাঁড়াল। সুন্দর এক দৃশ্যে তার নজর আটকে গেছে। সামনে কিছুদূরে অনুচ্চ এক ঝাঁকড়া গাছ রঙিন ফুলে ছেয়ে আছে। ভারি চমৎকার ফুল তো! কি গাছ ওটা? পরিমলের চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি।

সামনে বড় একখণ্ড ন্যাড়া জমি, সামান্য স্যাঁতসেঁতে মনে হয়। গাছপালা-ঝোপঝাড় নেই, ঘাসপাতারও অভাব। জমিটার ওপর দিয়ে সে সোজা এগুলো গাছটার দিকে।

হঠাৎ এ কী! সে চমকে উঠলো ঃ একটু যেতেই ডান পা-টা মাটিতে বসে গেছে।

ডান পা-টা সে তুলতে যাবে! অমনি—আরে, আরে, এ আবার কী—বাঁ পা-টাও যে দেবে গেল!

ত্রস্ত হতভম্ব পরিমল। যত চেষ্টা করে পা দুটো তোলার, ততই তা কাদায় তলিয়ে যেতে থাকে।

অ্যাঁ, চোরাবালি নাকি! কথাটা মনে হতেই ভয়ে তার প্রাণ উড়ে গেল ঃ চোরাবালির অতলে তলিয়ে যাচ্ছি নাকি!

সে গেঙিয়ে উঠলো—বাঁচাও-বাঁচাও! গেলাম, গেলাম!

মুহূর্তে তার চোখে, মুখে ও কণ্ঠে জাগে মরণআতঙ্ক। তারস্বরে সে চেঁচাতে শুরু করে,—রঞ্জু রথীন! বাঁচা, বাঁচা! মলাম, মলাম।

ওঠার জন্যে যত সে আকুলি-বিকুলি করে, ততই একটু একটু করে তলিয়ে যেতে থাকে চোরাবালির গভীরে।

রান্নাবান্নার কাজে ব্যস্ত রথীনরা। হঠাৎ দূর থেকে পরিমলের আর্ত চিৎকার কানে আসতেই তারা লাফিয়ে উঠলো। হাতের কাছে যে যা পেল দৌড়লো তাই নিয়ে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের চক্ষুস্থির ঃ এ কী সাংঘাতিক ব্যাপার! ভয়ে বিস্ময়ে তাদের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাবার যোগাড়। কি করণীয় এখন?

খবর পেতেই হাতে বন্দুক ফেলে রঞ্জু ছুটলো তীর বেগে। অবস্থানে পৌঁছে সে থমকে দাঁড়ায় একটুক্ষণ, তার পরেই চেঁচিয়ে উঠলো,—কোনও ভয় নেই, পরিমল। ছটফট করিস নে স্থির হ। হ্যাঁ। এবার দু-হাত দু পাশে ছড়িয়ে দিয়ে আলগোছে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়। একদম নড়বি নে।

ততক্ষণে পরিমলের হাঁটু পর্যন্ত প্রায় কাদার মধ্যে তলিয়ে গেছে।

রঞ্জুর নির্দেশে এবার লঞ্চ থেকে আনান হলো একটা লম্বা কাছি আর খানকয়েক বেশ চওড়া বা চেটাল তক্তা।

তক্তাগুলো চোরাবালির ওপর ঠিকমতো পেতে কাছি নিয়ে রঞ্জু সন্তর্পণে এগিয়ে গেল পরিমলের কাছে। তার আগে সে পরীক্ষা করে নেয়, তার ভারে তক্তা তলিয়ে যায় কিনা। এদিকে চিৎ হয়ে পড়ায় পরিমলের তলিয়ে যাওয়া বন্ধ হয়েছে।

কাছির মাঝখানটা রঞ্জু প্রথমে পরিমলের কোমরে বাঁধলো। তারপর তার দুই বগলকে বেড় দিয়ে দুই কাঁদের সঙ্গে কাছির দুটো দিক ভালো করে বেঁধে সে ফিরে এল শক্ত মাটিতে। কাছির প্রান্ত দুটো অন্যদের হাতে দিয়ে বললে—এবার আস্তে-আস্তে টান দাও। দুদিকে যেন সমান জোর পড়ে।

পরিমলকে বললে,—দুই বগলে কাছিটাকে চেপে রাখ।

ধীরে-ধীরে উঠে এল পরিমল।

আঃ কী স্বস্তি, কী আনন্দ! মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি ওঠে রঞ্জুর নামে।

মেলস্যাম সাহেবরাও উচ্ছ্বসিত। রঞ্জুর চৌকস বুদ্ধি ও উপস্থিত কাণ্ডজ্ঞান দেখে তাঁরা এক কথায় মুগ্ধ বিস্মিত। যে ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল, তা থেকে যে অতি অল্পের জন্যে নিস্তার পাওয়া গেল, তার সবটুকু কৃতিত্বই তো রঞ্জুর। বন্দুকে তার টিপও তাঁরা দেখেছেন একটু আগে।

রবার্ট আর থাকতে না পেরে রঞ্জুর দু-হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললে,—চৌধুরী, তোমার মতো সঙ্গী পাওয়া মহা ভাগ্যের কথা।

আতঙ্কে ও অবসাদে পরিমল নেতিয়ে পড়েছিল। তাকে পরীক্ষা করে এক গ্লাস গরম দুধ বা চা দিতে বললেন মিঃ মেলস্যাম।

দুপুরের আহারপর্ব শেষ হয় একসময়। রান্নায় দিবাকরের পাকা হাতের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ।

যাত্রা শুরু হয় আবার...

দিন শেষ হয়ে আসছে। এবার ফেরার পালা।

ফিরতি-পথে রঞ্জুর প্রস্তাবমতো গণসংগীতের মধ্যে দিয়ে লঞ্চেই অনুষ্ঠিত হয় সমাপ্তি-উৎসব। সে উৎসবে মেলস্যাম সাহেবরাও যোগ দেন নিজেদের দেশের গণসংগীত পরিবেশন করে।

ক্যানিংয়ের ঘাটে এসে লঞ্চ যখন ভিড়লো, সন্ধ্যা তখন উতরে গেছে। সবাই তৃপ্ত, সবাই খুশি। কিন্তু আসন্ন বিদায়ের বিষণ্ণ ম্লান ছায়া প্রত্যেকের চোখেমুখে।

দিবাকরকে শুধু ভাড়াই মিটিয়ে দেওয়া হলো না, রঞ্জুর সঙ্গে কথা বলে তাকে মোটা টাকা বকশিশ দিলেন মেলস্যাম সাহেব। বকশিশ দিলেন বদর শেখকেও। তাদের মুখে হাসি দেখে রঞ্জুর মন খুশিতে ভরে যায়।

পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার পূর্বক্ষণটি ভারী হয়ে ওঠে বিচ্ছেদের ব্যথায়। রঞ্জুর দুই হাত চেপে ধরে কাঁপা-কাঁপা গলায় দিবাকর বললে,—রঞ্জনভাই, আমার কোন ভাই নেই, আপনি আমার ছোট ভাই। কোনওদিনই আপনাকে ভুলতে পারবো না, ভুলতে পারবো না আজকের এই দিনটাকেও। আবার যখন এদিকে আসবেন, আমার খোঁজ কিন্তু নিশ্চয়ই করবেন। বেঁচে থাকলে, যেখানে থাকি আসবোই। বলুন, আবার কবে আসবেন? শিগগির আসতে হবে।

একই আবেদন জানায় বদর শেখও। বলে—বাপ, লিখাপড়াজানা বহুৎ মানুষের সঙ্গে মুলাকাত হয়েছে, কিন্তু তোমার মতো একজনকেও পাইনি।

অবহেলিত দূর জলজঙ্গল এলাকার সরলপ্রাণ অভাবী মানুষদের এই স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা রঞ্জুকে অভিভূত করে ফেলে। কয়েক মুহূর্ত সে কথা বলতে পারে না। তারপর

ওদের হাত ধরে শুধু বললে,—আসবো, আবার আসবো দিবাকরদা, বদরচাচা। দেখি, যত তাড়াতাড়ি পারি আসবো।

হায়রে! রঞ্জু তখন কি করে জানবে, সুন্দরবনে এটাই তার প্রথম ও শেষ আসা এবং আজকের এই সুন্দরবন-ভ্রমণ তার স্মৃতির মণিকোঠায় চিরকাল জেগে থাকবে এক নজিরহীন প্রমোদভ্রমণ হিসেবে?

ইতিমধ্যে মেলস্যাম সাহেব রঞ্জুর কলকাতার হোটেলের ঠিকানাও লিখে নিয়েছেন, সেই সঙ্গে নিয়েছেন তার দেশের ঠিকানাও। আর রঞ্জুকে দিয়েছেন নিজের ছাপানো কার্ড। তার পেছনে লিখে দিয়েছেন তাঁদের কলকাতার বর্তমান ঠিকানা—গ্র্যান্ড হোটেলের স্যুইটনম্বর ও ফোননম্বর।

রঞ্জুকে কথা দিতে হয়েছে, আগামী পরশু বিকেল পাঁচটা নাগাদ সে গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করবে।

লঞ্চঘাটা থেকে বিদায় নেবার সময় মিঃ মেলস্যাম আবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন,—আশা করি, কথার খেলাপ করবে না, মিঃ চৌধুরী। আসছো নিশ্চয়ই।

আর রবার্ট তার হাত চেপে ধরে চোখে চোখ রেখে বললে,—অবশ্যই আসছো কিন্তু। মৃদু হেসে রঞ্জু বললে,—কথা আমি দিই রাখার জন্যে।

দুনিয়াটা কত বড়

॥ এক ॥

রঞ্জু কলকাতায় ফিরলে কুনাল শোনে তাদের সুন্দরবন-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। শুনতে-শুনতে তার আপসোস হয় নিজে না যেতে পারার জন্যে। হতচ্ছাড়া জ্বরটা সেই যে দেখা দিয়েই পালিয়েছে, আর ফেরে নি। তার যাওয়া বন্ধ করতেই যেন নচ্ছারটা এসেছিল।

নির্ধারিত দিনে রঞ্জু গ্র্যান্ড হোটেলে মেলস্যাম সাহেবদের সঙ্গে দেখা করতে গেল নিছক সৌজন্যের খাতিরে—কথা রাখার মন নিয়ে। তার ধারণা, পথের পরিচয় পথেই তাজা থাকে, ঘরে ফিরতে না ফিরতেই ফ্যাকাসে হয়ে আসে তার জেল্লা।

কিন্তু বেশ একটু অবাক হলো সে, যখন দেখলো—পথের পরিচয় এক্ষেত্রে ফিকে তো হয়নি, বরং মিঃ মেলস্যাম ও রবার্টের আদর-অপ্যায়ন ও ব্যবহারে তা যেন আরও তাজা ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক। বলা বাহুল্য, সে খুশিই হলো।

আলোচনার মধ্য দিয়ে মেলস্যাম সাহেবরা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জেনে নিলেন রঞ্জুর জীবনের ইতিহাস। শুনলেন, ছেলেবেলায়ই রঞ্জু কিভাবে হারিয়েছিল তার মা ও বাবাকে এবং কি কঠিন, কার্যত নিরুপায় ও নিরাশ্রয় অবস্থায় তাকে পড়তে হয়েছিল। শুনতে শুনতে তাঁদের চোখেমুখে ফুটে ওঠে অকৃত্রিম ব্যথা ও সহানুভূতি। তেমনি তাঁরা মুগ্ধ ও চমৎকৃত হন এবং সময়-সময় উচ্ছ্বসিতও হয়ে ওঠেন, যখন শোনেন তার প্রতি নিঃসম্পর্কীয় কাকা, কাকিমা ও অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের অঢেল সন্তানস্নেহ আর কুনাল ও মঞ্জুর সোদরপ্রতিম ভালবাসার কাহিনী।

তেমনি রঞ্জুও আলোচনার ফাঁকে-ফাঁকে মেলস্যাম সাহেবদের বৈষয়িক ও পারিবারিক অবস্থার আভাস পায় বেশ কিছুটা।

রবার্ট মেলস্যাম-দম্পতির একমাত্র সন্তান। তাঁরা যে কী বিরাট ধনী ও বিত্তশালী,

কী পরিমাণ ধনসম্পদের মালিক, রঞ্জু তা কল্পনায়ও আনতে পারে না। শতশত কোটিপতি, ইংরেজিতে যাকে বলে মালটিবিলিয়্যানেয়্যার, তাঁরা বোধহয় তাই—বহু ধনের সুবিশাল সব শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মালিক। দুনিয়াজোড়া তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য।

এই বাণিজ্যিক স্বার্থেই ছেলে রবার্টকে নিয়ে এশিয়া সফরে বেরিয়েছেন মিঃ মেলস্যাম। মিঃ স্মিথ ছাড়াও সঙ্গে আছেন বিভিন্ন বিষয়ের আরো কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ও প্রযুক্তিবিদ্।

মেলস্যাম সাহেবদের কাছ থেকে রঞ্জু সেদিন ছাড়া পেল প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে। বিদায়ের আগে মিঃ মেলস্যাম বললেন,—তোমার সঙ্গে সময়টা খুব চমৎকার কাটলো, মিঃ চৌধুরী। তাই আমার বিশেষ অনুরোধ, রোজ তুমি একবার করে এস। আজ যে সময় এসেছ, তখন এলেই চলবে। আর কদিন পরেই তো আমরা দেশে ফিরে যাব। এ কয়দিন রোজ তুমি একবার করে এলে অত্যন্ত খুশি হবো। কি আসবে তো?

রঞ্জু বেশ একটু হকচকিয়ে যায়। বিব্রত কণ্ঠ থেকে ফস করে বেরিয়ে গেল,—রোজ? রোজ কেন?

কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে মিঃ মেলস্যাম বললেন,—বাঃ। আমরা বিদেশি, তোমাদের অতিথি। না, শুধু অতিথিই নই, ক্যানিংয়ের লঞ্চঘাটায় 'অতিথি' শব্দটার ওই যে একটা বিশেষণ যোগ করেছিলে, তাই। কাজেই আমাদের একটু বিশেষ খাতিরযত্ন না করা কি ঠিক কাজ হবে?

রঞ্জুর বিমূঢ়তা তখনও কাটেনি। তার দু-কাঁধে দু-হাত রেখে হাসতে-হাসতে রবার্ট বললে,—ড্যাডির জবাবের পর আর কোনও প্রশ্ন আছে তোমার? আরে ঘাবড়াচ্ছ কেন? কলেজের ছুটির পর একবার ঘুরে যেতে বাধা কোথায়?

অতএব এরপর থেকে মেলস্যাম সাহেবদের কাছে হাজিরা দেওয়া রঞ্জুর প্রায় নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়াল।

রঞ্জুর সঙ্গে মেলস্যাম সাহেবদের নানা আলোচনা হয়। দেশবিদেশের কথাও ওঠে। তাঁরা অবাক হন বিভিন্ন বিষয়ে রঞ্জুর পড়াশুনো ও কাণ্ডজ্ঞানের গভীরতা দেখে। ভারত সমেত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধেও সেই একই কথা। এবং কানাডাও তার মধ্যে অন্যতম।

কলকাতা থেকেই মেলস্যাম সাহেবরা দেশের পথে রওনা হবেন, রঞ্জু শুনেছিল। কিন্তু কবে, সে জানে না। হাবভাবে বুঝতেও পারছে না কিছু। মাঝে-মাঝে তাঁদের সঙ্গে তাকে সিনেমায় যেতে হয়। চিড়িয়াখানা, জাদুঘর ইত্যাদি সমেত কলকাতা ঘুরতে ও বেরোতে হয়েছে একাধিক দিন।

ইতিমধ্যে রঞ্জুর সাহায্যে বাংলা শেখার মতলব ঢুকেছে রবার্টের মাথায়। বুদ্ধিমান ছেলে। সর্বদা-ব্যবহৃত কিছু-কিছু শব্দ ও বাক্য রপ্ত করতে তার খুব একটা সময় লাগে না। কিন্তু ঝামেলা বাধে উচ্চারণ নিয়ে। অনভ্যস্ত জিভকে বাংলা উচ্চারণে সড়গড় করানো কি চাট্টিখানি কথা!

সেদিন সকাল বেলা। গ্র্যান্ড হোটেলে নিজেদের কামরায় শুধু মিঃ মেলস্যাম ও রবার্ট। অন্যেরা একটু আগে উঠে গেছেন।

পাইপ টানতে-টানতে মিঃ মেলস্যাম বললেন,—মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আজ দেখা করার কথা মনে আছে তো? হাতে সময় বেশি নেই। তা চৌধুরীর ব্যাপারটা আর ঝুলিয়ে রাখা বোধহয় ঠিক হবে না, কি বলো? আমাদেরও তো ফেরার সময় এসে গেল।

হ্যাঁ,—রবার্ট সায় দেয় ঃ দিন দুয়েক যাবৎ আমারও তাই মনে হচ্ছিল। তোমায় বলবো বলে ভাবছিলাম। চৌধুরী সম্বন্ধে যা কিছু জানার ও বোঝবার, তা আর কিছু বাকি আছে বলে মনে হয় না। কাজেই আর ঝুলিয়ে না রাখাই উচিত।

না বাবা,—মৃদু হেসে মিঃ মেলস্যাম বললেন ঃ মানুষ বড় কঠিন চিজ। এত অল্প সময়ে তাকে পুরোপুরি চেনা বড় দায়। মানুষের মন পৃথিবীর গভীরতম সমুদ্রের চেয়েও গভীর ও জটিল। কত যে রহস্য সেখানে লুকিয়ে আছে, কে বলবে! অল্প দিনে সে সবের পুরো হদিস পাওয়া অসম্ভব। তবে ছেলেটি যে চৌকস, তাতে সন্দেহ নেই।

চৌকস মানে! —রবার্ট সোফার ওপর সোজা হয়ে গেল ঃ একেবারে খাঁটি সোনা, তোমায় বলে রাখছি। খাঁটি ইস্পাতও বলতে পার। তোমার থেকে আমার সঙ্গেই যে তার কথাবার্তা মেলামেশা বেশি, তা বোধহয় স্বীকার করবে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ওর মতো দ্বিতীয় আর একজন আজো আমাদের নজরে পড়েনি। ওরকম—

রবার্টের উচ্ছ্বাসে বাধা দেন মিঃ মেলস্যাম,—ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন প্রশ্ন হলো, আমাদের প্রস্তাবে ও রাজি হবে কিনা? তোমার কি মনে হয়?

রবার্ট চুপ হয়ে যায়। শেষে ভাবিতকণ্ঠে একসময় বললে,—খুব কঠিন প্রশ্ন, ড্যাডি। ওর চরিত্রের দুটো বিশেষত্ব তুমি লক্ষ্য করেছ কিনা জানি না। একটি হলো, ওর মধ্যে আত্মসম্মানবোধ খুব প্রখর। দ্বিতীয়ত নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে ও মোটেই সচেতন নয়। এ দুটো দিক মাথায় রেখে কথা বললে, প্রস্তাবটা ও হয়তো গ্রহণ করতেও পারে।

॥ দুই ॥

বিকেলবেলা। গ্র্যান্ড হোটেলের কামরায় বাংলা উচ্চারণ নিয়ে সেদিনও যথারীতি তুলকালাম চলছে রবার্ট আর রঞ্জুর মধ্যে।

শেষে রবার্ট একসময় যেন অনেকটা ক্লান্ত কণ্ঠে বলে,—ধুত্তোর চুলোয় যাক! আজ এসব থাক, চৌধুরী। তোমাকে আজ একটা গুরুতর কথা বলবো। কয়েকদিন ধরে বলবো-বলবো ভাবছি।

কি, জিভ সংক্রান্ত কথা? —হাসতে হাসতে রঞ্জু জিজ্ঞেস করে ঃ সেদিনের মতো জিভকে কি করে বাগে আনা যায় সেই আলোচনা?

আরে না, না ওসব না। —রবার্ট বললে ঃ সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কথা। খুব গুরুতর, বুঝলে।

বেশ। বলো, শুনছি। —রঞ্জুর গলা তখনও হালকা তরল।

বলছিলাম কি,—একটু কেশে রবার্ট বললে ঃ তুমি আমাদের সঙ্গে কানাডায় চলো না। দেখবে, দুনিয়াটা কত বড়। যাবে? তা হলে আমরা কিন্তু অত্যন্ত খুশি হবো।

—ভীষণ চমকে উঠলো রঞ্জু ঃ এ কী অদ্ভুত প্রস্তাব! অপ্রত্যাশিতও বটে।

হতভম্বের মতো সে তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তার পরেই সামলে নেয়। রবার্টের কথায় আন্তরিকতার কোনও অভাব নেই সত্যি, কিন্তু তার গুরুত্ব কতটুকু? রবার্ট যে তাকে ভালোবাসে, এটা বোধহয় তারই অভিব্যক্তি। এ বয়সে এ ধরনের ভাবপ্রবণতা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

জবাবের আশায় রবার্ট সাগ্রহে চেয়ে আছে তার দিকে। মুখে হাসি টেনে সে বললে, —আচ্ছা, দেখা যাবে।

'দেখা যাবে' মানে? —রবার্ট ভ্রূ কোঁচকায় : মনে হচ্ছে কথাটায় বিশেষ আমল দিচ্ছ না। প্রস্তাবটা একটু গুরুত্ব দিয়ে ভাব চৌধুরী, হেলাফেলা করো না।

সেদিন কথাবার্তা আর তেমন জমে না। রঞ্জু ক্ষণে-ক্ষণে আনমনা হয়ে পড়ছে। মেলস্যাম সাহেব তখনও ফেরেননি। অন্যত্র জরুরি একটা কাজের অজুহাত দেখিয়ে রঞ্জু তাড়াতাড়ি বিদায় নিলে রবার্টের কাছ থেকে।

মন তার অশান্ত চঞ্চল। ফুটপাথ ধরে হাঁটছে। পায়দলে চলেছে হোটেলের দিকে।

দুনিয়াটা কত বড়! —রবার্টের কথাটা যেন গেঁথে গেছে তার বুকের মধ্যে।

ছেলেবেলা থেকেই তার স্বপ্ন, সে দুনিয়া দেখবে, ঘুরবে তার পথে পথে, দেশদেশান্তরে। সেভাবেই শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সে যথাসাধ্য প্রস্তুত করছে নিজেকে। উপরন্তু করুণাময় বিধাতাও নিঃসন্দেহে তা-ই চান। তাই তো সেই বাল্যেই সমস্ত বন্ধন থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছেন, পেছু টানের মতো কোনও দায়ই আর অবশিষ্ট রাখেননি। তার এ বাসনা সে সযত্নে গোপন রেখে এসেছে এতকাল, এমন কি কুনালও জানে না তার বিন্দুবিসর্গ।... কিন্তু... কিন্তু রবার্টের কথার মূল্য কতটুকু? খেয়ালের বশে কথাচ্ছলেই হয়তো দিয়েছে প্রস্তাবটা, এ বয়েসে যা স্বাভাবিক। হ্যাঁ, তাই হবে।

পরদিন সকালে চা খেতে-খেতে কুনাল জিজ্ঞেস করে রঞ্জুকে,—হ্যাঁ রে, তোর কি হয়েছে রে? শরীর খারাপ নাকি?

কেন? শরীর আবার কি দোষ করলে? —খবরের কাগজের দিকে চোখ রেখে রঞ্জু বললে।

—না, চোখমুখ কেমন বসে গেছে, রুক্ষ শুকনো দেখছি, রাতে ঠিকমতো ঘুম না হলে যেমনটা হয়।

ধ্যেৎ। —বলে রঞ্জু চেয়ারে হেলান দিয়ে কাগজটা মুখের সামনে তুলে ধরে।

জীবনের সর্বোত্তম সাথী ও পরম বন্ধুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে সে এখন নিজেকে আড়াল করতে চায়।

সত্যি গত রাতে ঘুমের রাজ্য থেকে তাকে প্রায় নির্বাসনই নিতে হয়েছিল। রবার্টের ওই কথাটা—দেখবে, দুনিয়াটা কত বড়—তাকে যেন তাড়া করে ফিরেছে রাতভোর। কিন্তু কেন, আকাশপাতাল ভেবেও তার ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি। বারবার সে ভেবেছে, অসামান্য ধনীর একমাত্র দুলালের সামান্য একটা কথা বই তো নয়, তা কেন তার জীবনের মূল ধরে এভাবে নাড়া দেবে? তার পর যা হয়, এক চিন্তার পথ ধরে এসেছে অন্য চিন্তা : নিজের ভবিষ্যতের কথাটা তাকে যেন নাস্তানাবুদ ও হয়রান করে ছেড়েছে সারারাত।

বিকেলে সে যথারীতি মেলস্যাম সাহেবদের ডেরায় পৌঁছুতেই রবার্ট হই-হই করে উঠলো,—আরে এই যে! এসেছ? এস, এস।

কী ব্যাপার? —রঞ্জু অবাক : হঠাৎ এরকম অভ্যর্থনা যে?

না হে, তেমন কিছু না। ঘাবড়াও মাৎ। —উৎফুল্ল কণ্ঠে রবার্ট বলে : মাঝে-মাঝে তুমি ডুব মার তো। আজ আবার তেমনটি করবে কিনা ভাবছিলাম, এমনসময় তোমার এই উদয়। যাক গে শোন, আগেই বলে রাখি, বাবা বিশেষ কাজে বাইরে একটু আটকে পড়েছেন, যে কোনও মুহূর্তে ফিরতে পারেন। কাল তুমি চলে যাওয়ায় তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে রবার্টের কথা হয়েছে মেলস্যাম সাহেবের সঙ্গে। প্রস্তাবটা শুনে রঞ্জুর যে ভাবান্তর ও বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া তার চোখে পড়েছিল, তা সে জানিয়েছে তাঁকে।

নিত্যদিনের মতো বৈকালিক জলযোগ এসে পৌঁছোয়। খেতে-খেতে রবার্ট বলে, —কি ব্যাপার হে? আজ এত গম্ভীর চুপচাপ যে?

না, ভাবছি। —কাতর কণ্ঠে রঞ্জু বললে ঃ বাংলা শেখার কোনও তাড়া দেখছি নে তো, তাই ভয় হচ্ছে, মাস্টারি চাকরিটা বোধহয় গেল।

হো-হো করে হেসে উঠলো রবার্ট, বললে,—তা বটে! সত্যি, এমন চমৎকার চাকরিটা চলে যাওয়া ভয়ের কথাই বটে। তা আজ শেখার তেমন মেজাজ নেই, বুঝলে। অন্য একটা মতলব মাথায় ঘুরছে।

—কিরকম?

—মাস্টারের চাকরিটা কিভাবে পারম্যানান্ট করা যায়। তা শোনো, কাল যে প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম, সে সম্বন্ধে ভেবেছো কিছু?

আবার সেই প্রস্তাব। যন্ত্রণা আর কাকে বলে! ম্লান হেসে রঞ্জু বললে,—হুঁ, পারম্যানান্ট তো বটেই। ছাত্রের শেখা যেদিন শেষ, চাকরিও সেদিন খতম। মাস্টারের তখন পথই একমাত্র ভরসা।

আরে, রাখ তোমার মাস্টারি! —রবার্ট তেড়ে উঠলো ঃ যত্তো সব বাজে ব্যাপার। যা জিজ্ঞেস করছি, তার জবাব দাও।

কিসের? —বোকা-বোকা চোখে রঞ্জু জিজ্ঞেস করে।

—শোনো চৌধুরী, তোমার সঙ্গে নির্ঘাত কোনদিন আমার জান-কবুল লড়াই হয়ে যাবে। চালাকি পেয়েছ? কি জিজ্ঞেস করছি, বুঝতে পারছো না, না?

—আরে ধ্যেৎ, খেপছো কেন? তুমি দেখছি কাবলিওলারও এককাঠি ওপরে।

সে আবার কি? —রবার্ট অবাক।

শোন তবে। —রঞ্জু নড়েচড়ে গ্যাঁট হয়ে বসলো ঃ আমাদের দেশে একজাতের লোক আছে, তারা কাবুল বা আফগানিস্তানের বাসিন্দা, তাই তাদের বলে কাবলিওলা। তারা মহাজনি কারবার করে, খুব চড়া সুদে টাকা খাটায়। নিরুপায় অভাবী লোকেরা তাদের কাছ থেকে টাকা কর্জ নেয়। ব্যস, তার পরেই শুরু হয় কাণ্ড—কাবলিওলার শ্যেনদৃষ্টি আর তাগাদা। সকাল সন্ধে দুপুর শুধু কড়া নজর আর পশ্চাদ্ধাবন। কাবলিওলার সে জুলুম থেকে দেনাদারের রেহাই পাবার জো কোথায়—দুনিয়া ছেড়ে পালানো ছাড়া?

কী সাংঘাতিক! এত বড় অন্যায়—বলতে বলতে রবার্ট প্রায় লাফিয়ে উঠলো ঃ অ্যাঁক্-কী শয়তানি। কাবলিওলার গপ্পো বলে কিনা—

কথা তার শেষ হয় না, ঘরে ঢুকলেন মিঃ মেলস্যাম, বললেন,—কি ব্যাপার? এই যে চৌধুরী তোমার সঙ্গে কথা আছে। কাল তুমি চলে যাওয়ায় খারাপ লেগেছে। বসো, আমি আসছি।

বলতে বলতে তিনি পাশের কামরায় ঢুকলেন।

সামান্য পরে রবার্টও উঠে দাঁড়াল, বললে,—মাফ করো চৌধুরী, একটু বসো, আমি এক্ষুণি আসছি।

সে-ও ঢুকে গেল পাশের কামরায়।

মিনিট কয়েক পরে সে ফিরে এল। আরো কিছুক্ষণ বাদে বেশবাস পাল্টে ফিরে এলেন মিঃ মেলস্যাম। সোফায় বসতে-বসতে বললেন,—আমাদের দেশে ফেরার দিন দ্রুত

এগিয়ে আসছে, চৌধুরী। তার আগে তোমার সঙ্গে কয়েকটা জরুরি কথা সেরে ফেলতে চাই। দেখ, তুমি আর রবার্ট প্রায় সমবয়সীই হবে। সেদিক থেকে তুমি আমার স্নেহের পাত্র।

নত চোখে রঞ্জু বলে,—আমি তা জানি, বুঝতে পারি।

বেশ। —মিঃ মেলস্যাম বললেন ঃ মানুষের মন এক আশ্চর্য বস্তু, নয় কি চৌধুরী? সে যে কিভাবে চলে ও কাজ করে, বোঝা দুঃসাধ্য। মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব-ভালবাসার ব্যাপারটাই ধরো না। দুজনের মধ্যে পরিচয় হয়তো বছরের পর বছর চলছে, অথচ তা ঘনিষ্ঠ হয় না। অন্য দিকে আবার দুজন মানুষের পরিচয় হয়তো কয়েক দিন বা কয়েক ঘণ্টার। তারই মধ্যে কখন যে তা নিবিড় অন্তরঙ্গতায় পৌঁছে গেছে, সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষই তা হয়তো খেয়াল করেনি।

রঞ্জু হঠাৎ হেসে ফেলে।

কি হাসছো যে? —একটু অবাক হন মিঃ মেলস্যাম।

ক্ষমা করবেন। —মুখ কাঁচুমাচু করে রঞ্জু বললে ঃ আপনার কথায় একটা দৃশ্য মনে হতে হঠাৎ হেসে ফেলেছি।

কি রকম? —মিঃ মেলস্যাম জিজ্ঞেস করেন।

—না, বলছিলাম কি, ওই যে বন্ধুত্ব-ভালবাসার কথা আপনি বললেন, পরস্পরের ক্ষেত্রে তার ফল কিন্তু অনেকসময় বিপরীতধর্মী হতে পারে; একপক্ষে যা মহাসুখকর, অপরপক্ষে তা হতে পারে বিষম দুঃখজনক, অর্থাৎ বাংলায় যাকে বলে, কারও পৌষমাস কারও সর্বনাশ। আমার ব্যাপারটাই দেখুন না। কাকাবাবু, কাকিমা, অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডস্যার, কুনাল, মঞ্জু প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁদের অঢেল স্নেহ-ভালোবাসা পেয়ে আমার তো ফুর্তির অন্ত নেই, যাকে বলে পোয়া বারো, অথচ তাঁদের কি অবস্থা? আমাকে নিয়ে তাঁদের কতই না দুশ্চিন্তা, দুর্ভোগ ও অর্থব্যয়। তেমনি দেখুন আপনাদের অবস্থাটা। আমার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে—

রঞ্জুর কথা শেষ হয় না, দমফাটা হাসিতে ফেটে পড়লেন মিঃ মেলস্যাম এবং রবার্ট।

অদ্ভুত! সত্যি, অদ্ভুত সূক্ষ্মদৃষ্টি! —হাসি থামিয়ে মিঃ মেলস্যাম একসময় বললেন ঃ তেমনি ক্ষুরধার বুদ্ধিও বটে। শোন চৌধুরী, তোমার এ কথার পর আর কথা বাড়াব না। একটা প্রশ্ন তোমায় করতে চাই। আশা করি, উত্তর পাব। তোমার জীবনের কি উদ্দেশ্য বা আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ তুমি কি হতে চাও বা করতে চাও, জানতে ইচ্ছে করছে।

মুহূর্তে রঞ্জু চুপসে যায়। মোক্ষম প্রশ্ন করেছেন ভদ্রলোক। এজন্যে সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না।

শেষে আমতা-আমতা করে বললে,—না, তা বলছিলাম কি, দেখুন মানুষের কত স্বপ্ন সাধই তো থাকতে পারে। কিন্তু সেটাই কি সব? তাই বলছিলাম—

মিঃ মেলস্যাম বাধা দেন,—শোন, মানুষ চেনার কিছু ক্ষমতা আছে বলে আমার একটু গর্ব আছে। এ পর্যন্ত তাতে তেমন কোন গলদ ধরা পড়েনি। অদ্যাবধি তোমাকে যেটুকু দেখেছি এবং তোমার জীবনের ইতিহাস যা জেনেছি, তাতে বলতে পারি, অবাস্তব কল্পনা করার ছেলে তুমি নও। তবে হ্যাঁ, বর্তমান অবস্থা ও পরিবেশ তোমার সাধ বা উদ্দেশ্য পূরণে কতখানি সহায়ক হবে, তাতে প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু সুযোগ পেলে নিজের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার যোগ্যতা তোমার আছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কাজেই তুমি অসঙ্কোচে বলতে পার।

রঞ্জুর তবু সঙ্কোচ কাটে না। নিজের মনোবাসনা দুজন বিদেশির কাছে এভাবে খুলে বলা তার কাছে কেমন হ্যাংলামি মনে হয়। আত্মসম্মানে বাধে।

রঞ্জুর অস্বস্তি মেলস্যাম সাহেবের নজর এড়ায় না। কোমলকণ্ঠে তিনি বললেন,—বুঝতে পারছি, যে কারণেই হোক, নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুমি এখনও প্রকাশ করতে রাজি নও। অতএব ও প্রসঙ্গ থাক। অন্য প্রশ্নে আসি। আচ্ছা, রবার্ট কি তোমায় কোন প্রস্তাব দিয়েছিল? দিলে, সেটা কি? এবং সে সম্পর্কে তোমার বক্তব্যই বা কি?

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রঞ্জু বললে,—আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব এখুনি না দিতে পারার জন্যে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, মিঃ মেলস্যাম। সম্ভব হলে পরে দেব। আপনার এই দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দিতে বাধা নেই। রবার্ট অনুরোধ করেছে আপনাদের সঙ্গে কানাডায় যাবার জন্যে। ওটাকে যতটা বন্ধুর আন্তরিক অনুরোধ হিসেবে মনে করা যায়, ততটা বাস্তবসম্মত প্রস্তাব হিসেবে গ্রহণ করা যায় কিনা আপনাকেই তা বিচার করতে অনুরোধ করি।

কেন যায় না, শুনি? —কিঞ্চিৎ আহত কণ্ঠে রবার্ট জিজ্ঞেস করলে।

তার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে রঞ্জু বললে,—দুঃখিত হয়ো না, রবার্ট। আমার অবস্থায় দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা ভেবে দেখ ভাই, তাহলে হয়তো বুঝতে পারবে। সামান্য বি.এস.সি. ক্লাসের ছাত্র আমি। এমন কোনও কাজ জানিনে যে, দুর বিদেশে গিয়ে নিজের খোরপোশ চালাতে পারবো। তা ছাড়া তো জান, আমি কপর্দকহীন, নিজের এমন কোন সহায়সম্বল নেই—

সহাস্যে আবার বাধা দিলেন মিঃ মেলস্যাম,—ও আলোচনা থাক। সত্যি চৌধুরী, তুমি কতখানি বাস্তববাদী, এ থেকেও তা বোঝা যায়। এবার শোন, ও প্রস্তাব শুধু রবার্টের নয়, আমারও। সবদিক ভেবেচিন্তেই ওটা করা হয়েছে।

রঞ্জু ভীষণ চমকে উঠলো ঃ ও প্রস্তাব মিঃ মেলস্যামেরও? প্রথমে বিস্ময়ের ধাক্কা, তার পর আনন্দের জোয়ার তাকে প্রায় বেসামাল করে ফেলে। এ যে বামনের চাঁদ হাতে পাওয়ার সামিল। সে চোখ বুঝলো।

মিঃ মেলস্যাম তখন বলছেন, নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে তুমি মোটেই সচেতন নও, চৌধুরী। তাই ওইসব খোরপোশের কথা বলছো। তবে সে ক্ষমতার যথোচিত বিকাশের জন্যে উপযুক্ত সুযোগ ও পরিবেশ অবশ্যই দরকার। এ ব্যাপারে কানাডায় যে সুযোগসুবিধা আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে এখানে তার বড় অভাব। তার কারণও আছে। সে যাই হোক, কানাডায় আমাদের যেসব কাজকারবার আছে, তুমি যেতে রাজি হলে তাতে গিয়ে যোগ দেবে আমাদের সহকারী হিসেবে। এবার বলো তোমার বক্তব্য।

কি বলবে রঞ্জু? সে দিশেহারা, বলা যায়। মিঃ মেলস্যামের মুখ দিয়ে সে যেন শুনতে পাচ্ছে তার ভাগ্যদেবতার ভবিষ্যদ্বাণী—আগামী পথচলার অমোঘ নির্দেশ।

প্রাণপণ চেষ্টায় সে সামলে নেয় নিজেকে। সোফায় সোজা হয়ে বসে অভিভূত কণ্ঠে বললে, —আপনার স্নেহ ও রবার্টের ভালবাসা আমার কাছে স্বপ্নের বস্তু। এ প্রস্তাবে আমি মনে প্রাণে সায় দিচ্ছি। তবে এ প্রসঙ্গে আমার অন্য একটু কথা আছে।

—বলো।

—আমার জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য জানতে চেয়েছিলেন। এখন তা বলতে বাধা নেই। উদ্দেশ্য দুটো একটা হলো পৃথিবী ঘোরা—সম্ভব হলে তার জলে স্থলে অন্তরীক্ষে দুর্গম বন্ধুর সব জায়গায় হাজির হওয়া। দ্বিতীয়টা হলো যতদুর সাধ্য জ্ঞানার্জন করা। আপনার

কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পূরণের সুযোগ যথেষ্ট পাব। সমস্যা প্রথমটা নিয়ে।

না, কোনও সমস্যাই নেই। —হাস্যোজ্জ্বল মুখে সস্নেহে বললেন মিঃ মেলস্যাম ঃ তোমার জীবনের উদ্দেশ্য জানতে পেরে বড় ভালো লাগছে, চৌধুরী। দেশে দেশে ঘোরারও অনেক সুযোগ পাবে তুমি। আমাদের শিল্পবাণিজ্যের অন্যতম একটা কাজ হলো প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণের জন্যে বিভিন্ন দেশে, প্রয়োজনে তাদের দুর্গম অঞ্চলেও অভিযান পাঠানো।

কান্নাঝরা আঁধার দিন

॥ এক ॥

মেলস্যাম সাহেবরা দেশে ফিরে গেছেন। ঠিক হয়েছে, বি.এস-সি পরীক্ষা দিয়ে রঞ্জুও যাবে সেখানে।

সব ব্যাপারটাই গোপন রাখা হয়েছে। পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে মেলস্যাম সাহেবদের যে বাণিজ্যিক অফিস ও প্রতিনিধির বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে, সেটাই এখন উভয়পক্ষের সংবাদ-আদানপ্রদানের কেন্দ্র। মেলস্যাম সাহেবের নির্দেশ ঃ রঞ্জুর পাসপোর্ট, ভিসা, বিমানের টিকিট মায় পোশাক পরিচ্ছদ, টাকাপয়সাদি সবকিছুর ব্যবস্থা করবে এই অফিস।

রঞ্জু ইচ্ছা করলে সরাসরি চিঠি লিখতে পারে মেলস্যাম সাহেবদের কাছে। কিন্তু কানাডা থেকে চিঠিপত্রাদি সমেত সব খবরাখবরই আসবে এই অফিসে—রঞ্জুর হোটেলে কদাপি নয়।

এ গোপনীয়তার কারণ মেলস্যাম সাহেবরাও বুঝেছিলেন। রঞ্জুর দেশত্যাগের খবর আগেভাগে ফাঁস হলে, যে-ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধবে, তা অচিন্তনীয় বলা যায়। কুনাল তো আছেই, দেশ থেকে ছুটে আসবেন রঞ্জুর কাকাবাবু, কাকিমা এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডস্যার আর—আর সর্বোপরি মঞ্জু। সে যে কী ভয়ংকর 'ত্রাহি মধুসূদন' অবস্থা কল্পনা করতেও বুক কাঁপে।

তার আকস্মিক অন্তর্ধানে এদিককার অবস্থা কি দাঁড়াবে, রঞ্জু ভাবতে পারে না। ভাবতে চায়ও না। পড়ায় মন দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু অজান্তে মন কখন ডুবে যায় সেই অশ্রুভেজা আগামী দিনের চিন্তার অতলে।

কাকাবাবু, কাকিমা বা অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডস্যার—তাঁরা তবু অভিজ্ঞ প্রবীণ, বিচ্ছেদের আঘাত যত মর্মান্তিকই হোক, দুদিন আগে বা পরে সামলে উঠতে পারবেন। কিন্তু কুনাল ও মঞ্জু? তাদের কি হবে? বিশেষ করে মঞ্জুর?

চার বছর হলো, সে ও কুনাল কলকাতায় এসেছে কলেজে পড়তে। কিন্তু আজো তাকে সেই পুরনো বন্দোবস্ত মতো নিয়মিত চিঠি লিখতে হয় মঞ্জুকে। একটু অবিশ্যি অদল-বদল ঘটেছে। প্রথম দিকে চিঠি লিখতে হতো সপ্তাহে একখানা করে। পরে কড়াকড়ি কিঞ্চিৎ শিথিল হওয়ায় মাসে এখন দুখানা।

মঞ্জু এখন আর আগেকার সেই কচি খুকিটি নেই—বছর পনেরো বয়েস হবে, দশম শ্রেণীতে উঠলো। কিন্তু সোনাদার সঙ্গে ব্যবহারে আজো সেই খুকিই রয়ে গেছে, তেমনি মনখোলা, সহজ ও অকপট।

কোনও কারণে চিঠি লেখায় রঞ্জুর কখনও কিছু অনিয়ম ঘটলে আর রক্ষা

নেই, মঞ্জুর চিঠি আসে। সে কী চিঠি! হ্যাঁ, বাংলা ভাষাটা ও রপ্ত করেছে বটে। ভাষার সে কী তেজ—তেমনি রাগ ও অভিমান! স্কুলের সব পরীক্ষায় ও প্রথম হয়, তেমনি খেলাধুলোতেও।

কিছুদিন আগে মঞ্জু কয়েকটা অদ্ভুত কথা লিখেছিল। বিচিত্র খেয়ালই বটে! লিখেছিল—জান সোনাদা, দেহে ও মনে সত্যিকার মানুষ হতে গেলে কী কী করা দরকার, তোমার জীবন থেকে তা আমি শিখেছি। সেদিন থেকে তুমিই আমার আদর্শ—এক এবং অদ্বিতীয়। এটা কেউ জানে না। আজ শুধু তুমি জানলে। খবরদার! কাউকে ঘুণাক্ষরেও বলবে না কিন্তু।

এমনি ধরনের নানা চিন্তায় রঞ্জুর মন সময় সময় বিকল হয়ে পড়ে। অজান্তে কখন বইয়ের পাতা থেকে অশান্ত মন উধাও হয়ে যায় শোকম্লান কোন অজানা লোকে। যখন খেয়াল হয়, জামাটা গায়ে চড়িয়ে সে বেরিয়ে পড়ে হোটেল থেকে।

স্বভাবতই সবচেয়ে বেশি চিন্তা তার মঞ্জুকে নিয়ে। যেরকম অভিমানী মেয়ে, বিশেষ করে সব আবদার অভিমান দাপট যেখানে তার সোনাদাকে ঘিরে, তাতে আকস্মিক অন্তর্ধানের ফল তার ওপর কি হতে পারে, রঞ্জু ভাববার চেষ্টা করে, কিন্তু থই পায় না। আর ততই ছটফট করতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করলে, ভবিষ্যতের সেই আঘাত মঞ্জু যাতে যথাসম্ভব সহজভাবে মেনে নিতে পারে, তার জন্যে এখন থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। মনের দিক থেকে তাকে প্রস্তুত করতে হবে চিঠিপত্রের মাধ্যমে, তবে খুব কৌশলে—সূক্ষ্ম পন্থায়...

ফাইনাল পরীক্ষা এগিয়ে আসে। না, আর নয়, আর কোন কথা নয়। সমস্ত চিন্তাভাবনা রঞ্জু যেন দু-হাতে ঠেলে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়লো পরীক্ষা প্রস্তুতির কাজে। প্রস্তুতি চালায় কুনালও।

এমনিতে রঞ্জু স্বভাবগম্ভীর, কথা বলে কম এবং কুনালেরও তা অজানা নয়। কিন্তু হালে প্রয়োজনের বাইরে কথা বলা রঞ্জু ছেড়েই দিয়েছে বলা যায়।

পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত এসে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে রঞ্জু পরীক্ষা দিচ্ছে। কুনালের পরীক্ষা একসময় শেষ হয়ে গেল। কিন্তু রঞ্জুর চলছে—বিশেষ করে প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা।

পরীক্ষা যত শেষ হয়ে আসছে, রঞ্জুর ভেতরে ততই বাড়ছে কষ্ট ও অস্থিরতা, আর মন পুড়ছে অবিরত। সব কিছু ছেড়েছুড়ে শিগগিরই তাকে চলে যেতে হবে, ভাবতেই মনে উথলে ওঠে কান্নার সমুদ্র।

এতদিন সে নিজেকে বুঝিয়েছে—এ দুনিয়ায় সে নিঃসঙ্গ একলা, জন্ম-অভাগা। তাই নিজের ভাগ্য-ভবিষ্যৎ তাকে নিজেই গড়তে হবে। এত বড় এই যে সুযোগ তার জীবনে এসেছে, তা দ্বিতীয়বার আসবে না।

কিন্তু বিদায়ের ক্ষণ যত এগিয়ে আসে, ততই সে টের পাচ্ছে কত ঠুনকো ওইসব সান্ত্বনার কথা, আর ততই উবে যাচ্ছে তার মনের জোর।

সেই কোন ছেলেবেলায় সে হারিয়েছিল মা-বাবাকে। মনের পটে তাঁদের ছবি আজ নিষ্প্রভ, স্মৃতি ঝাপসা অস্পষ্ট। বাবা-মার কথা মনে হলে, আজ সেথায় আপনা থেকে জেগে ওঠে কাকাবাবু-কাকিমার মুখ। পিতৃ-মাতৃ-প্রতিম কাকিমা-কাকাবাবু ছাড়াও তার আছে কুনাল আর মঞ্জু।

এত স্নেহ, এত ভালোবাসা, এই প্রাণের বন্ধন, সব ছিঁড়ে ফেলে সে কিনা যেতে চাইছে কোথায় কতদূরে পৃথিবীর অপর পিঠে—এক নির্বান্ধব অজানা দেশে!

শেষ প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা দিয়ে রঞ্জু বেরিয়ে পড়লো পথে।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘোরে সে পথে পথে। ঘুরতে-ঘুরতে গড়ের মাঠে এসে পড়লো। পাক খেতে থাকে সে মাঠময়। কি করবে সে ঃ যাবে, কি যাবে না?

ময়দানে ঘুরছে আর ঘুরছে। অনাবিল স্নেহের বাঁধন কী শক্ত! ছিঁড়তে চাইলেই দুঃসহ ব্যথা গুমরে উঠছে প্রাণের কোষে কোষে।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহ-মন। শেষে একসময় সে বসে পড়লো নিরালায় ঘাসের ওপর।

দিন শেষ হয়ে আসছে। বিদায় নিচ্ছে দিনমণি। শ্যামসবুজ গাছপালার মাথায় ভাগীরথীর ওপারে অস্তাচল তাই লালে লাল।

আর রঞ্জু? ভেতরে বাইরে তার শুধু বিষাদ আর বিষাদ।

লঘুপায়ে গোধূলি এগিয়ে আসে। হাওয়া বইছে ঝিরঝির করে। নিঝুম হয়ে আসে চারদিক। গাঢ় প্রশান্তি নামছে প্রকৃতির বুকে।

রঞ্জু নিথর। নিজের অজান্তে কখন ডুবে গেছে নিজের মধ্যে। ধীরে-ধীরে মাথা তার ঠাণ্ডা হয়ে আসে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে আবার শুরু হয় ভাবনা—সব কিছুর বুঝি পুনর্মূল্যায়ণ।

স্নেহ-ভালবাসার বাঁধন ছেঁড়ার এই যে যন্ত্রণা তার ভয়ে সে যদি না যায়, তা হলে কি হবে? বি.এস-সি পাস করার পর উচ্চতর শিক্ষা শেষ। কাকাবাবু-কাকিমার স্নেহের সুযোগ সে এ পর্যন্ত নিয়েছে মাত্রাতিরিক্ত। আর নিলে তা হবে চূড়ান্ত স্বার্থপরতা—ক্ষমাহীন অপরাধ। কাজেই তাকে চাকরি যোগাড়ে নামতে হবে। তার মানে জীবনের স্বপ্নসাধ সবকিছুরই চিরসমাধি, ভবিষ্যতের এগিয়ে যাবার সমস্ত পথই চিরকালের মতো রুদ্ধ।

আর যদি সে যায়, তা হলে? কান্নার সমুদ্র পার হতে হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সামনে খুলে যাবে অশেষ সম্ভাবনাময় এক নতুন জগৎ। আদর্শের জন্যে মানুষ কত দুঃখ বরণ করে, কত ত্যাগ স্বীকার করে। মঞ্জুকে তো এই সব কথাই সে লিখেছে। সে সব ত্যাগের তুলনায় তার এ তো কিছুই নয়। এটুকু ব্যথা সে সইতে পারবে না? তা ছাড়া এ বিচ্ছেদ তো চিরকালের নয়, একান্ত সাময়িক। ভবিষ্যতে সুখ ও তৃপ্তির হাসি ফুটবে তার আপনজনদের মুখে, তার তুলনায় আজকের এই বিচ্ছেদব্যথা কতটুকু?

রঞ্জু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলো। মাথা ঝাঁকালো কয়েকবার। তারপর ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইলো সামনের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে ঃ হ্যাঁ, এই তো পথ। আর দোটানা নয়, দ্বিধাদ্বন্দ্ব নয়।

॥ দুই ॥

না বলে-কয়ে কোন ভোরে রঞ্জু বেরিয়ে গেছে। সকাল কেটে দুপুর হলো, তবু তার ফেরার নাম নেই। বিকেলও কেটে যায়। ব্যাপার কি! কুনাল অস্থির, দুপুরের আগে থেকেই শুধু ঘর-বার করছে।

সন্ধ্যা উতরে যেতে সে আর চুপ থাকতে পারে না। হোটেলের মালিক নীলকান্তবাবুকে গিয়ে জানালো ঘটনাটা।

নীলকান্তবাবু ব্যাপারটায় তত গুরুত্ব দেন না। বললেন,—এখুনি এত উতলা হবার

কি আছে? দূরে কোথাও গিয়ে থাকতে পারে, কাজে আটকা পড়ায় দুপুরে ফিরতে পারে নি। বিকেলে ফেরার পথে হয়তো বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে সিনেমা-থিয়েটার গেছে। কাজেই আরো কিছু সময় দেখা যাক। তার মধ্যে ও নিশ্চয়ই ফিরবে।

কিন্তু রাত সাড়ে নটার পরও রঞ্জু না ফেরায় নীলকান্তবাবুর কপালেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ে। স্থানীয় থানায়, লালবাজারে এবং হাসপাতালগুলোতে তিনি খোঁজ নেবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু বৃথাই।

রাতে আর কিছু করার নেই। কাল দেখা যাবে। —তিনি শুতে চলে গেলেন।

আর কুনাল উদ্বেগ দুশ্চিন্তায় ছটফট করতে করতে, সে একতলা-দোতলা করে বেড়ায়। কোথায় যেতে পারে রঞ্জু? সম্ভব-অসম্ভব নানা জায়গার কথা মাথায় আসে। কিন্তু কোনওটাই মনঃপূত হয় না। অনিবার্য কারণে কোথাও কি সে আটকে পড়লো? শেষ পর্যন্ত গাড়ি ফেল করেছে? কিন্তু তাকে না বলে এভাবে রঞ্জু কোথাও যাবে, তাই বা হয় কি করে?

এমনি সব চিন্তাভাবনায় কোথায় পালিয়ে গেছে তার চোখের ঘুম! নিঝুম নিশুতিতে কোথাও একটু শব্দ হলেই সে টর্চ নিয়ে ছুটে যায় নিচে, উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করে দরজার পাশে। ক্লান্ত অবসন্ন দেহ-মন। শেষে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো সে শেষ রাতের দিকে।

পরদিন বেশ বেলা হয় তার ঘুম ভাঙতে। একছুটে হোটেলের অফিসে গিয়ে সে দাঁড়াতেই, খেঁকিয়ে উঠলেন নীলকান্তবাবু,—না বাপু, যাই বল, জলজ্যান্ত একটা বয়েসী জোয়ান ছেলে এভাবে হঠাৎ বেপাত্তা হতে পারে না। সকালে আবার লালবাজারে হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নিয়েছি। কোনও খবর নেই। রঞ্জনের এই উধাও হবার পেছনে নিশ্চিত কোন গূঢ় রহস্য আছে, তুমি তা জান না। নির্ঘাত সে ডুবে ডুবে জল খেত। এইটা পুলিশেরও কথা।

বলতে-বলতে তিনি বিড়ি ধরিয়ে আবার শুরু করলেন,—হ্যাঁ, ভালো কথা। রঞ্জনের বিছানা, টেবিল, বই পত্তর, সুটকেস ইত্যাদি সার্চ করে দেখেছ? দেখনি? পুলিশ ওটা করতে বলেছে। ভালো করে খুঁজে দেখ তো, রঞ্জনের লেখা কোন চিঠি বা এমন কিছু পাও কিনা, যা থেকে তার এই অন্তর্ধানের কিছু সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

রঞ্জুর স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে নীলকান্তবাবুর মন্তব্যে ও কথার ঢংয়ে রাগে কুনালের ব্রহ্মতালু পর্যন্ত টাটাচ্ছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে সে হজম করে নেয় সব কিছু।

নীরবে অফিসঘর থেকে তার বেরোনোর মুখে আবার ডাকলেন নীলকান্তবাবু,—শোন, সর্বাগ্রে এক কাজ করো। এখুনি সব জানিয়ে বাড়িতে বাবাকে টেলিগ্রাম করে দাও। নিরঞ্জনবাবু এসে যা ভালো বোঝেন, করবেন।

টেলিগ্রাম সেরে কুনাল ওপরে নিজের ঘরে এল। বিক্ষিপ্ত বিপর্যস্ত মন। আগামী শুক্রবার তাদের বাড়ি রওনা হবার কথা। আর আজ মঙ্গলবার কিনা এই কাণ্ড।

রঞ্জুর জিনিসপত্র তল্লাশি করার যে কোনও মানে হয় না, তাতে সে নিঃসন্দেহ। তাকে না জানিয়ে শুধু চিঠি লিখে রেখে রঞ্জু কোথাও চলে যাবে, এটা চিন্তা করা যায় কখনও? আর যাবেই বা কোথায়?

তবু সে শুরু করলো রঞ্জুর জিনিসপত্র ঘাঁটতে। তন্নতন্ন করে খুঁজলো সব কিছু।

যা ভেবেছিল তাই, কিছুই মিললো না। তবে দুটো ব্যাপার তার কাছে ভারি তাজ্জব ঠেকে। প্রথমত রঞ্জুর ট্রাঙ্ক এরকম ফাঁকা কেন? তাতে তার যেসব কোট-প্যান্ট-শার্ট থাকার কথা তা কোথায় গেল? অনেক পুরনো এক প্রস্থ শার্ট-প্যান্ট আর খানতিনেক ধুতি শুধু পড়ে আছে। দ্বিতীয়ত মঞ্জুর লেখা প্রত্যেকটা চিঠিই রঞ্জু মহাযত্নে ট্রাঙ্কে গুছিয়ে রাখতো, এটা সে ভালো করেই জানে। একখানা চিঠিও নষ্ট হতে দিত না। মাঝে-মাঝে মঞ্জুর লেখার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে কোনও-কোনও চিঠি সে তাকে পড়তেও দিত। সেসব চিঠিই বা গেলো কোথায়? একখানারও তো পাত্তা নেই।

হঠাৎ এই আবিষ্কারে কুনাল হতভম্ব হয়ে যায়। দুটো ব্যাপারই খুব রহস্যজনক। মাথায় হাত দিয়ে সে বসে থাকে, আকাশ-পাতাল ভেবেও এ হেঁয়ালির কোনও কিনারা পায় না।

সত্যিই কি রঞ্জু তাকে না বলে কোথাও চলে গেল? এটা কি পূর্ব পরিকল্পিত? তার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য কি তা হলে এইজন্যে? কিন্তু কেন সে যাবে? ভেবে-ভেবেও কুনাল কোনও কারণ বা যুক্তি খুঁজে পায় না।

টেলিগ্রাম পেয়েই নিরঞ্জনবাবু ছুটে এলেন। সঙ্গে এলেন নৃপেন্দ্রবাবুও। গভীর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা তাঁদের চোখেমুখে।

কুনালকে দেখে নিরঞ্জনবাবু চমকে উঠলেন,—এ কী খোকন, তোর এ কী চেহারা হয়েছে? অসুখ করেছে নাকি? করেনি? তাহলে? রাতে কি ঘুমোস নে? ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া?

কুনাল মাথা নিচু করে সরে যায়। আড়ালে চোখের জল মোছে। মনে তার প্রশ্নের ঝড় : মঞ্জু এল না কেন? সোনাদাকে পাওয়া যাচ্ছে না শোনামাত্রই তো তার পাগলের মতো ছুটে আসার কথা। তা হলে? রঞ্জুর অন্তর্ধানের ব্যাপারটা সে কি আগে থেকেই জানতো?

একান্তে বাবাকে সে জিজ্ঞেস করলে,—রঞ্জুর হারিয়ে যাওয়ার খবর শুনে মঞ্জুর কি অবস্থা?

নিরঞ্জনবাবু বললেন,—কান্নাকাটি করছে, তবে মাত্রা ছাড়া নয়। বড় হয়েছে তো, বুঝতে শিখেছে।

—তোমাদের সঙ্গে আসতে চায়নি?

—না, সেটাই রক্ষে।

কুনাল তখন জানালো রঞ্জুর ট্রাঙ্ক তালাশ করে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে। শুনে নিরঞ্জনবাবু স্তম্ভিত। চোখে ভ্রূকুটি।

যাই হোক, নতুন করে আবার শুরু হলো খোঁজাখুঁজি। কিন্তু কোথায় রঞ্জু? ব্যর্থ হয় সব কিছু।

ভাঙা মন নিয়ে কুনাল বাড়ি রওনা হলো বাবা ও অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডস্যারের সঙ্গে। পেছনে পড়ে রইলো রঞ্জুর স্মৃতি।

রঞ্জুর এই হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ার আঘাত স্বল্পভাষী নৃপেন্দ্রবাবুর বুকে কতখানি বেজেছে তা তাঁর কথা থেকে যেটুকু বোঝা যায়, তার থেকে অনেক বেশি বোঝা যায় তাঁর মুখের দিকে তাকালে। এ কয় দিনেই তাঁর বয়স বুঝি এক যুগ বেড়ে গেছে।

কুনালদের বাড়ির অবস্থা অনুমান করা কঠিন নয়। পক্ষাঘাতে যেন নিথর হয়ে আছে বাড়িটা। রঞ্জুহীন কুনালরা ফিরতেই বোবা কান্নায় ভেঙে পড়লো। মায়ের সে আকুল-করা

শোকে কুনালেরও আর আড়াল-আবডাল থাকে না। দু-চোখে নামে অঝোরে জলের ধারা। আর স্তব্ধ হয়ে পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকেন নিরঞ্জনবাবু। চোখে তাঁর নিরুপায় শূন্য দৃষ্টি।

কিন্তু মঞ্জু? মঞ্জু কোথায় গেল?

কুনাল তাকে পেল ওদিককার ঘরে। নিরালায় এককোণে বসে দু-হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদছে সে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে। .

অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে কুনাল জিজ্ঞেস করলে,—একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস করি, খুকু। রঞ্জুর এই ঘরছাড়ার ব্যাপারটা তুই কি আগে থেকে কিছু আঁচ করতে পেরেছিলি?

ধাতস্থ হতে মঞ্জুর বেশ সময় লাগে। কান্নাভেজা গলায় একসময় বললে,—নারে দাদা, তা হলে তো তোদের আগে থেকে সাবধান করে দিতাম। তবু জানিস, নিজের ওপর আমার কী যে রাগ হচ্ছে, কি বলবো! এ দুঃখের কোন চারা নেই।

বলতে-বলতে মঞ্জু আবার কেঁদে ফেলে ঝরঝর করে।

একটু সময় নিয়ে কুনাল জিজ্ঞেস করলে,—কি দুঃখ, একটু খুলে বল না? নয়তো বুঝবো কি করে?

আঁচলে চোখ মুছতে-মুছতে মঞ্জু বললে,—কিছুকাল থেকে মাঝেমাঝে একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। গত চার পাঁচ মাস ধরে সোনাদা চিঠিতে এমন সব কথা লিখতো, যা পড়তে-পড়তে মন ভার হয়ে উঠতো। কথাগুলো খুব খাঁটি ও দামি হলেও, অস্বস্তি বোধ হতো। তাকে চিঠিতে জিজ্ঞেসও করেছিলাম, হঠাৎ এসব কথা লেখার কারণ কি? উত্তরে যা সে লিখেছিল, আজ তা স্তোকবাক্য। সে যে এভাবে ঘর ছাড়বে, তা যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারতাম, তা হলে তো আগে থেকে—

কান্নার আবেগে অশ্রুমুখী মঞ্জু কথা শেষ করতে পারে না।

কী লিখতো রে, রঞ্জু? —একটু থেমে কুনাল প্রশ্ন করে।

—সে অনেক কথা। লিখতো, আদর্শসিদ্ধির জন্যে মানুষ কত দুঃখকষ্ট বরণ করে, কত ত্যাগ স্বীকার করে। এ পৃথিবীতে সত্যিকার জ্ঞানে ও কর্মে খাঁটি মানুষ হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার স্বপ্ন সফল করতে হলে, দুঃখকষ্ট ও পরিশ্রমের অগ্নিপরীক্ষা পার হতে হবেই। শোকতাপ জয় না করলে, জীবনের স্বপ্নসাধ বা উচাকাঙ্ক্ষা কোনও কিছুই সফল হতে পারে না। এমনি আরও কত সব কথা।

—চিঠিগুলো দেখাতে পারিস?

কেন পারবো না? —বলে মঞ্জু বাক্স থেকে বড় এক তাড়া চিঠি এনে দিলে।

চিঠিগুলো খুঁটিয়ে পড়ে শুধু কুনালের নয়, নিরঞ্জনবাবু এবং সাবিত্রী দেবীরও বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হলো না যে, সবদিক ভেবেচিন্তে রঞ্জু স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করেছে।

নৃপেন্দ্রবাবুকেও গোপনে এটা জানিয়ে দেওয়া হলো।

ইতিমধ্যে রঞ্জুর মামা অনাদিবাবু এসেও জেনে গেছেন শেষ খবর।

আর কুনাল? সবকিছু জানা ও বোঝার পর স্তম্ভিত বিমূঢ় হয়ে গেছে সে। পৃথিবী তার চোখে আজ বিবর্ণ নীরস ও নিরানন্দ। একদিকে প্রিয়তম বন্ধু-বিচ্ছেদের দুঃসহ ব্যথা, অন্যদিকে বন্ধুর প্রতি দুর্জয় অভিমান, দুইয়ে মিলে তাকে বুঝি বোবা করে দিয়েছে।

॥ সংযোজন ॥

আমরা তো জানি, রঞ্জু পাড়ি দিয়েছে কানাডার পথে। মিঃ মেলস্যাম ও তাঁর পুত্র রবার্টের দুনিয়াজোড়া কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে। রবার্টের ভাষায়—'দুনিয়াটা কত বড় দেখতে'।

কিন্তু যারা পিছনে পড়ে রইলো, যারা তাকে বেঁধেছিল অচ্ছেদ্য স্নেহের বাঁধনে, তাদের অবস্থাটা কী? অভিন্নহৃদয় সহোদরপ্রতিম বন্ধু কুনাল, মঞ্জু, তাদের বাবা-মা, নৃপেন্দ্রবাবু?

এঁদের কাছে তো রঞ্জু বা রঞ্জনকুমার চৌধুরী নিরুদ্দেশ। আচমকা উবে গেছে কর্পূরের মতো। ব্যথা ও বিস্ময়ের ধাক্কায় তাঁরা মুহ্যমান। এ যে তাঁদের দুঃস্বপ্নেরও অতীত!

তবে শোকের ধাক্কা কমলে ধীরে-ধীরে ঘটনাক্রম বিচার করে তাঁরা একমত হয়েছেন রঞ্জু আচমকা ঘর ছাড়ে নি। তার অন্তর্ধান পূর্বপরিকল্পিত।

কিন্তু এতবড় পৃথিবীতে কোথায় গেল সে? কেনই বা গেল? সে কি এই ভারতের কোথাও, নাকি সুদূর বিদেশে?

দিন কেটে যায়, কেটে যায় মাস, বছর।... সময়ের নরম প্রলেপ জমতে থাকে বিচ্ছেদের ক্ষতের ওপর।...

তারপর একদিন... হ্যাঁ, রঞ্জুর আকস্মিক অন্তর্ধান রহস্যের যবনিকা একদিন উন্মোচিত হলো, প্রথম তার প্রিয়তম বন্ধু কুনালের কাছেই। কুনাল হিসেব কষে দেখেছে, রঞ্জুর গৃহত্যাগের তিন বছর চার মাস আঠারো দিন পর।

এই উপন্যাসের পরবর্তী অংশ শোনা যাক কুনাল মজুমদারের জবানিতেই।

দ্বি তী য় অ ধ্যা য়

॥ এক ॥

বি.এ পাস করে আর পড়িনি। মা-বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন কত বলেছেন। কিন্তু রঞ্জুহীন ছাত্রজীবন আমার কাছে অসহ্য। পুরনো নীলকান্তবাবুর হোটেলও ত্যাগ করি—রঞ্জুর অসংখ্য মধুর স্মৃতি ছড়িয়ে আছে সেখানে।

অফিসের চাকরি নিয়েছি। দশটা-পাঁচটা দিনগত পাপক্ষয় সেরে সোজা মেসে ফিরে আসি। চলে যাই ছাদে। তাকিয়ে থাকি তারায় ভরা সন্ধ্যাকাশের দিকে।

ভালো লাগে না, কিছুই ভালো লাগে না।...

সেদিন শনিবারের অফিস, হাফ্ ডে। হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় বদলে রোজকার মতো ছাদেই গিয়ে বসি। মাথায় চলেছে এলোমেলো নানা চিন্তার স্রোত...

ঝালদিয়ার দেশের বাড়ি থেকে বাবা চিঠি দিয়েছেন। মায়ের ইচ্ছে, মঞ্জুর বিয়ে দেবার। বয়সে সে তো আর ছেলেমানুষ নেই, এবার বি.এস-সি পরীক্ষা দিয়েছে। তাই উপযুক্ত পাত্রের খোঁজ খবর শুরু করা দরকার।

কিন্তু মঞ্জু অনড়—বিয়ে সে করবে না! তার সোনাদা অর্থাৎ রঞ্জুর কথামতো আগে সে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, তারপর অন্য কথা।

মায়ের ইচ্ছে, আমি যেন বোনটিকে গিয়ে রাজি করাই। ভাবতেই মনে-মনে হেসে ফেলি, মঞ্জুকে রাজি করানো! তার মতের বিরুদ্ধে? ওর যুক্তির কাছে আমি তো নস্যি!

রঞ্জু, রঞ্জুই যত নষ্টের গোড়া! কি দরকার ছিল তোর এমনভাবে এসে আমাদের জীবনে জড়ানোর, এমনভাবে ভালোবাসার বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলার?

দিন শেষ হয়ে আসছে। আবিররাঙা অস্তাচল। পাখিরা ফিরছে ঝাঁক বেঁধে। রঞ্জুও কি এমন করে ফিরবে না তার ঘরে, তার আপনজনেদের কাছে?

এমন সময় পাশ থেকে দামুর গলা শোনা গেল,—বাবু, ও কুনালবাবু!

ক্-কে? কী?

মুহূর্তে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল।

—বাবু, আপনের চিঠি। মেনজারবাবু পাইঠে দিছেন।

আনমনে হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিতেই, যেন ধড়ফড় করে উঠলাম : আঁ, বড় আকারের সুদৃশ্য রঙিন খামের চিঠি! উপরে চমৎকার সব ডাকটিকিট সাঁটা। এসেছে বিদেশ থেকে। নীলকান্তবাবুর হোটেলের ঠিকানা ঘুরে এসেছে।

কে—কে লিখলো এ চিঠি? কোথা থেকে লিখলো?

খামের উলটো পিঠে চোখ পড়তেই, ভীষণ চমকে উঠলাম : কে? কে? আর কে চৌধুরী! কোন আর কে চৌধুরী? তবে কি—তবে কি—

খামখানা খোলারও যেন তর সইছে না...

কী সাংঘাতিক! রঞ্জুর চিঠি! রঞ্জু চিঠি লিখেছে কানাডা থেকে।

দীর্ঘ পত্র—রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেলি। পড়তে-পড়তে মন কখনও ভারী হয়ে ওঠে, কখনও বা চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

স্তব্ধ অভিভূত আমি—বসে থাকি...

কত-কতকাল পরে রঞ্জুর খবর পেলাম। যদিও দূরদেশে আছে, তবু ভালো আছে, সুস্থ আছে—এ খবরে মন কোথায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠবে, তা নয়, উলটে আনন্দ বেদনা দুঃখ রাগ অভিমান, সব কটা আবেগ যেন মিলেমিশে আমার ভেতরটা তোলপাড় করতে থাকে।

সময় কেটে যায়। অশান্ত উদ্বেল মন ধীরে-ধীরে শান্ত হয় একসময়। সন্ধ্যার ম্লান আলোয় আবার পড়ি পত্রখানা।...

পত্রের অনেকখানিই নিতান্ত ব্যক্তিগত। আমাদের না জানিয়ে অন্তর্ধান ও দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের কৈফিয়ৎ সে দিয়েছে অনেক জায়গা জুড়ে। লিখেছে, এর ফলে আমাদের বিশেষ করে আমার কী অবস্থা হয়েছিল, তা দূর থেকে মনশ্চক্ষে প্রতি মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছিল। লিখেছে, 'বিশ্বাস কর্, তোরই মতো গোপনে আমি কেঁদেছি দিনের পর দিন।... তবু চলে এলাম। কারণ পৃথিবী ঘোরার স্বপ্ন আমার ছোটবেলা থেকে। বারে-বারে মনে হতো জন্ম-অভাগা আমি, এগারো-বারো বছর বয়সেই ভাগ্যবিধাতা যাকে সব বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, ভবঘুরের অনির্দেশ জীবনই বোধহয় তার ললাট-লিখন।... নিজের মনের অস্থিরতা আর তোদের ব্যথা থিতিয়ে পড়ার জন্যে এই অজ্ঞাতবাস বোধহয় দরকার ছিল। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে।'

তারপর জনে-জনে প্রত্যেকের খবরাখবর চেয়ে শেষে কি করে সে দেশ থেকে বেরোতে পারলো তার বিবরণ দিয়েছে।

'রবার্টকে তোর মনে পড়ে? —সেই ইংরেজিভাষী কানাডিয়ান ছেলেটিকে, ফোর্থ ইয়ারে পড়ার সময় সেবার সুন্দরবনে শিকার করতে গিয়ে যার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল? পৃথিবীজোড়া ব্যবসা তাদের—ইঞ্জিনিয়ারিং, পেট্রোল ও অন্যান্য খনিজ, সমুদ্রে তিমি, সীল

প্রভৃতি শিকার, এমনি সব হরেক রকমের কারবার। যাকে বলে কোটি-কোটিপতি মাল্টি-বিলিঅ্যানিয়্যার, তারা তাই।

...কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার হলো, কয়েকদিনের মেলামেশার ফলে রবার্ট আমার ভারি ন্যাওটা হয়ে পড়ে।...

'...তার বাবার সঙ্গেও পরিচয় হলো। মেলস্যাম সাহেব ব্যবসার স্বার্থে ছেলেকে নিয়ে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছেন। দিলদরিয়া মানুষ।... কলেজের ছুটির পর ওদের কাছে যেতে হতো, বেরোতেও হতো। যাকে বলে জবরদস্তি, অবশ্য ভালোবাসার।...

'রবার্ট আমার কাছে বাংলা শিখতে শুরু করেছিল। বুদ্ধিমান, তাই কিছু দিনের মধ্যেই কাজ চালানো গোছের ভাষা রপ্ত করে ফেললো। যা কিছু ফ্যাসাদ বাঁধতো উচ্চারণ নিয়ে।... রবার্ট প্রায়ই বলতো, আমাদের দেশে চলো। দেখবে দুনিয়াটা কত বড়।... তার কথায় গভীর আন্তরিকতা থাকলেও বিশেষ আমল দিতাম না। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝলাম তখনি, যখন তার বাবা মেলস্যাম সাহেবও একদিন পাড়লেন কথাটা। ওদের ব্যবহারে ও কথাবার্তায় বুঝতে পারছিলাম, আমাকে ওদের কেন জানিনে খুব ভালো লেগেছে। তার পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। আমি রাজি হলাম। ঠিক হলো, বি.এস.সি. পরীক্ষার পরই রওনা হবো। সব ব্যবস্থাই ওদের।'

সবশেষে সংক্ষেপে সে লিখেছে তার অভিজ্ঞতার কথা—'এ কয় বছরে ঘুরেছি বহু জায়গায়। আজো ঘুরছি। জীবনে যা চেয়েছিলাম, যা স্বপ্ন দেখতাম, তা এমন করে মিলে যাবে, কে ভাবতে পারে! চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার, নেশার সঙ্গে পেশার এমন মিল বোধহয় কদাচিৎ নজরে পড়ে।... ওইসব অভিজ্ঞতার ঘটনা যদি জানতে চাস লিখিস।...'

রঞ্জুকে পত্র লিখলাম।

তারপর থেকেই পত্রের আদানপ্রদান চলেছে নিয়মিত আমাদের মধ্যে। রঞ্জু মাঝে মাঝে টাকা পাঠায়—তার পরিমাণ মোটেই কম নয়, অন্তত আমাদের দেশের হিসাবে। তার নির্দেশ মতো সে টাকার যথোচিত বিলিব্যবস্থা করার দায়িত্ব আমার উপর। টাকা সে পাঠায় বাবার কাছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডস্যারের কাছে আর মামা অনাদিবাবুর কাছে।

বাবা সে টাকা নেন না। রঞ্জুর অনুনয় সত্ত্বেও। আমায় বললেন,—ছেলের টাকা নিতে বাপের আর আপত্তি কি? কিন্তু এখন তো দরকার হচ্ছে না। ওটা তুই রঞ্জুর নামে ব্যাঙ্কে জমা রাখ।

অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড স্যারেরও টাকা নিতে প্রথমে তীব্র আপত্তি ছিল। কিন্তু রঞ্জুর চিঠির পর এবং বাবার ও আমার অনুরোধে তিনি শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছেন। রঞ্জুর চলে যাওয়ার কিছুকাল পরেই তিনি রিটায়্যার করেন। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। দুটি মেয়ে নিয়ে চারজনের সংসার প্রায় অচল। রঞ্জুর টাকায় পরে মেয়ে দুটির বিয়ে হয়।

রঞ্জুর মামা-মামির টাকা নিতে আপত্তির প্রশ্নই ওঠে না। আপত্তি তাঁদের ছিল, তবে তা অন্য ক্ষেত্রে—টাকার বিলিব্যবস্থার দায়িত্ব ও অন্যদের টাকা দেওয়া নিয়ে। ব্যাপারটা রঞ্জুকে লিখতে গিয়েও পারি নি, মন বেঁকে বসলো। কিন্তু পরে বুঝলাম, মামা অনাদিবাবু এত বড় একটা অন্যায় বরদাস্ত করতে না পেরে, শেষ পর্যন্ত আমার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে রঞ্জুকে চিঠি লিখেছিলেন। সে চিঠির উত্তর এল আমার কাছে লেখা পত্রের মধ্যে। তারপর থেকে মামাবাবু চুপ।

অভাবই সাধারণ মানুষের স্বভাব নষ্ট করে ফেলে। ঈর্ষা, মানসিক দৈন্য ও হীনতা তাকে টেনে নিয়ে চলে অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে। রঞ্জুর মামা-মামিকে তাই কি দোষ দেব! তবু স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ক্ষণেকের জন্যে হলেও তার ছায়া পড়েছিল আমার মনের ওপর। রঞ্জুর পত্রে নিজের এই ক্ষুদ্রতা আমার কাছে বিরাট হয়ে ধরা পড়ে। রঞ্জু কত ঊর্ধ্বে, আর আমি কোথায়! নিজের মনের এই অন্ধকারকে আমি কোনওদিন ক্ষমা করতে পারি নি—তা ক্ষণিক হলেও পারি নি।

যাক গে ওসব কথা। মানুষের জীবনের সাময়িক আলোছায়ার খেলা মাত্র। আসল হচ্ছে রঞ্জুর সেই চিঠিগুলো—আমার কাছে যা অমূল্য সম্পদ। যেমন অভিনব তাদের বিষয়বস্তু, তেমনি বিস্ময়কর।

এক ভবঘুরে বিশ্বপথিকের বিচিত্র রোমাঞ্চকর জীবনের রোজনামচাও বলা চলে। নিস্তরঙ্গ জীবন আমাদের, তাই সময়-সময় সেসব বিশ্বাস করাও কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু আমি জানি, তার প্রতিটি কথা সত্যি।

রঞ্জুর চিঠিই শুরু করি এবার। তার তৃতীয় পত্র থেকেই শুরু করা যাক।

॥ দুই ॥

উদ্বেল সমুদ্র—অশান্ত উত্তাল। জাহাজে চলেছি তিমি শিকার করতে। আমি অবশ্যি শিকারী নই—দর্শক মাত্র। সঙ্গে রবার্ট। এই আমার প্রথম তিমি শিকারে যাত্রা। কিন্তু সেদিন সাংঘাতিক যে বিপদের মুখে পড়েছিলাম, তাতে এটা শেষ যাত্রা হওয়াও অসম্ভব ছিল না।

সকাল বেলা। একটু আগেও আকাশ পরিষ্কার ছিল। দেখতে-দেখতে হাওয়া বাড়তে শুরু করলো। আকাশে মেঘ জমছে। পাক খেয়ে-খেয়ে ছুটছে পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘ। চারদিক কুয়াশায় ঢাকা। বেশি দূর দৃষ্টি চলে না। উত্তাল সমুদ্রে ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে জাহাজের গায়ে। সফেন সমুদ্র-জলে এক-একবার নেয়ে উঠছি।

সমুদ্র গর্জন আর ঢেউয়ের মাঝে জাহাজটা আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে মোচার খোলার মতো। পাহাড়-সমান উঁচু ঢেউয়ের মাথায় সে উঠছে, মুহূর্তের জন্য দোদুল্যমান অবস্থায় সেখানে দুলছে অনিশ্চিতভাবে, পরক্ষণে তীরবেগে খাড়া নামছে নিচের দিকে—মাথা নিচু দিকে করে। আর প্রতিবারই আমার মনে হচ্ছে—এই শেষ! আর বোধহয় উঠতে হবে না, নির্ঘাত পাতালে যেতে হবে।

বড্ড দুলছে জাহাজটা। এত দুলছে যে পা ঠিক রাখা কঠিন। তুই তো জানিস্, আমার নার্ভ খুব দুর্বল নয়। তবু মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। পা টলছে। মনে যেন অসুস্থ বোধ করছি।

জাহাজটা বড় নয় বিশেষ। রবার্ট বলল,—জাহাজের তলাটা অনেকটা ধনুকের মতো গোল। তাই দোলে বেশি। এ দোলায় বহু ওস্তাদ-মাল্লা-খালাসিও কাহিল হয়ে পড়ে, তুমি তো কোন ছার।

তিমি ও তিমি-শিকার স্বচক্ষে দেখার সাধ অনেক দিন থেকে। সমুদ্র-দানবকে সমুদ্রে তার নিজস্ব পরিবেশে দেখিনি কখনো।

মেঘ ও কুয়াশা পাতলা হয়ে এল। বাতাসের বেগও কমেছে।

ধীরে-ধীরে আকাশ পরিষ্কার হলো। কুয়াশা কেটে গেছে। রোদে ঝলোমলো শান্ত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কে বলবে, কিছুক্ষণ আগেও তার ক্রুদ্ধ উন্মত্ত তাণ্ডবে আমাদের দুঃখের

সীমা ছিল না। ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে—যত দূর দৃষ্টি যায়—চোখে পড়ে শুধু নীল জলরাশি, ছোট-ছোট খণ্ড ঢেউগুলো রোদে চিকচিক করছে।

হঠাৎ চিৎকার কানে এল—তিমি! ডাইনে! দলে অনেকগুলো!

আমি লাফিয়ে উঠলাম, যেন বিদ্যুতের শক লেগেছে। ঘড়ি দেখলাম, দু-ঘণ্টার উপর জাহাজ ছেড়েছি।

চিৎকার এসেছে মাস্তুলের মাথা থেকে। সেখানে কাঠের তৈরি ঘেরা-জায়গাটায় দাঁড়িয়ে একজন লোক দূরবীন দিয়ে সমুদ্রে তিমি খুঁজছে তন্নতন্ন করে। জায়গাটা দেখতে অনেকটা প্রকাণ্ড এক পিপের মতো—মাস্তুলের সঙ্গে আটকানো।

চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখার চেষ্টা করছি। কিন্তু নাঃ! কিছুই চোখে পড়ে না।

ক্যাপ্টেন ডেভিড বললেন,—এখনো ওরা বহু দূরে আছে।

পূর্ণ বেগে জাহাজ চলেছে। ক্যাপ্টেন ডেভিড ও রবার্টের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি ব্রিজের ওপর, অর্থাৎ উঁচু পাটাতনটার ওপর—সেখানে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন আদেশ-নির্দেশ জারি করেন।

ভিতরে-ভিতরে উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছি। হঠাৎ দূর সমুদ্র থেকে এক গম্ভীর গর্জন কানে এল।

গর্জন! খোলা সমুদ্রে কিসের গর্জন!

ক্যাপ্টেন যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন—তিমির গর্জন, তবে গলার নয়, নাকের।

সঙ্গে-সঙ্গে পরিষ্কার হলো ব্যাপারটা। ক্যাপ্টেন আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সময় পেলেন না। বহু দূরে সমুদ্রে জলের ফোয়ারা দেখা গেছে। তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। জাহাজের গতিবেগ আরো বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই সুযোগটার জন্যে রবার্ট যেন মুখিয়ে ছিল, মনে হলো। বললে,—কি, তিমি-টিমি সম্বন্ধে জানো কিছু? ওই যে ক্যাপ্টেন বললো, গর্জনটা তিমির নাক থেকে আসছে, বুঝলে কিছু?

আমিও সুযোগ ছাড়লাম না। বোকা-বোকা মুখ করে আনাড়ির মতো বললাম,—কি আর বুঝবো? মনে হলো, ওরা নাক ডেকে ঘুমোয়।

—তোমার মাথা! বলেই ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালো। আমার এতখানি আনাড়িপনা বোধহয় ও আশা করে নি, তাই সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

কিন্তু আমার নিখুঁত অগারামের অভিনয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ও আশ্বস্ত হলো। বললে,—তিমি এক কালে স্থলচর প্রাণী ছিল জানো?

—তিমি? স্থলচর প্রাণী?

—হ্যাঁ। সুদূর কোন এক আদিম যুগে ওরা ডাঙা থেকে জলে নেমে যায়। কেন, বলা দুষ্কর। ওরা স্তন্যপায়ী প্রাণী।

আমি নিরেট বোকার অভিনয় করে চলেছি,—তিমি স্তন্যপায়ী প্রাণী!. বলো কি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। —বিজ্ঞের মতো রবার্ট বললে ঃ ওদের ডিম হয় না, বাচ্চা হয়। সাধারণত একটাই বাচ্চা হয় এবং হয় বেশ বড় আকারে। কারণ জন্মেই তো ওদের জলে সাঁতার কাটতে হবে। কদাচিৎ যমজ বাচ্চাও দেখা যায়। মাছের মতো ওদের কান্‌কো-ফুলকো নেই, তাই জল থেকে ওরা অক্সিজেন নেয় না, ডাঙার প্রাণীর মতো ফুসফুসের সাহায্যে বাতাস টেনে নেয়।

রবার্টের গুরুগম্ভীর বক্তৃতা ও মুখের হাবভাব দেখে হঠাৎ হেসে ফেলেই অন্য দিকে মুখ ফেরালাম। আশঙ্কা হলো, রবার্ট বোধহয় দেখে ফেলেছে। কিন্তু না, সেদিকে নজর দেবার তার ফুরসৎ নেই। তিমি সম্পর্কিত তার জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দেবার জন্যে সে তখন মরিয়া। হাতে সময় খুব কম, তিমিগুলোর কাছে জাহাজ পৌঁছনোর আগেই কাজটা সেরে ফেলতে হবে। তাই অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললে,—কি হলো?

মুখ ফিরিয়ে ন্যাকার মতো বললাম,—কি আর হবে? তোমার কথায় তাজ্জব বনে গেছি। যেভাবে ঝড়ের মতো বলে চলেছ, তাতে সবটা হজম করারও সময় পাচ্ছি নে।

—তা তো হবেই। তারপর শোন। তিমি যেমন জলের ওপর ভাসে, তেমনি জলের তলায়ও কাটায়। পনেরো-কুড়ি মিনিট, আধঘণ্টা, পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত। জলের তলায় ডুব দেবার আগে ওরা নাক দিয়ে বাতাস টেনে ফুসফুস ভর্তি করে। তারপর নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় হলেই জলের ওপর ভেসে ওঠে। নাকটা আগে ভাসে, কারণ ওটা মাথার ওপর কিনা তাই। তখন ওরা এতক্ষণের বন্ধ-করা নিঃশ্বাস প্রচণ্ড জোরে ত্যাগ করে আর বাতাস টেনে নেয়। সেই সময় ওই শব্দ হয়। বুঝতে পারছো?

—হুঁ, তা পারছি কিছু-কিছু, কিন্তু—

হাত নেড়ে আমায় থামিয়ে দিয়ে রবার্ট বললে,—আর ওই যে জলের ফোয়ারা দেখছো, ওটা হলো ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা ওই গরম নিঃশ্বাসের পরিবর্তিত রূপ, গরম জলীয় বাষ্প। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে আসতেই গরম ওই জলীয় বাষ্প জলকণায় রূপান্তরিত হয়। তখন তাকে দেখায় জলের ফোয়ারার মতো।

রবার্ট থামলো। তীব্র গতিতে জাহাজ এগিয়ে চলেছে। তিমিগুলোর ফোয়ারা আর দেখা যাচ্ছে না। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলাম,—আচ্ছা তুমি যে বললে, তিমি এককালে ডাঙায় ছিল, তার প্রমাণ কি?

এ প্রশ্নের জন্যে রবার্ট প্রস্তুত ছিল না। থতমত খেয়ে গেল। শেষে তো-তো করে বললে,—প্রমাণ—প্রমাণ আবার কি? বিজ্ঞানীরা তো তাই বলেন—

রবার্টের কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে সরে গিয়ে বললাম,—না হে লম্বকর্ণ মশাই, জবাবটা ঠিক হলো না। তিমি যে এককালে ডাঙার প্রাণী ছিল, তার অনেক প্রমাণ আছে। প্রথমত তাদের রক্ত মাছেদের মতো নয়, আমাদের মতো। মাছ পুরোপুরি জলের জীব বলে জলের তাপ অনুযায়ী তার রক্তের তাপ বাড়ে কমে। গরম জলে তাপ বাড়ে, ঠাণ্ডা জলে তাপ কমে, তাই সমতা ঠিক থাকে। কিন্তু ঠাণ্ডা জীবত তিমি, তার শরীরে সেরকম কোনও ব্যবস্থাই নেই। দ্বিতীয়ত ওদের বাচ্চা হয়, ওরা স্তন্যপায়ী। তৃতীয়ত এককালে ওদের সর্বাঙ্গ লোমে ঢাকা ছিল। কিন্তু প্রয়োজন না থাকায় ধীরে-ধীরে সবই প্রায় ঝরে গেছে। অল্প কিছু লোম শুধু মুখের দিকে এখনও দেখা যায়, কালে কালে হয়তো তাও থাকবে না। চতুর্থত ডাঙার জানোয়ারদের মতো ওদেরও চারখানা পা ছিল। লক্ষ-লক্ষ বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি তাকে ধীরে-ধীরে শেষ পর্যন্ত মাছের আকারে এনে দাঁড় করিয়েছে। জীবজগতে অব্যবহার্য ফালতু কোন অঙ্গের স্থান নেই, জানো তো? কালে কালে তা ছেঁটে বাদ যাবেই। ওদের সামনের পা দুটো বদলাতে-বদলাতে ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু পেছনের পা দুটো একেবারেই লোপ পেয়েছে, যেহেতু তার কোনও দরকারই নেই। তিমির দেহ কাটা হলে তার পেছন দিকে মাংসের মধ্যে দু-দিকে এখনো দু-খণ্ড হাড় দেখতে

পাবে, বুঝলে বাবা পঞ্চাননের বাহন? ওই দুটোই সেই দু-পায়ের অবশেষ শেষ নিদর্শন। কালে কালে ওটাও আর থাকবে না।

কথা শেষ করেই আমি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়লাম ক্যাপ্টেন ডেভিডের দিকে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রবার্ট এতক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। আমি থামতেই সে গর্জে উঠলো, ঘুষি পাকিয়ে ছুটলো আমার পেছনে,—তবে রে পাষণ্ড শয়তান, আবার সেই ইয়ার্কি! এতক্ষণ ন্যাকামি হচ্ছিল!

হারপুন কামানে হাত রেখে ক্যাপ্টেন ডেভিড দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পাশে গিয়ে আমি দাঁড়ালাম। ভাল ছেলের মতো রবার্টও এসে দাঁড়ালো অন্য পাশে। ক্যাপ্টেনের পাশে ওসব করা শোভা পায় না। সমুদ্রের দিকে আমার তখন অখণ্ড মনোযোগ। দু-একবার চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করলাম, রবার্টের চোখ দিয়ে অগ্নিবর্ষণ হচ্ছে, যেন বলছে,—রোসো, ক্যাপ্টেন তো আর সব সময় থাকছে না; তারপর তোমার একদিন, কি আমার একদিন!

ক্যাপ্টেনের নির্দেশে জাহাজের গতি কিছু কমিয়ে দেওয়া হলো। চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখছি। পাঁচটা তিমি—তিরিশ-পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড অন্তর বার চারেক আওয়াজ করলো—অবশ্যি ওই নাক দিয়েই। জলের ফোয়ারা উঠলো পনেরো-ষোল ফুট পর্যন্ত। তার পরেই যেন কোন এক অদৃশ্য সংকেতে পাঁচটা বিশাল কালো দেহের উপরিভাগ বৃত্তাকারে ধীরে-ধীরে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো। মাথা ডুবলো আগে, পিঠ ধনুকের মতো ভেসে উঠে বৃত্তাকারে নেমে গেল জলের নিচে। সব শেষে জলের উপর শূন্যে ভেসে উঠলো লেজ, দেখতে জাহাজের প্রকাণ্ড প্রপেলারের মতো। ধীরে-ধীরে লেজটাও খাড়া নেমে গেল জলের তলায়। পাঁচটা তিমিই অদৃশ্য।

মুগ্ধ বিস্ফারিত চোখে আমি তাকিয়ে আছি। সত্যিই, দেখার মতো দৃশ্য। খাঁটি সমুদ্র-দানব—কী বিশাল আর কী ভয়ংকর। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এত বড় জানোয়ার আর নেই। কত বড় বিশাল দেহ, অথচ কী সাবলীল স্বচ্ছন্দ তার চলাফেরা!

হারপুন কামানের পাশে ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর নির্দেশে জাহাজের গতি আবার পুরো বাড়িয়ে দেওয়া হলো। কামানটার দিকে আমি এগিয়ে গেলাম। এর আগে কখনও হারপুন কামান দেখিনি।

তিমি শিকারের জন্যেই এই অস্ত্রটির আবিষ্কার। আগে বল্লম ছুঁড়ে বা হাত-হারপুন ছুঁড়ে তিমি শিকার করা হতো। কিন্তু তা ছিল যেমন কঠিন, তেমনি বিপজ্জনক। তার ফলে প্রতি বছরই বহু লোকের প্রাণহানি ঘটতো।

হারপুন কামানের হারপুনই মূল অস্ত্র। ওটা ওজনে প্রায় শ'খানেক পাউন্ড, লম্বা চার ফুটের মতো। এক জোড়া দণ্ডের মাথায় ফাঁপা একটা জায়গা থাকে, ইংরেজিতে বলে 'ক্যাপ'। সেটা বারুদজাতীয় বিস্ফোরকে ভর্তি করা হয়। এটাকে বলে 'বোমা'। কামান ছোঁড়ার তিন সেকেন্ড পরে বোমা ফাটে। হারপুনের আগায় ক্যাপের ঠিক পেছনে থাকে বারো-তেরো ইঞ্চি লম্বা চারটে কাঁটা—তাদের গড়ন ঠিক বঁড়শি বা তীরের ফলার মতো। কাঁটাগুলো একসঙ্গে আটকানো থাকে। বোমা ফাটার সঙ্গে সঙ্গে তিমির শরীরের মধ্যে গিয়ে কাঁটাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আটকে যায়।

কি, বুঝতে পারছিস কিছু? চাক্ষুস না দেখলে ঠিক মতো বোঝা শক্ত। যাই হোক, ওই দণ্ডের সঙ্গে শক্ত মোটা দড়ি বা কাছি বাঁধা থাকে। লম্বায় তা দু-মাইলেরও উপর হয়। তিমির গায়ে হারপুন বিঁধে গেলে, এই লম্বা কাছির সাহায্যে তাকে খেলিয়ে ওপরে তোলা

হয়—ঠিক যেমন মাছ খেলানো হয়। ছিপে যেমন হুইল থাকে, এক্ষেত্রেও তেমনি থাকে কপিকল বা হুইলজাতীয় একটা যন্ত্র। ইংরেজিতে বলে 'উইন্‌শ্‌'। এই 'উইন্‌শ্‌'-এর সাহায্যে দরকার মতো দড়ি গুটানো বা ছাড়া হয়।

কামান দিয়ে হারপুনটা এত জোরে ছোঁড়া হয় যে, তিমির শরীরের মধ্যে ঢুকে বোমা ফাটতেই হারপুনের লোহার টুকরোগুলো চারদিকে সজোরে ছিটকে যায়। অনেক সময় তিমি সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ে।

ঘুরে ফিরে কামানটা দেখছি, এমন সময় প্রায় কুড়ি মিনিট পরে আবার একটা ফোয়ারা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। তিমিটা অদৃশ্য হয়েছে। অন্য তিমিগুলোর পাত্তা নেই।

ক্যাপ্টেন বললেন,—ওটা দল থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ইঞ্জিন-সিগন্যাল বেজে উঠলো। পুরোদমে জাহাজ ছুটছে। মিনিট বারো পরে প্রায় সিকি মাইল দূরে আবার রূপোলি মেঘের ফোয়ারা উঠলো আকাশে। জাহাজ ছুটছে সেই দিকে। কাছাকাছি পৌঁছনোর আগেই কিন্তু দানবটা আবার ধনুকের মতো পিঠ বেঁকিয়ে বৃত্তাকারে ডুব দিল। লেজটা খাড়াভাবে শূন্যে দোলালো কয়েকবার। তারপর ব্যস—অদৃশ্য।

এমনিভাবে চললো প্রায় আড়াই ঘণ্টা। কখনো সে দূরে সরে যাচ্ছে, কখনও জলের তলায় অদৃশ্য হচ্ছে। কখনও বা কাছাকাছি এসে জাহাজের সমান্তরালভাবে চলেছে আমাদের সঙ্গে। ফুট ছয়েক জলের নিচে দেখা যাচ্ছে তার ভয়াল ছায়ামূর্তি—মনে হয় যেন সুদূর অতীত যুগের দৈত্যাকার কোনও আদিম প্রাণীর আবছা ছায়াছবি।

ওর কাণ্ড দেখে সন্দেহ হয়, ও বুঝি খেলা করছে আমাদের সঙ্গে। যতবারই কাছাকাছি যাই, ও ডুব দেয়, লেজটা শুধু আকাশে তুলে বার কয়েক আন্দোলিত করে—যেন আমাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে। তারপর তাও অদৃশ্য হয়।

আবার জোর বাতাস বইতে শুরু করেছে। সঙ্গে-সঙ্গে সমুদ্র উন্মাদ। শুধু ঢেউ আর ঢেউ। পাহাড় প্রমাণ ঢেউয়ে জাহাজখানা আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। পা ঠিক রাখতে পারছি নে।

ক্যাপ্টেন হারপুন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ঠিক পেছনে দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছি আমি ও রবার্ট।

ক্যাপ্টেন বললেন,—আর কিছুক্ষণ এভাবে চললে, এবারকার মতো আশা ত্যাগ করতে হবে।

মনটা দমে গেল। ব্যর্থ হবে এ অভিযান?

কিন্তু নাঃ! মিনিট সতেরো পরে আবার দেখা গেল তিমিটাকে। জলের হাত দুয়েক নিচে সুবিশাল এক দানব মাছের মতো অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে সাঁতার কেটে চলেছে। মাঝে মাঝে সে ডুব দিচ্ছে, কিন্তু তা কয়েক সেকেন্ডের জন্যে, বেশি নিচে নামছে না।

জাহাজের গতি প্রায় স্তব্ধ। ইঞ্জিনে শব্দ নেই বললেই হয়। ধীরে অতি ধীরে জাহাজ এগিয়ে যাচ্ছে তিমিটার দিকে।

আবার সে অদৃশ্য হলো। ক্যাপ্টেন ডেভিড চিৎকার করে বললেন,—মিনিট খানেকের মধ্যেই আবার ও উঠে আসবে। তৈরি থাক।

দু-পা ফাঁক করে ক্যাপ্টেন কামানের উপর ঝুঁকে পড়েছেন। উত্তেজনায় আমার হাত কাঁপছে। চোখে দূরবীন ঠিক রাখতে পারছি নে। জাহাজ এত দুলছে যে দাঁড়াতেও পারছি নে। জলের ঝাপটা এসে নাকে-কানে-মুখে লাগছে ভীষণ জোরে।

হঠাৎ ক্যাপ্টেনের হাতের পেশী শক্ত হয়ে উঠলো। পলকের জন্য জলের নিচে দেখলাম, দৈত্যাকার এক ছায়ামূর্তি উপরে উঠছে। পরক্ষণে জলের তলায় যেন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটলো। জল তোলপাড় করে বিকটাকার এক দৈত্য লাফিয়ে উঠলো আকাশে। জলের ঝাপটায় সব ঝাপসা। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেনের প্রচণ্ড কামান-গর্জন। কানে তালা লাগার অবস্থা। প্রায় কুড়ি ফুট দূরে গিয়ে তিমিটা জলে আছাড় খেয়ে পড়লো।

সর্বনাশ! —রবার্ট বললে ঃ দানবটা যদি কুড়ি ফুট ওদিকে না পড়ে এদিকে পড়তো, তাহলে আর রক্ষে ছিল না। আশি-নব্বুই টন ওজনের ওই দানবের ঘায়ে জাহাজ সঙ্গে-সঙ্গে চুরমার হতো, সেই সঙ্গে আমরাও। কেউ প্রাণে বাঁচলেও শেষ রক্ষে হতো না। হাঙরের পাল টেনে ছিঁড়ে খেত।

আমার মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠলো। একবার ভেবে দ্যাখ, আশি-নব্বুই টন! অর্থাৎ প্রায় তেইশ শো মণ!

কামানের ধোঁয়ায় সব আচ্ছন্ন। ধোঁয়া সরে যেতে দেখা গেল, তিমিটা অদূরে কাৎ হয়ে জলের উপর ভাসছে—অসাড় নিস্পন্দ।

কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো,—সাবাড় হয়ে গেছে!

বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছি ঃ রূপকথা-জগতের এক প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় ভয়ংকর দানব যেন, আকারে ও শক্তিতে যে দুনিয়ায় সবার উপরে! তবু কয়েক মিনিট আগেও যে মহাশক্তিধরের সাবলীল স্বচ্ছন্দ চলা ফেরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেছি, এমনিভাবে সে হঠাৎ শেষ হয়ে গেল—এত অল্পে? মনের কোথায় যে ব্যথার সুর বাজছে।

আস্তে আস্তে সে তলিয়ে গেল। কাছিটা টানটান হয়ে আছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে সব কিছুই যেন স্থির নিস্পন্দ নির্বাক। শেষে ক্যাপ্টেন ডেভিডের কণ্ঠ কানে এল।

—হারপুনটা বোধহয় মোক্ষম জায়গায় হার্টে গিয়ে বিঁধেছে। তাই কিছু বোঝার আগেই ও সাবাড়! —ক্যাপ্টেনের চোখে মুখে সাফল্যের ক্ষণিক হাসির ঝিলিক।

মিনিট দুয়েক পরে ডেভিড তিমিটাকে টেনে তোলার হুকুম দিলেন। 'উইন্‌শ্‌' চালিয়ে দেওয়া হলো। টানটান কাছি একটু-একটু করে উপরে উঠে আসছে।

কিন্তু একি! কাছিটা হঠাৎ ঢিলে হয়ে গেল কেন? পরক্ষণে আবার সেই টানটান। তারপরেই দেখা গেল, হড়হড় করে কাছি উপরে উঠে আসছে।

ক্যাপ্টেনের চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট।

তিমিটা মরে নি!

মিনিট দুয়েক পরে প্রায় দেড়শো গজ দূরে ভেসে উঠে সে নিঃশ্বাস ছাড়লো।

তখনকার আমার মনের অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না। ও এত সহজে মরে নি জেনে কেমন যেন আরাম বোধ করছি। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছি ওর দিকে। সমুদ্র ইতিমধ্যে শান্ত হয়েছে।

তারপরেই ঘটলো সেই নিদারুণ অঘটন।

তিমিটা হঠাৎ ফিরলো, ধাওয়া করলো জাহাজের দিকে—প্রথমে মন্থর গতিতে। কিন্তু সেকেন্ডে-সেকেন্ডে তার বেগ বাড়ছে।

ডেভিড লাফিয়ে উঠলেন, চিৎকার ছাড়লেন,—সর্বনাশ! পিছু হটো! পিছু হটো! জোরে-জোরে—আরও জোরে! পুরো বেগ দাও জাহাজে!

বেগে ছুটে আসছে আহত জানোয়ার। সাদা ফেনায় দেহ প্রায় ঢাকা। হিংস্র আক্রোশে বিরাট লেজের মুহুর্মুহু ঝাপটা মারছে ভয়ংকর জোরে। প্রায় এসে গেছে!

ডেভিড যেন পাগল হয়ে গেছেন। লাফাচ্ছেন আর গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছেন,—শিগগির! শিগগির! এসে গেছে! জাহাজ ডুবিয়ে দেবে! জাহাজ জানোয়ারটার সঙ্গে সমান্তরাল করো। যেন সোজাসুজি জাহাজে ঢুঁ মারতে না পারে। এসে গেছে! এসে গেছে! হা ভগবান!

পরক্ষণে অতিকায় আহত দানব সর্বশক্তি দিয়ে মাথার ঘা মারলো জাহাজে। মহা ভাগ্যি আমাদের, আঘাতটা সামনাসামনি বা সোজাসুজি লাগলো না—লাগলো তেরছাভাবে। থরথর করে ভীষণ কেঁপে উঠলো জাহাজ, হটে গেল খানিকটা। সে ঘা মেরেছে জাহাজের প্রপেলারে। প্রপেলারের ব্লেড ঘুরছে তীব্র বেগে। ব্লেডে লেগে তার মুখ থেকে বড়-বড় কয়েক খণ্ড চর্বি কেটে বেরিয়ে গেল। সে হটে গেল। খুব বরাত জোর বলতে হবে, প্রপেলারের কোনও ক্ষতি হয়নি, ব্লেডও ভাঙে নি।

ডেভিড তখনও সমানে চেঁচাচ্ছেন আর লাফাচ্ছেন।

তিমিটা জাহাজের সমান্তরালভাগে সাঁতার কেটে আসছে। গোটা মাথাটা তার জলের ওপর। উঃ কী বিরাট মাথা। কী বিরাট মুখের হাঁ!

জানোয়ারটার গতি ধীরে-ধীরে মন্থর হয়ে এল, সেই সঙ্গে একটু-একটু করে শান্ত হলেন ডেভিড সাহেবও। কয়েক মুহূর্ত পরে উভয় পক্ষই ঠাণ্ডা। তিমির গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। ডানা দুটো সোজা করে সে কাৎ হয়ে গেল। তার 'মরণ খেঁচুনি'র ইতি এখানেই। আস্তে আস্তে ডুবে গেল সে।

জোরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। সর্বাঙ্গ দিয়ে দরদর করে ঘাম ছুটছে। সবারই এক অবস্থা। কি বাঁচাই না আমরা বেঁচে গেছি অতি অল্পের জন্যে!

পরে দেখেছিলাম, তিমিটা ওজনে তেইশশো মণের ওপর আর লম্বায় প্রায় পঞ্চাশ হাত। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ ওজনে সাধারণত কত হয়? —দেড় মণ পৌনে-দু'মণ। আর লম্বায়? সাড়ে তিন হাত-চার হাত। ব্যাপারটা তাহলে একটু কল্পনা করে দ্যাখ। এত বড় মহাকায় জানোয়ার যদি সজোরে এসে মাথা দিয়ে জাহাজে সোজাসুজি ঘা দিতে পারতো, তাহলে জাহাজের পাশ ভেঙে নির্ঘাত প্রকাণ্ড গর্তের সৃষ্টি হতো। জাহাজ ডুবে যেত কয়েক মুহূর্তেই। তারপর? —সোজাসুজি হাঙরকুলের পেটে।

উত্তেজনার পর অবসাদ। ক্লান্ত লাগছে নিজেকে। দুঃস্বপ্নের এই আতঙ্ক—এতখানি আমি কল্পনা করতে পারি নি।

তিমিটা এবার সত্যিই মারা গেছে নিঃসন্দেহ হয়ে তাকে ওপরে তোলার কাজ হলো। উইনশে কাছি জড়ানো হচ্ছে। একটু একটু করে তিমিটা উঠে আসছে। আমি রেলিংয়ে ঝুঁকে পড়লাম। ধীরে-ধীরে তার ছায়ামূর্তি স্পষ্ট হলো। প্রাগৈতিহাসিক যুগের দানবাকার এক মহাআতঙ্ক যেন সমুদ্রের তলা থেকে উঠে আসছে। সমস্ত দেহটা উঠে এল জলের ওপর। ওজনের ভারে জাহাজ কাৎ হয়ে পড়েছে।

রবারের লম্বা মোটা একটা হৌজ্ পাইপ আনা হলো। তার একদিকে বাতাস ভর্তি করার পাম্প লাগানো, ফুটবলে বা মোটরের টিউবে বাতাস ভরার জন্যে যে পাম্প আমরা দেখে থাকি তেমনি, তবে আকারে অনেক বড়। অন্য দিকে ইস্পাতের টিউব লাগানো, তার মাথাটা তীক্ষ্ণ ছুঁচলো। তিমির পেটে টিউবটা সেঁধিয়ে দিয়ে পাম্প চালু করা হলো।

তিমির ভেতরটা বাতাসে ভর্তি হচ্ছে, তার দেহ ভাসছে জলের ওপর। বাতাস পাম্প করা শেষ হতেই টিউবটা বের করে গর্তটা দড়ির ফেঁসো দিয়ে ভালো করে বন্ধ করে দেওয়া হলো। মোটা শেকল দিয়ে মাল্লারা জাহাজের গায়ে বেঁধে ফেললে তিমিটাকে।

ছবির মতো কাজ চলছে। আমি ভাবছি অন্য কথা। ভাবছি নিজের দেশ ভারতের কথা।

তিমির ব্যবসা খুবই লাভজনক ব্যবসা। ইউরোপ ও আমেরিকার দেশে-দেশে, জাপানে ও অন্যান্য দেশে এ ব্যবসায়ে লক্ষ-লক্ষ লোক খাটছে। অদের তিমি শিকারের বড় বড় জাহাজ পৃথিবীর সব সমুদ্র চষে বেড়াচ্ছে। সব সমুদ্রেই তিমি আছে। আছে ভারত মহাসাগরেও। কিন্তু তিমি ধরার কথা আমরা কি স্বপ্নেও কখনো চিন্তা করেছি? দূর থেকে যখন ভাবি, কখনই মনে হয় না আমরা স্বাধীন জাত। স্বাধীনতার অন্যতম বড় লক্ষণ, দেশের সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গীণ আর্থিক উন্নতি। কিন্তু কোথায় তা? বড় দুঃখ হয়। কত স্বপ্ন কত সাধ! —সব ব্যর্থ হয়ে গেল!

থাক ওসব কথা। তিমির কথায় আসি। তিমি আছে বহু রকমের—ছোটবড় নানা জাতের নানা আকারের। তাদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যও বিভিন্ন। কিন্তু অতো খুঁটিনাটির মধ্যে গেলে হয়তো তোর ধৈর্যের ওপর অবিচার করা হবে। তিমিকে মোটামুটি বড় দুটো ভাগে ভাগ করা যায় ঃ দাঁতওয়ালা তিমি আর দাঁতহীন তিমি।

দাঁতওয়ালা তিমিরা খায় ছোটবড় মাছ, স্কুইড প্রভৃতি সামুদ্রিক জীব।

তিমির রাজ্যে দন্তহীনেরাই সবচেয়ে বিচিত্র জীব। এদের মুখে দাঁত নেই বটে, কিন্তু তার বদলে আছে অন্য একটা বস্তু, আর সেইটাই সবচেয়ে বিচিত্র।

বিজ্ঞানীরা বলেন, এককালে এদেরও দাঁত ছিল। কিন্তু যে কারণেই হোক এরা খাওয়ার অভ্যাস পালটাতে থাকে, শুরু করে ছোট-ছোট জিনিস খেতে। তাদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য হয় খোলসওয়ালা একরকম প্রাণী—আকারে তারা অতি ছোট। প্রায় সব সমুদ্রেরই বিশেষ বিশেষ অংশে এরা অসংখ্য অগুনতি ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়ায়। বাংলা ভাষায় এদের কোনও নাম নেই, ইংরেজিতে বলে 'শ্রিম্প'। 'ক্রিল'ও বলে সময় সময়।

অতি ক্ষুদে-ক্ষুদে শ্রিম্প খেতে দাঁতের দরকার হয় না, দরকার হয় অন্য কিছুর। প্রকৃতির নিয়মে তাই ধীরে-ধীরে এদের দাঁত লোপ পেল, তার বদলে সেখানে জন্মালো যে জিনিস, বাংলায় তারও কোন প্রতিশব্দ নেই। ওপরের চোয়াল বা মাড়ি থেকে মোটা মোটা আঁশ নেমে এল নিচের দিকে ঝালরের মতো—নারকেলের ছোবড়া দিয়ে তৈরি পুরু মোটা আস্তরণের মতো। বাংলায় কি বলবি একে? ঝালর? ঝাঁঝরি? ইংরেজিতে বলে ব্যালিন বা ওয়েইল বোনে (Baleen বা Whale bone)। খুব নমনীয় এগুলো। তিমি এক-এক গ্রাসে লক্ষ-লক্ষ শ্রিম্প জল সমেত মুখের মধ্যে পোরে। খুব পুরু মোটা আর প্রকাণ্ড ওদের জিভ। সেই জিভ দিয়ে সে উপরের টাকরায় চাপ দিলেই জল বেরিয়ে যায়। মুখের মধ্যে থাকে শুধু শ্রিম্পের গাদা। এই জল ছাঁকা কাজের জন্যেই দাঁতের বদলে ওই ব্যালিনের দরকার।

এই ব্যালিন খুব দামে বিক্রি হয়।

তিমি যখন স্থল থেকে জলে নামলো, তখন তার শরীর গরম রাখার ব্যবস্থা চাই। সে ডাঙার স্তন্যপায়ী জীব, মাছের মতো সুবিধে নেই। জলের মধ্যে গায়ের লোমও বিশেষ কাজে আসে না। প্রকৃতি তাই ধীরে-ধীরে লোমের পোশাক খুলে নিয়ে তার গায়ে চর্বির

খুব পুরু মোটা এক কম্বল লাগিয়ে দিলে। চামড়া ও মাংসের মাঝখানেই এই চর্বির কম্বল। কোন-কোন তিমির—বিশেষ করে যেসব তিমি ঠাণ্ডা জলে থাকে, তাদের গায়ের এই কম্বলটা অত্যধিক মোটা।

এই চর্বি থেকে যে তেল পাওয়া যায়, তার দামও অত্যধিক। হাড় ও মাংস থেকে জমির সার তৈরি হয়। জাপানীরা আবার তিমির মাংস খায়। সুতরাং মাংসটাকে তারা ওভাবে অপচয় করে না।

তাদেরও দাঁত নেই, আছে ব্যালিন। শুধু তিমির জগতে কেন, জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে এরকম মহাকায় জানোয়ার কোনওদিন জন্মায় নি—না এখন, না অতীতে। কোটি-কোটি বছর আগে যেসব অতিকায় ডাইনোসর দুনিয়ার বুকে বিচরণ করতো, তাদের সবচেয়ে বড়টাও লম্বায় ও ওজনে নীল তিমির সমকক্ষ নয়।

তিমির জগতে নীল তিমিই আকারে সবচেয়ে বড় হয়।

এ পর্যন্ত একশো এগারো ফুট লম্বা নীল তিমি ধরা পড়েছে। একশো এগারো ফুট মানে? —চুয়াত্তর হাত। হয়তো তার চেয়েও বড় আছে।

উননব্বুই ফুট লম্বা এক নীল তিমির কথা জানি। এক জাপানি ব্যবসায়ী কোম্পানি ধরেছিল। তার শরীরের মোটা অংশটার পরিধি ছিল তেতাল্লিশ ফুট ছয় ইঞ্চি। লেজের এ-কোণা থেকে ও-কোণা পর্যন্ত কুড়ি ফুট। প্রত্যেকটি ডানা প্রায় দশ ফুট। নিচের চোয়ালটাই ছিল বাইশ ফুট দশ ইঞ্চি।

তিমিটার পুরো ওজন দাঁড়িয়েছিল তিন লক্ষ সাত শো পাউন্ড—একশো পঞ্চাশ টনের অর্থাৎ চার হাজার মণের কাছাকাছি! ব্যাপারটা বোঝ। জিভটাই ওজনে ছিল ছ হাজার পাউন্ড, লিভার বা যকৃত দু-হাজার পাউন্ড আর হার্ট নশো পাউন্ড।

জাপানিরা তিমির মাংস খায়। এই এক তিমি থেকেই জাপানি কোম্পানি পেয়েছিল সাতাশ হাজার নশো ডলার—তেল থেকে ন হাজার ন শো ডলার আর মাংস থেকে আঠারো হাজার ডলার!

গল্পে পড়েছি তিমির মানুষ গেলার কাহিনী। তুইও পড়েছিস হয়তো। ওসব নিছক গল্প—আজগুবি বানানো মনগড়া। তিমি মানুষ খেতে পারে না দুটো কারণে—এক, মানুষ তার খাদ্যই নয়; দুই, তার কণ্ঠনালী এত সরু যে মানুষ গেলা বা খাওয়ার কথা সে ভাবতেও পারে না।

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নানা কথা ভাবছি আমি। তিমিটাকে জাহাজের সঙ্গে বেঁধে রেখে মাল্লারা কখন চলে গেছে খেয়াল করি নি, অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ তিমিটার দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলাম।

কি ওটা!

জলের মধ্যে একটা ছায়ামূর্তি যেন সট করে জাহাজের তলায় সরে গেল।

চোখের ভুল? —কিন্তু না, ওই আবার, ওই আর একটা! কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখি, তিমিটার আশে পাশে সব দিকেই ওই ছায়ামূর্তি—নিঃশব্দে তীরবেগে ছুটোছুটি করছে। তাদের পেটের নিচের সাদা অংশ ঝিলিক দিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে।

তারস্বরে হাঁক ছাড়লাম রবার্ট ও ডেভিড সাহেবের উদ্দেশ্যে।

দৈত্য-হাঙরের পাল—সমুদ্রের নেকড়ে ওরা। রক্তের গন্ধ পেয়ে ছুটে এসেছে, শকুনের

মতো ঘিরে ধরেছে তিমিটাকে। এক এক কামড়ে তিমির গা থেকে চর্বি ও মাংসের বড় বড় খাবলা তুলে নিয়েই গিলে ফেলছে। গিলছে গোগ্রাসে।

ডেভিড যেন ক্ষেপে গেলেন। —শেষ করবে। ওরাই খেয়ে শেষ করবে তিমিটাকে। হাড়গোড় ছাড়া কিছু রাখবে না। —আবার শুরু হয় তাঁর চ্যাঁচানি আর লাফানি।

বল্লম দিয়ে রবার্ট ঘা মারলে একটাকে। সট্ করে সরে গেল সেটা। যাবার আগে ওপর দিকে মুখ তুললো একবার। সুতীক্ষ্ণ ভয়াল দু-পাটি দাঁত ঝকমক করে উঠলো ক্ষণেকের জন্যে। হিংস্র নিষ্ঠুর আক্রোশে যেন দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো। আমি শিউরে উঠলাম।

মাল্লারা হাত-হারপুন ছুঁড়ছে। ডেভিডের হারপুন একটার পিঠে গিয়ে বিঁধলো। তবু কি নিরস্ত হয় হিংস্র জানোয়ার? হারপুন নিয়েই সে ছুটে গিয়ে এক দলা মাংস খাবলে নিয়ে গিলে ফেললে।

জাহাজের ডেকে তোলা হলো হাঙরটাকে,—চোদ্দ ফুট লম্বা! আমার প্রায় আড়াই গুণ! আকারে এটা কিন্তু মাঝারি, এর চেয়ে বড় আছে।

হারপুনের কাজ চলে আস্তে। হারপুন দিয়ে ওদের হটানো যাবে না। ডেভিড ও আমি রাইফেল তুলে নিলাম। ওদের মাথায় মারতে হবে। ডেভিড মারলেন ঊনিশটা, আমি দশ। ওরা হটে গেল।

ক্যাপ্টেনের নির্দেশে জাহাজ তখন পূর্ণবেগে ছুটে চলেছে বন্দরের দিকে। পেছনে তাকিয়ে দেখি, জ্যান্ত হাঙরের পাল মরা জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে টেনে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহে রবার্ট ও ক্যাপ্টেন ডেভিডের সঙ্গে ধীরে-ধীরে নিচে নেমে গেলাম চা খেতে।

কিংমিক ও নানুকের দেশে

॥ এক ॥

কোথায় চলেছি, কবে ফিরবো, কিছুই জানি নে। পৃথিবীর দুরতম ও দুরধিগম্য এক শেষ প্রান্তের দিকে আমাদের জাহাজ চলেছে।

শুনেছি, উত্তর মেরু বা সুমেরু বিন্দুর কাছাকাছি কোনও দ্বীপ বা উপদ্বীপ আমাদের এই অভিযানের লক্ষ্যস্থল। সে জায়গার নাম গোপন রাখা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের কড়া নির্দেশ, অভিযান থেকে ফিরে এসেও তাঁদের সম্মতি ছাড়া তা প্রকাশ করা চলবে না।

এ পর্যন্ত শুধু এইটুকুই শুনেছি যে, এর আগে বাইরের সভ্য মানুষের পদার্পণ সেখানে আর কখনও পড়েনি। ব্যস, ওই পর্যন্তই।

বইতে যা পড়েছি ও শুনেছি তাতে বুঝতে পারছি, এক চিরন্তন তুষার ও বরফের রাজ্যে চলেছি আমরা। বছরের কোনও-কোনও সময় সেখানে চলে একটানা দিন-চব্বিশ ঘণ্টাই দিন আর দিন—নিরবচ্ছিন্ন রাত্রিহীন দিন—মাসের পর মাস।

তেমনি আবার তারপরেই শুরু হয় রাত্রি। ঘনিয়ে আসে সেই ভয়াল রাত্রি—একটানা চব্বিশ ঘণ্টা সূর্যহীন শীত রাত্রির নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার। মাসের পর মাস সূর্য নেই, তাপ নেই, মৃত্যুর মতো শীতল অন্ধকার—নিস্তব্ধ নিষ্প্রাণ ভয়ংকর। আর সারা দেশ—জল—স্থল—সব কিছুই ঘষা কাচের মতো জমাট বরফে ঢাকা।

তার মাঝে প্রচণ্ড হিমঝঞ্ঝা সময় সময় গর্জন করে চলে। চলে ঝড়ের একটানা শাঁ শাঁ আওয়াজ। অন্ধকার হিমেল বরফের কারায় বন্দিনী ধরিত্রী যেন কেঁদে চলেছে মনে হয়। মাঝে-মাঝে কানে আসে ক্ষুধার্ত নেকড়েদের রক্তজলকরা একটানা সুরেলা গর্জন। আর সেই ঝড়, তুষারপাত, নেকড়ের গর্জন ও অন্ধকারের মাঝে শিকারের খোঁজে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘোরে বরফ-রাজ্যের নির্মম ভয়ংকর পশুরাজ—হিংস্র শ্বেতভল্লুক। মৃত্যু সে দেশে পায়ে পায়ে ঘোরে, যেন সর্বত্র ওৎ পেতে আছে।

সুতরাং এই পুঁথিগত বিদ্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থাটা কল্পনা করে মনে-মনে বেশ উত্তেজনা বোধ করছি।

বাংলা ভাষায় দুটি শব্দ ঃ 'মরু আর মেরু'। একটা মাত্র স্বরবর্ণ 'ে'-কারের পার্থক্য শুধু, অথচ বাস্তবে কী বিরাট তফাত।

মেরুতে শুধু বালি আর বালি, জল নেই কোথাও। আদিগন্ত শুধু শুষ্ক রুক্ষ, আগুনের মতো উত্তপ্ত স্তব্ধ নিঃসীম বালির সমুদ্র। কিন্তু মেরুতে যত দূর দৃষ্টি চলে চোখে পড়বে শুধু তুষার আর বরফ—দিগন্তহীন শুভ্র বরফের গোলকধাঁধা আর হিমেল ঠাণ্ডা জলের সমুদ্র।

একের প্রকৃতি ও পরিবেশ অপরটির ঠিক বিপরীত। কিন্তু দু-জায়গাতেই তা নির্মম নিষ্ঠুর—জীবনের অনুকূল নয় মোটেই। তবু সেখানেও দেখেছি জীবনের বিচিত্র ছন্দ ও গান। একদিকে দেখেছি জীবনের হিংস্র নির্মমতা, অন্যদিকে তার স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা—তার হাসি-কান্না ও আনন্দ-বেদনার মহাসংগীত।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সর্বোত্তরে কানাডা সুবিশাল দেশ। কানাডারও বহু উত্তরে সুমেরু বা উত্তর মেরু—পৃথিবীর শেষ উত্তর বিন্দু। এই দুরধিগম্য উত্তর মেরু আবিষ্কারের নেশা, তাকে জয় করার দুর্জয় বাসনা মানুষকে যুগে-যুগে চঞ্চল ও অস্থির করে তুলেছে। তুষার ও বরফের ভয়াল মহাপ্রান্তের ওপর দিয়ে, হিমশীতল ঠাণ্ডা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বারবার ছুটে গেছে সে। ভয়ংকর হিমঝঞ্ঝা, চরম দুঃখ-কষ্ট-অনাহার তার পথরোধ করেছে, মৃত্যু

ঝাঁপিয়ে পড়েছে বারেবার। কিন্তু তবু অজানাকে জানার যে দুরন্ত বাসনা মানুষের চিরকালের, তাকে দমাতে পারে নি। তাই শেষ পর্যন্ত সুমেরুকে হার মানতে হয়, নান্‌সেন জয় করেন তাকে।

এই সুমেরু বা উত্তর মেরু বিন্দুকে কেন্দ্র করে লক্ষ-লক্ষ মাইল ব্যাপী সুমেরু এলাকা। কানাডার উত্তর অংশের বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই সুমেরু ঢুকে গেছে বহুদূর পর্যন্ত।

সেখানে দূরতম কোনও এক দ্বীপ বা উপদ্বীপ লক্ষ্য করে চলেছে আমাদের এই অভিযান।

পৃথিবীর একেবারে শেষ উত্তর সীমায়, তার মাথায় বা ছাদেও বলতে পারো, দুর্গম দুর্জ্ঞেয় এই সুবিস্তীর্ণ দেশ সুমেরু অঞ্চল। সেখানে কোনওদিন যেতে পারবো, বা আরো প্রাঞ্জল করে বলা যায়, সেখানে যাবার সৌভাগ্য আমার কোনওদিন ঘটবে ভাবতে পারি নি। তাই সেই সুযোগের সম্ভাবনা দেখা দিতেই আমি সামনের সারিতে গিয়ে উপস্থিত।

খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার এই সুমেরু এলাকা। এখনও তার সব কিছুই প্রায় অজানা, অনুদ্‌ঘটিত। কয়লা, পেট্রোলিয়াম, টাংস্টেন, বিসমাথ, অ্যান্টিমনি, কোবাল্ট, টিন, জিপসাম, সিসে নিকেল, তামা, সোনা, রূপো—কত আর বলবো—সব কিছুর আকর এই এলাকা। তা ছাড়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে খনিজ এখানে পাওয়া গেছে, তা হলো রেডিয়াম ও ইউরেনিয়াম। আজকের এই পারমাণবিক শক্তির যুগে এই দুটি খনিজের প্রয়োজনীয়তা বোধহয় বুঝিয়ে বলার দরকার করে না।

এ তো গেল খনিজের কথা। এ ছাড়া এখানকার এই বরফগলা সুমদ্রে পাওয়া যায় নানা জাতের অপরিমিত মাছ, তিমি, সীল আর ওয়ালরাস বা সিন্ধুঘোটক। আর পাওয়া যায় ডাঙার পশুদের শ্বেতশুভ্র লোমশ চামড়া। দুনিয়ার বাজারে তার দাম অনেক। এ ছাড়াও মেলে আরও অনেক কিছু। তার তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই।

যতদূর মনে হয়, এইসব খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের খোঁজেই পাঠানো হয়েছে এই অভিযান। কানাডা সরকার এ অভিযানের অন্যতম অংশীদার।

মে মাসের প্রথমে আমাদের জাহাজ ছেড়েছে। তার আগে এসব সুমেরু অঞ্চল দুরধিগম্য থাকে—ঢোকে কার সাধ্যি! শীতের জমাট বরফে জল-স্থল সব একাকার। বসন্তের মাঝামাঝি থেকে ঠিকমতো বরফ গলতে শুরু করে। তখন থেকে স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত, এই সময়টুকুই শুধু সুগম থাকে এই অঞ্চল, খোলা থাকে বাইরের দুনিয়ার কাছে।

বাংকে শুয়ে দু-দিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি।

কানাডার উত্তরে পর্বতময় অঞ্চল আর বিরাট বিরাট গহন বনভূমি। কিন্তু আরও উত্তরে এ বনভূমি শেষ হবে একসময়। চূড়ান্ত দুঃসহ ঠাণ্ডায় সেখানে গাছপালা বাঁচে না। তাই উত্তরে একটা সীমারেখার পরে গাছপালা জন্মায় না বিশেষ। সুমেরু অঞ্চলের শুরু এখান থেকেই।

জাহাজ যত উত্তরে চলেছে, ততই দেখছি, ধীরে-ধীরে শেষ হয়ে আসছে বনভূমি, পাতলা হয়ে আসছে সুবিশাল মহীরূহ-অরণ্য, আর তার স্থান দখল করছে বেঁটেখাটো ছোট-ছোট গাছ।

বুঝতে পারলাম, মেরুবৃত্ত পার হচ্ছি আমরা, ঢুকতে যাচ্ছি সুমেরু অঞ্চলে।

উত্তর মেরু বা সুমেরু বিন্দুকে কেন্দ্র করে এই মেরুবৃত্ত—এক কল্পিত রেখা। তার

ব্যাস মোটামুটি তিন হাজার তিনশ মাইল। এই বৃত্তের ভেতরকার অঞ্চলটাই সুমেরু এলাকা। সাইবেরিয়া, উত্তর ইউরোপ, আলাস্কা, কানাডা ও গ্রীনল্যান্ডের বেশ কিছু অংশ ঢুকে গেছে এই সুমেরু অঞ্চলে।

বেঁটেখাটো ছোট গাছও শেষ হয়ে গেল এক সময়। বুঝলাম, মেরুবৃত্ত পার হলাম।

এই হলো সেই তুন্দ্রা অঞ্চল, যার কথা শুনেছি কত ভাবে। শীতে এ অঞ্চল পুরু জমাট বরফে ঢাকা থাকে। বসন্তে ও গ্রীষ্মেই শুধু এলাকার পর এলাকা জুড়ে জন্মায় একরকমের পানা বা শৈবাল, ইংরেজিতে যাকে বলে মস। আর জন্মায় নানা জাতের ঘাস ও ছোট-ছোট ফুলের গাছ।

মাঝে-মাঝে কদাচিৎ দু-চারটে বেঁটেখাটো বামনাকার উইলো গাছ নজরে পড়ছে। তুন্দ্রাকে রেড ইন্ডিয়ানরা কেন 'ছোট সরু কাঠির দেশ' বলে, আজ তা নিজের চোখে দেখে বুঝলাম।

শুয়ে-শুয়ে এইসব দেখছি আর ভাবছি। পাশের বাংকে মার্টিনের নাক ডাকছে। আমি নিজেও যে কখন মার্টিনকে অনুসরণ করেছি, তা জানি নে। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম, তারও হদিস নেই। হদিস হলো, যখন প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে প্রায় ছিটকে পড়ে গেলাম বাংক থেকে।

বিশেষ লাগে নি। লাফিয়ে উঠলাম। তাকিয়ে দেখি, মার্টিন ধরাশায়ী।

সর্বনাশ! জাহাজে বিপদের ঘণ্টা বাজছে। ঘণ্টি শুনে মার্টিনও কোঁকাতে-কোঁকাতে উঠে বসেছে। দেখতে ছুটলাম, কী ব্যাপার। পেছনে দেখি, ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে মার্টিনও আসছে।

বাইরে এসে যা শুনলাম ও দেখলাম, তা কল্পনাও করতে পারি নি। প্রকাণ্ড এক বরফ-পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে জাহাজের।

ইতিমধ্যে জাহাজ কখন বাইরের খোলা সমুদ্রে এসে পড়েছে, ঘুমিয়ে থাকায় টের পাই নি।

পরীক্ষা করে দেখা গেল, জাহাজ বিশেষ জখম হয় নি। ভয় পাবার মতো কিছু নয়। এ জন্যে ক্যাপ্টেনের সহকারি মিঃ এডোয়ার্ডের কৃতিত্বই বোধহয় সবচেয়ে বেশি। তাঁরই শেষ মুহূর্তের আপ্রাণ চেষ্টায় সবাই রক্ষা পেলাম এবারের মতো। তা ছাড়া জাহাজখানাও অবশ্য অত্যন্ত মজবুত, বরফ-এলাকায় চলার মতো করে বিশেষভাবে তৈরি।

সুমদ্রের দিকে তাকিয়ে আমার কিন্তু চক্ষুস্থির। কী ব্যাপার! ছোট-বড় অসংখ্য পাহাড় সমুদ্রে ভেসে চলেছে!

অস্বাভাবিক অবিশ্বাস্য কাণ্ড! চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন যে, পাহাড় জলে ভাসছে। অবশ্য সবই বরফের পাহাড়, আগাগোড়া বরফে তৈরি।

বুঝলাম, এগুলোকেই ইংরেজিতে বলে আইসবার্গ। বইতে পড়েছি, কিন্তু নিজের চোখে এই প্রথম আইসবার্গ দেখলাম।

জলের ওপরে যে আইসবার্গের উচ্চতা দেখছি, হাজার ফুট, তার আসল উচ্চতা কিন্তু হাজার আস্টেক ফুট। বরফ ওজনে সমুদ্র-জলের প্রায় আট ভাগের সাত ভাগ। তাই জলের ওপর যেটুকু দেখছি, জলের নিচে আছে তার প্রায় সাত গুণ।

জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছি। পাশে মার্টিন। কারও মুখে কথা নেই।

মার্টিন একসময় বললে,—কোত্থেকে যে বরফের এই বিদ্‌ঘুটে পাহাড়-পর্বতগুলো আসছে, ভেবে পাইনে। কী ব্যাপার, বলতে পারো?

একটু অবাক হলাম। মার্টিন ইয়ার্কি করছে না কি? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম তার দিকে, না, তা নয়। তার চোখে সত্যিই প্রশ্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একেবারে দক্ষিণ অঞ্চলের বাসিন্দা সে। বাইরের দুনিয়ায় লম্বা অভিযানে বেরোচ্ছে এই প্রথম।

বললাম,—গ্লাসিয়্যার কাকে বলে, জানো নিশ্চয়ই, যাকে আমরা বাংলায় বলি হিমবাহ। উঁচু মালভূমি বা পর্বতে তুষারের পর তুষার জমে তৈরি হয় এই হিমবাহ। হাজার-হাজার ফুট গভীর হয় তাদের কোনও-কোনওটা। সুবিপুল এই তুষার ও বরফের প্রচণ্ড চাপে হিমবাহের অংশবিশেষ প্রায়ই উপত্যকা বা পর্বতের ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করে—ধীরে অতি ধীরে এগিয়ে চলে জমাট-বাঁধা সুবিশাল তুষার-নদীর মতো, দৈনিক গতি হয়তো কয়েক ইঞ্চি মাত্র।

অবাক কণ্ঠে মার্টিন বললে,—তুষার নদী! ভারি তাজ্জব ব্যাপার তো! তারপর?

—তারপর এইভাবে চলতে চলতে কোনও হিমবাহ যখন সমুদ্রে এসে পৌঁছোয়, তখন বুঝতেই পারছো তার কিনারার অংশগুলো সব ভেঙে পড়ে সমুদ্রের জলে। এই সব অংশই হলো ওই সব ভয়ংকর আইসবার্গ বা বরফের পাহাড়। জলে পড়েই যাত্রা শুরু হয় তাদের।

বসন্তের প্রথম থেকেই এইসব ছোট-বড় বরফ-পাহাড়ের রাজকীয় শোভাযাত্রা শুরু হয় দক্ষিণ মুখো। এপ্রিল, মে ও জুন মাস নাগাদ তারা উত্তর আটলান্টিকে স্টিমার ও জাহাজ চলাচলের পথে এসে হাজির হয়। আন্তর্জাতিক আবহাওয়া জাহাজগুলোর তখন কাজ হয় এদের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখা আর চারিদিকে হুঁশিয়ারি পাঠানো। তা ছাড়া আরও...

হঠাৎ এক প্রকাণ্ড আওয়াজে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। সে যে কী ভয়ংকর আওয়াজ, তা বলে বোঝানো যাবে না! কয়েক মুহূর্তের জন্য বোধশক্তি মনে হয় লোপ পেয়েছিল। মার্টিনের অবস্থা আরও কাহিল। সময়মতো ধরে না ফেললে সে বোধহয় চিৎপাত হয়ে পড়তো।

যাই হোক পরেই বুঝলাম ব্যাপারটা। স্রোতের তীব্র টানে আইসবার্গগুলো পাক খেতে-খেতে আর ঘুরতে-ঘুরতে ছুটে চলেছে। তার একটার সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে আর একটার। দুটোই বিরাট পাহাড়। তার মধ্যে তুলনায় যেটা ছোট, সেটা চুরমার হয়ে গেছে বড়টার ঘা খেয়ে। বড়টারও ভেঙে গেছে বিরাট অংশ।

মেরু অঞ্চলে ঢোকার শুরুতেই একের পর এক যা কাণ্ড ঘটছে, তাতে ভবিষ্যৎ যেন অনেকটা আঁচ করতে পারছি।

মে মাসের প্রথমে ২রা মে আমরা জাহাজে চড়েছি। প্রায় মাসখানেক হতে চললো। খুব সাবধানে জাহাজ চলেছে।

কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, ততই এ কী চেহারা দেখছি মেরু সমুদ্রের! ভীষণ থেকে ভীষণতর হয়ে উঠছে তার চেহারা। যেদিকে তাকাও, শুধু বরফ আর বরফ। বরফের বিরাট বিরাট চাংড়া ঢিবি পাহাড় সর্বত্র—বাতাস ও স্রোতের বেগে সর্বদা ঘুরছে, ছুটছে, পাক খাচ্ছে, পরস্পরে ধাক্কা লেগে বজ্রনির্ঘোষে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

নির্বাক বিস্ময়ে আমি দেখছি প্রকৃতির বিস্ময়কর খেয়ালের রাজ্য এই সুমেরু সাগরকে। ফাঁক পেলেই রেলিংয়ের ধারে এসে দাঁড়াই।

আগেই বলেছি, উত্তর মেরুকে পৃথিবীর ছাদ বলা যায়। এই ছাদের পঞ্চাশ লক্ষ বর্গমাইলেরও বেশি এলাকা জুড়ে সমুদ্র—বরফ আর জল আর বরফ। কোথাও বরফের ঢিবি বা পাহাড়, কোথাও বরফের চাংড়া, কোথাও বা জল শুধু। পুরনো বরফের নিচে সব সময় নতুন বরফ তৈরি হচ্ছে, জমাট বাঁধছে, ফেঁপে ফুলে ঠেলে উঠছে ওপরের দিকে, কড়কড় শব্দে উপরের বরফ ফেটে চৌচির হয়ে। আর তার ফলে বরফের বিরাট সব স্তূপ ও চাংড়া ভেসে চলেছে সর্বত্র।

অফুরন্ত এই বরফের গাদা স্থির নেই কোনওসময়। সারা বছর ধরে অবিরাম চলছে আর ঘুরছে আর ছুটছে আর সময়-সময় পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। চারদিকেই তার ভয়ংকর আওয়াজ। সমুদ্রকে ওরা যেন অবিরাম পিষছে আর মন্থন করছে।

এ এক অদ্ভুত ভয়ংকর গোলকধাঁধা—প্রকৃতির বিচিত্র ভাঙাগড়ার খেলা!

বরফ-রাজ্যের এই গোলকধাঁধার ভিতর দিয়ে অতি সন্তর্পণে জাহাজ এগোচ্ছে। একটু বেসামাল হলেই আর রক্ষা নেই।

এই সঙ্গে নতুন আর একটা অভিজ্ঞতাও লাভ হচ্ছে আমাদের। যতই এগোচ্ছি উত্তর দিকে, ততই দিনের দৈর্ঘ বাড়ছে। যে অনুপাতে দিন লম্বা হচ্ছে, সেই অনুপাতে ছোট হয়ে আসছে রাত্রি। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সূর্য আকাশে ঘুরছে বেশিরভাগ সময়। মাত্র ঘন্টা কয়েকের জন্যে তার বিশ্রাম। আমরাও তাই ঘুম পেলে ঘুমোই, খিদে পেলে খাই।

ভারি অদ্ভুত ব্যাপার।

মেরু বৃত্তের মধ্যে বছরে অন্তত একটা দিন থাকবেই, যেদিন সূর্য দিগন্তে অস্ত যায় না। চব্বিশ ঘন্টাই তখন রাত্রিহীন দিন। তেমনি তার ঠিক ছ-মাস পরে আসবে আর একটা দিন যেদিন সূর্য দিগন্তের উপরে উঠবেই না—চব্বিশ ঘন্টাই তখন সূর্যহীন রাত্রি। উত্তর মেরু বা সুমেরুর দিকে যত এগিয়ে যাওয়া যাবে, ততই বাড়তে থাকবে একটানা রাত্রিহীন দিনের সংখ্যা। গ্রীষ্মকালে জুন মাসে সুমেরু পুরোপুরি হেলে যায় সূর্যের দিকে। সুমেরু অঞ্চলে তাই সূর্য এসময়ে দিগন্তের উপরে থাকে সব সময়ে, চব্বিশ ঘন্টাই ঘুরতে থাকে আকাশে। মাঝ রাতেও তাই রোদ বা সূর্যের কিরণ। তেমনি আবার শীতকালে ডিসেম্বর মাসে সুমেরু পুরোপুরি সরে যায় সূর্য থেকে। সুমেরু অঞ্চলে তাই এসময়ে সূর্যের দেখা মেলে না কোনওসময়েই, চব্বিশ ঘন্টাই চলে সূর্যহীন অন্ধকার রাত্রি।

দূরবীন দিয়ে দেখছি। বহু-বহু দূরে ছোট-বড় অনেক দ্বীপ ও উপদ্বীপ নজরে পড়ছে। আর ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ছে অসংখ্য পাখি।

॥ দুই ॥

মে মাস শেষ। জাহাজও শেষপর্যন্ত নিরাপদে কূলে এসে নোঙর করলো। মাস খানেক পরে তীরে পা দিতেই কী যে আনন্দ হলো, তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না। মাটির এই পৃথিবী আমাদের কত প্রিয়, কত আপন, তা বোঝা যায় এই সময়।

সুবিধামতো জায়গা দেখে কূলে জাহাজের কাছেই তাঁবু খাটানোর ব্যবস্থা হলো। এখনও বরফ জমে আছে সর্বত্র। অবশ্য গলতে শুরু করেছে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

এ কী অপূর্ব রূপ সুমেরু রাজ্যের! যেদিকে তাকাই, শুধু ফুল আর পাখি, পাখি আর ফুল।

রঙ-বেরঙের কত জাতের অসংখ্য ফুল আর কত জাতের অসংখ্য পাখি!—চোখ ফেরানো যায় না। বিচিত্র গান, বিচিত্র ধ্বনি আর রঙের সমারোহে মেরু অঞ্চল যেন প্রাণের আবেগে উপচে পড়ছে। সুদীর্ঘ শীত রাত্রির মৃত্যু-শীতল ঠাণ্ডা আর নিস্তব্ধতার পরে বসন্ত ও গ্রীষ্মে প্রকৃতি যেন জেগে উঠেছে তার রূপ রস বর্ণ গন্ধ ও শব্দের অফুরন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে।

লম্বা ঘাস আর ফুলের গাছে ছেয়ে গেছে সর্বত্র। চারিদিকে শুধু রঙ আর গান। অদূরে ছোট-বড় কতকগুলো পাহাড়। সেখানে পাখির মেলা। হাজারে হাজারে তারা উড়ছে, বসছে, ছুটছে, নানা কণ্ঠে ডাকছে, গাইছে ও চিৎকার করছে। আর এদিকে অপরূপ রঙের এক সমুদ্র বাতাসের সঙ্গে আনন্দ-হিল্লোলে খেলা করছে যেন।

তাঁবু খাটানোর জন্যে অপেক্ষাকৃত উঁচু একটা শুকনো জায়গা বেছে নেওয়া হলো।

প্রতি পদক্ষেপেই নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি।

তাঁবু খাটানোর কাজে সবাই হাত লাগিয়েছি। গাঁইতি দিয়ে মাটি খুঁড়ছি। প্যাচপেচে কালো মাটি। সুমেরু অঞ্চল হলেও, শীত এখন অপেক্ষাকৃত কম। বেশিরভাগ সময় সূর্য আকাশে ঘুরছে। রোদের উষ্ণ আমেজে কাজ করতে বেশ আরামই লাগছে। কিন্তু ব্যাপারটা কী? মাটি খুঁড়তেই নিচের মাটির রঙ কেমন যেন পালটে যাচ্ছে, কাদাকাদা হয়ে যাচ্ছে। মাটি কখনও ফেঁপে উঠছে, কখনও বা বসে যাচ্ছে, ফেটেও যাচ্ছে সময় সময়।

একটু বোধহয় অবাক হয়েছিলাম। অদূরে ভূ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফুলটন কাজ করছিলেন। হেসে বললেন,—ঘাবড়াও মাত, চৌধুরী। এটাই হলো এখানকার মাটির চরিত্র। গাঁইতিটা একটু আস্তে চালাও। অত তাড়াতাড়ি করো না। গর্ত ফুট তিনেকের বেশি গভীর করার দরকার নেই। অবিশ্যি দরকার থাকলেও উপায় নেই।

কেন? —লের্য়াড জিজ্ঞেস করলো।

—একটু চেষ্টা করে দেখো না, হাতে কলমেই অভিজ্ঞতাটা হয়ে যাক।

ব্যাপারটা ততক্ষণে বুঝে নিয়েছি। কিন্তু লেয়ার্ড বেপরোয়া, খুঁড়েই চলেছে। ফুট পাঁচেক খোঁড়া হয়েছে কিনা সন্দেহ, হঠাৎ ঠং করে এক শব্দ হলো। গাঁইতি গিয়ে শক্ত কোনও জিনিসে লেগেছে।

ফুলটন সাহেব বললেন,—এবার থাম লেয়ার্ড, নয়তো গাঁইতিটার বারোটা বাজবে।

—কেন, নিচেয় কী আছে?

মাটি! —অধ্যাপক ফুলটন বললেন,—সুমেরু অঞ্চলের মাটির এটাই বিশেষত্ব। বছরের অধিকাংশ সময় শীতের কল্পনাতীত প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সমুদ্র যেমন জমে শক্ত বরফ হয়ে যায়, তেমনি যায় তার মাটি—শক্ত হয়ে যায় গ্রানাইট পাথরের মতো। স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্ম শুধু অল্প কিছুদিনের জন্যে উপরের কয়েক ফুট মাত্র নরম করতে পারে, কিন্তু নিচের জমাট-বাঁধা পাথরের মতো শক্ত মাটির কোনও পরিবর্তন হয় না। তা অপরিবর্তনীয়, চিরন্তন। আর তার ফলে গ্রীষ্মের বরফ-গলা জল নিচের দিকে যেতে পারে না, নালা, খাল বা নদীর আকারে চারদিকে বয়ে যায়, আর নয়তো তৈরি হয় অগভীর ডোবা, বিল বা জলাভূমি।

তাঁবু খাটানো শেষ হয় এক সময়।

পাখি আর ফুল ছাড়া ডাঙায় এ পর্যন্ত কোনও জন-প্রাণী নজরে পড়ে নি। জলে অবশ্য এক-আধবার সীল ও তিমি নজরে পড়েছে; আর নজরে পড়ছে মাছ—কড, হেরিং, হ্যালিবাটই শুধু নয়, নাম-না জানা বহু জাতের অপর্যাপ্ত মাছ।

জরিপ এবং অনুসন্ধানের কাজ আজ থেকে শুরু হবে।

অভিযানের নেতা নাম-করা বিজ্ঞানী ডঃ ইস্টম্যানের নির্দেশে পাখি, মাছ ও সীল শিকারের ব্যবস্থাও হয়েছে। কতদিন এখানে থাকতে হবে, ঠিক নেই। তাই খাদ্যের ভাঁড়ার যথাসাধ্য ভর্তি করা দরকার। তাছাড়া এত টাটকা খাবারের ছড়াছড়ি যেখানে, সেখানে কারই বা রুচি থাকে টিনে প্যাক-করা খাদ্যে? অতএব বুঝতেই পারছো, পাখির টাটকা ডিম, মাংস আর মাছ চলছে প্রতিদিন।

আগেই বলেছি, অগুনতি পাখির কলরবে এলাকা সরগরম। সবই প্রায় পর্যটক পাখি, ইংরেজিতে বলে মাইগ্র্যাটরি বার্ড। উত্তরে বসন্তের আভাস জাগতেই এরা দক্ষিণ থেকে রওনা হয় সুমেরু অঞ্চলের দিকে। হাজার হাজার মাইল পার হয় কোনও-কোনও পাখি। সমুদ্র-পর্বতের কোনও বাধাই মানে না। আসবেই। কী এক সহজাত সংস্কার বা আবেগ বা আকর্ষণ যেন তাদের তাড়িয়ে নিয়ে আসে।

সারা গ্রীষ্মকাল এরা সুমেরু অঞ্চলে কাটায়, ডিম পাড়ে, বাচ্চাদের বড় করে। তারপর উত্তরে শীতের আভাস জাগতেই আবার রওনা হয় দক্ষিণ এলাকারে দিকে। হাজার হাজার মাইল পার হয়ে ফিরে যায় যে-যার জায়গায়। নিজের নিজের জায়গা চিনে নিতে এতটুকু অসুবিধা হয় না।

কত রকমের যে পাখি! তাদের বাংলা নাম জানি নে, হয়তো কোনও নামই নেই। হাঁসই দেখছি নানা জাতের। দেখছি ব্ল্যাক ব্র্যান্ট, পিন্টেল, ম্যাল্যার্ড, সবুজ ডানাওলা টিল। অসংখ্য অসংখ্য! গলা লাল লুন। তুষার-পেঁচা। লম্বা লেজওলা বাজের মতো এক জাতের সামুদ্রিক বাজ বা শঙ্খচিল। রাজহাঁস। লার্ক বা ভরত পাখি। ফুলমার। টার্ন। কত আর বলবো!

এদের মধ্যে শঙ্খচিলের ডাকটা ভারি অদ্ভুত। দুনিয়াকে যেন সারাক্ষণ ইংরেজিতে চিৎকার করে বলছে 'এর‍্যার!' এর‍্যার!' অর্থাৎ 'ঝুটা হ্যায়', 'ঝুটা হ্যায়'।

এদের প্রায় সবারই খাদ্য মনে হয় মাছ বা ছোটখাটো জলজ প্রাণী। তবে কোনও-কোনও বড় পাখি ছোট পাখিদেরও বাগে পেলে ছাড়ছে না।

এদের মধ্যে সবচেয়ে বিচিত্র 'টার্ন'-র জীবন। এদের জীবনের প্রতিটি বছরের সাত মাস কাটে আকাশপথে। কুমেরু বা দক্ষিণ মেরুতে যখন অন্ধকার শীতের আভাস জাগে, সুমেরু বা উত্তর মেরুতে তখন দেখা দেয় বসন্ত। রূপময় টার্ন যেন আলোর পাখি, অন্ধকার ও শীতকে সহ্য করতে পারে না। রওনা হয় তাই সুমেরুর পথে—শেষ দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে। সুমেরুতে গ্রীষ্মকাল কাটিয়ে শীতের আভাস জাগতে না জাগতেই আবার শুরু হয় তার যাত্রা। ফিরতি যাত্রা কুমেরুর দিকে। এমনি করে প্রতি বছরই আলোর সঙ্গে চলে তাব হাজার-হাজার মাইল যাওয়া আর আসা, আসা আর যাওয়া।

আগের কথায় আসা যাক। যাত্রার তোড়জোড় শেষ।

আমি অধ্যাপক ফুলটন সাহেবের দলে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের ওই ছোটখাটো পর্বতটা আমাদের আপাত লক্ষ্য। পর্বতটা এখান থেকে বড়জোর ছ-সাত মাইল হবে। পরে অভিজ্ঞতায় দেখলাম, হিসেবে গরমিল ছিল আগাগোড়া। দূরত্বে তা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইলের বেশি ছাড়া

কম নয়। আর ছোটখাটো নয় মোটেই, বিরাট আকাশছোঁয়া এক মহাপর্বত—মাথায় চিরন্তন বরফ-মুকুট।

সুমেরু রাজ্যে এ এক ভারি বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার, চোখে দেখে দূরত্ব ঠিক করা কঠিন।

যাই হোক পিঠে মোটঘাট বাঁধা শেষ, 'জয়গুরু' বলে রওনা হতে যাবো, হঠাৎ—না, হাঁচি নয়, টিকটিকির ডাকও নয়, এক চিৎকার কানে এল। সমুদ্রের ধার থেকে ছোকরা নাবিক ব্রাইট তারস্বরে 'এস্কিমো', এস্কিমো' করে গলা ফাটাচ্ছে।

সবাই ছুটে গিয়ে যা দেখলাম, তাতে চেঁচানোরই কথা।

আমরা যেখানে আছি, ডাঙাটা সেখানে ধনুকের পিঠের মতো দক্ষিণে বেঁকে বহু দূর পশ্চিমে গিয়ে শেষ হয়েছে। তারপরই বিরাট বাঁক। সেই বাঁকের মুখে দু-খানা বড় নৌকা বা চামড়ার তৈরি উমিয়াক দেখা যাচ্ছে, তাতে জনা আষ্টেক লোক। তাদের সাজ-পোশাক দেখে বোঝা গেল, তারা সত্যিই এস্কিমো, উমিয়াক নিয়ে সীল-তিমি শিকারে বেরিয়েছে।

দূরবীন দিয়ে দেখছি, ওরা যেন পাথর বনে গেছে। কারও হাতে বর্শা, কারও হাতে দাঁড়, কারও হাতে বা অন্য কিছু, কিন্তু কিছুই নড়ছে না, সব স্থির হয়ে আছে। যেন বজ্রাহত। নিদারুণ বিস্ময়ে তারা দেখছে আমাদের, দেখছে জাহাজটা, দেখছে তাঁবুগুলো।

আমাদের সঙ্গে এসেছিল আনাটক। সে-ও জাতে এস্কিমো। উত্তরে এস্কিমোদের দেশে যাচ্ছি, তাই তাকে আনা হয়েছিল—দরকার পড়লে দোভাষির কাজ করার জন্যে। নিজের ভাষা ছাড়াও সে ভালো ইংরেজি জানে।

অপরিচিত লোকগুলোর উদ্দেশ্যে সে তখন এস্কিমো ভাষায় চিৎকার করে চলছে। যা বলছে তার মোদ্দা কথা হলো—তোমাদের কোনও ভয় নেই। এগিয়ে এসো। আমরা তোমাদের শত্রু নই, বন্ধু। দক্ষিণের দেশ থেকে আমরা এসেছি।

কিন্তু ওদের দিক থেকে কোনও সাড়া নেই। পাথরের মূর্তির মতো সব যেন স্তব্ধ হয়ে আছে।

আনাটকের কথা কি ওরা অতদূরে শুনতে পাচ্ছে?

আনাটক জোরে ঘাড় নেড়ে বললে,—আলবত পাচ্ছে। কিন্তু ওরা বোধহয় আজো বাইরের দুনিয়ার মানুষের সংস্পর্শে আসে নি, পুরনো যুগে পড়ে আছে। তাই এই জাহাজ, বাড়িঘর ও অন্যজাতের লোকজন দেখে বেজায় ঘাবড়ে গেছে।

আনাটক হাল ছাড়ে না, চিৎকার করে নানাভাবে তাদের বোঝাতে থাকে।

কিন্তু না, অবস্থা যথাপূর্বম্।

ইতিমধ্যে বিলি কখন ছুটে গিয়ে একটা লাউডস্পিকার নিয়ে এসেছে। আমরা কেউ লক্ষ্য করি নি। সেটা মুখে লাগিয়ে হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠতেই, আমরা চমকে উঠলাম।

আর ওদিকে? ইলেকট্রিক শক খেলে যেমন হয়, লোকগুলি হঠাৎ তেমনি লাফিয়ে উঠলো। সঙ্গে-সঙ্গে সব কটা দাঁড় জলে পড়লো। নৌকার মুখ ঘুরে গেল। দেখতে-দেখতে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল বাঁকের মুখে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আনাটক। তারপরে তিক্ত কণ্ঠে বললে,—কী হলো এটা? বললাম,—ওরা এখনও সেই পুরনো যুগে পড়ে আছে, অজানা ভাষায় লাউডস্পিকারের বিশ্রী বিকট গর্জন শুনেই পালিয়ে গেল।

ডঃ ইস্টম্যান তো রেগে আগুন। গালাগালি করে বিলির চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ছাড়লেন।

যাই হোক তাঁর নির্দেশে আনাটকও আমাদের সঙ্গে চললো। তাঁর ধারণা, পথে এস্কিমোদের বসতি পড়তে পারে। আর আনাটক না থাকলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে কে?

অবশ্য আসবার পথে জাহাজে আমি আনাটকের কাছে কিছু-কিছু এস্কিমোদের ভাষা শেখার চেষ্টা করেছিলাম। আর তার ফলে আনাটকের সঙ্গে বেশ একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আমার।

কিন্তু ভাষা শেখার ব্যাপারে আমি একেবারেই নাস্তানাবুদ হয়ে গেছি। যেমন জটিল, তেমনি খটমটে কঠিন ভাষা এই এস্কিমোদের। অনেক ধ্বস্তাধস্তি করেও বিশেষ যে সুবিধে করতে পেরেছি, তা মনে হয় না।

কিন্তু একটা ব্যাপার বোধহয় আমরা অনেকেই জানি নে। বাইরের দুনিয়ায় এদের যে 'এস্কিমো' বলা হয়, তা ভুল। এস্কিমো ওদের নাম বা আসল জাতিগত নাম নয়, জাতিগত নাম হলো 'ইনুইট'। 'এস্কিমো' নামটা দেওয়া রেড ইন্ডিয়ানদের। রেড ইন্ডিয়ানরা ওদের জন্মশত্রু। তারাই নিজেদের ভাষায় ওদের ঘেন্না করে বলে 'এস্কিমো' অর্থাৎ 'কাঁচামাংসখেকো লোক'।

নামটা দেবার অবশ্য কারণও আছে। সীল, তিমি বলগা হরিণ প্রভৃতি জন্তুজানোয়ার শিকার করে ইনুইটার অনেক সময় তার টাটকা কাঁচামাংস, চর্বি ইত্যাদি খায়।

প্রচণ্ড এই শীতের রাজ্যে সবজি-তরিতরকারি নেই, তাই শরীরের পক্ষে একান্ত দরকারি ভিটামিন তারা কোথায় পাবে? পায় এই কাঁচামাংস থেকে। গোড়ায় ওরা হয়তো বাধ্য হয়েই কাঁচামাংস খাওয়া শুরু করেছিল, এখন তা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

কিন্তু তাই বলে সবসময় তারা যে শুধু কাঁচামাংসই খায় তা নয়—রান্না করে বা আগুনে ঝলসেও খায়। আর এই কাঁচামাংস খায় বলে তারা কিন্তু মোটেই বুনো, হিংস্র বা বর্বর নয়। বরং ঠিক উলটো। সজ্জন, শান্তিপ্রিয় ও অতিথিবৎসল এবং হাসিখুশি, আমুদে আর রসিকতাপ্রিয়।

॥ তিন ॥

ঘণ্টা ছয়েক হলো আমরা রওনা হয়েছি। পথে মাটি পরীক্ষা আর জরিপের কাজ করতে করতে এসেছি। সর্বত্র, বিশেষত যেখানে কিছু ছায়ার মতো, সেখানেই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বরফ জমে আছে। শক্ত কঠিন বরফ—গ্রীষ্মেও বোধহয় গলে না।

একটা উঁচু পাহাড়ি জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। অদূরে কয়েকটা পাহাড়। অগুনতি নানা জাতের রঙ-বেরঙের ফুল ঝোপঝাড় লতাপাতায় আর পাখির ডাকে ও কাকলিতে অঞ্চলটা ভরপুর।

হঠাৎ চোখে পড়লো দুটো সুমেরু খরগোশ। আকারে আমাদের দেশের খরগোশের মতোই, কিন্তু গায়ের রং ধবধবে সাদা, যাকে বলে তুষারশুভ্র। অত্যন্ত চঞ্চল। বাদামি রঙের খুদে-খুদে কটা চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে আর খাচ্ছে কচি কচি পাতা, কুঁড়ি ও কিশলয়। বড় সুন্দর দেখতে।

সঙ্গে-সঙ্গে অ্যাপ্‌লটন রাইফেল তাক্ করে। কেন যেন মনে হয়, এটা ঠিক হচ্ছে না। আমি তার হাত চেপে ধরলাম। চোখের পলকে খরগোশ দুটো উধাও।

অ্যাপল্‌টন তো রেগে টং, এই মারে কি সেই মারে! বললে,—ব্যাপারটা কী হলো?

নির্বিকার কণ্ঠে বললাম,—না ভাই, হানাহানি থাক। প্রকৃতির এই নিরুদ্বেগ শান্তির সংসারে কেন আনছো অশান্তি ও রক্তপাত?

ইচ্ছে করেই কবিত্বের ঢঙে বললাম কথাটা। সবাই হেসে ফেললে, মায় অধ্যাপক ফুলটন পর্যন্ত।

লেমিং নজরে পড়ছে দু-একটা। ক্ষণেকের জন্যে। আমাদের দেখেই বিদ্যুৎচমকের মতো মিলিয়ে যাচ্ছে। আকারে ওরা খরগোশের চেয়ে অনেক ছোট, বড়সড় ইঁদুরের মতো।

ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি উড়ছে। উড়ছে বাজ, সুমেরু পেঁচা। হঠাং ছোঁ মেরে তীরের মতো একটা বাজ নেমে এল। ক্ষণিক চিঁ-চিঁ আর্তনাদ। পরক্ষণে বাজটা উঠে গেল ওপরে। তার নখরে ঝুলছে একটা লেমিং।

আচমকা পেছন থেকে ঘাড়ে একটা প্রচণ্ড গাট্টা খেয়ে পড়তে-পড়তে আমি সামলে নিলাম। ফিরে দেখি, অ্যাপল্‌টন হাসছে দাঁত বের করে,—কি হে কবির পিচুটি, হানাহানি বন্ধ করছো না যে বড়!

সবাই আবার হেসে ওঠে। ঘাড়টা টনটন করছে। তবু দাঁত বের করে আমাকেও হাসার ভান করতে হয়।

অসমান বন্ধুর জমি। ডাইনে পাহাড়ের সারি। সতর্ক পদক্ষেপে চড়াই বেয়ে উঠছি। কারও মুখে কথা নেই।

সহসা কিছু দূরে নজরে পড়তেই দেখি, এক সুমেরু শেয়াল একটা খরগোশ শিকার করেছে।

আমাদের দেখেই সে শিকার মুখে নিয়ে পালাতে যাবে, অ্যাপল্‌টনের রাইফেল গর্জন করে উঠলো। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল শেয়ালটা।

অ্যাপল্‌টন ও মার্টিন ছুটে গেল।

প্রকৃতির শান্তি-নিকেতনে ততক্ষণে তোলপাড় শুরু হয়েছে। রাইফেলের অস্বাভাবিক বিকট শব্দে শান্ত জীবন-যাত্রার ভারসাম্য যেন হারিয়ে গেল মুর্হূতের মধ্যে। হাজারে-হাজারে পাখি উড়ছে, চিৎকার করছে। পাহাড়ে পাহাড়ে অলক্ষ্যে ছুটোছুটি করছে বুঝি আরও কত জন্তু-জানোয়ার।

সেই দুপদাপ দাপাদাপির চেঁচামেচির মধ্যে মানুষের কণ্ঠস্বরও যেন শুনতে পেলাম মনে হলো। কিংবা হয়তো শোনারও ভুল হতে পারে।

অ্যাপল্‌টন গিয়ে শেয়ালটাকে তুলে ধরেছে। আমরাও গিয়ে হাজির হলাম। শেয়াটার মাথায় গুলি লেগেছে।

ধূর্ত এই জানোয়ারটি সুমেরু রাজ্যের এক বিচিত্র জীব, আকারে আমাদের দেশের খেঁকশিয়ালের চেয়ে বড় নয়। গায়ে লম্বা লোম, রং হলদে-বাদামি। কিন্তু এ রং চিরস্থায়ী নয়। গ্রীষ্ম ও বসন্তের এই হলদে-বাদামি রং শীত এলেই সম্পূর্ণ পালটে যায়, হয় তুষারশুভ্র, ধবধবে সাদা। শুভ্র তুষার ও বরফে ঢাকা সুদীর্ঘ শীত রাত্রির অন্ধকারে আত্মরক্ষার জন্যই তার এই বেশ পরিবর্তন।

বাইরের দুনিয়ায় তার এই সাদা চামড়ার কদর অত্যন্ত বেশি। সাজ-পোশাক ও আভিজাত্যের অঙ্গ হিসেব চড়া দামে এটা বিকোয় ফার বা পশমের বাজারে।

শীতের সময় এরা শিকারের খোঁজে বরফের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে শত-শত মাইল। গ্রীষ্মে পাখির বাসায় পাখি আর তার ডিম এদের প্রধান লক্ষ্য।

চারদিক শান্ত হয়ে আসছে। হঠাৎ চমকে উঠলাম।

নাঃ, মোটেই চোখের ভুল নয়! লোমশ চামড়ার বিচিত্র পোশাক-পরা হাতে বল্লম একটা লোক পাহাড়ের মাথা থেকে লক্ষ্য করছিল আমাদের। আমি ওপর দিকে তাকাতেই সরে গেল সাঁৎ করে।

কথাটা শুনেই দলের সবাই সচকিত হয়ে উঠলো। আত্মরক্ষার তাগিদে বাঁয়ের টিলাটার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলাম আমরা।

একমিনিট... দু-মিনিট.. তিনমিনিট... পাঁচমিনিট... সাতমিনিট... সময় কেটে যায়। কিন্তু কোনও সাড়া নেই ওদিকে থেকে। মিনিট পনেরো কেটে গেল। অধ্যাপক ফুলটন সংশয়জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,—তুমি কি ঠিক দেখেছিলে, চৌধুরী? চোখের ভুল ন য় তো?

কক্‌খনও না! —সবেগে মাথা নাড়ালাম।

কিন্তু এভাবেই বা কতকাল বসে থাকবো? —বললে মার্টিন,—ওরা কখন মেহেরবানি করবে, সেই আশায় অনন্তকাল বসে থাকবো নাকি? সোজা পথ হচ্ছে রাইফেলের মুখে কথা বলানো।

আমি তীব্র প্রতিবাদ জানালাম,—না, তা হতে পারে না। আমরা কি এখানে দেশ দখল করতে এসেছি যে, এই সব হামলা রক্তপাত করবো? সুদূর উত্তরে আমাদের বাসের অযোগ্য এই বরফের রাজ্যে ওরা বসবাস করে, কারও সাতে পাঁচে থাকে না। বিনা দোষে ওদের কেন মারবো আমরা?

কী যেন বলতে যাচ্ছিল ম্যাকলয়েড। তাকে বাধা দিয়ে বললাম,—আনাটকের কথা আমি পুরোপুরি সমর্থন করি। আজো ওরা বাইরের দুনিয়ার সংস্পর্শে আসে নি। তাই রবাহুত অজানা মানুষ, আজব সাজ-পোশাক, জাহাজ, তাঁবু ইত্যাদি দেখে ওদের সন্ত্রস্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তার ওপর আছে ওই রাইফেলের গুলির শব্দ আর শেয়াল শিকার। এই ভয়ংকর হাতিয়ারের ক্ষমতা তাদের কাছে নিশ্চয়ই অলৌকিক ভুতুড়ে ব্যাপার মনে হয়েছে। তাই তাদের পক্ষে আতঙ্কিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক,—নয় কি, অধ্যাপক ফুলটন?

অধ্যাপক ফুলটন মাথা নাড়ছেন। বুঝলাম, গভীর চিন্তামগ্ন। আনাটক তাকায় আমার দিকে। তার চোখে-মুখে গভীর ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

ধীরে-ধীরে মাথা নাড়তে নাড়তে অধ্যাপক ফুলটন শেষে বললেন,—ঠিক, ঠিকই বলেছো, চৌধুরী। খুব ন্যায্য কথাই বলেছো। আনাটক তা হলে ওদের কাছে আবেদন জানাক। বলুক আমাদের কথা।

আনাটক শুরু করে। দীর্ঘ পনেরো-কুড়ি মিনিট ধরে বুঝিয়ে বলে আমাদের আসার কারণ। বলে,—প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিয়ে সুদূর দক্ষিণ থেকে আমরা এসেছি, এসেছি তোমাদের দেশ দেখতে, তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করতে।

কিন্তু সব চুপ। পাখির চিৎকার-ডাকাডাকি ছাড়া আর কোনও সাড়া নেই।

আবার আবেদন জানায় আনাটক, নিজের পরিচয় দেয়,—আমিও একজন ইনুইট। বিশ্বাস করো, সুদূর দক্ষিণে হাজার-হাজার ইনুইট বাস করে আমার সঙ্গী এইসব অন্য জাতের

লোকদের সঙ্গে। আমরা খুনখারাপি রক্তপাত করতে আসি নি, এসেছি তোমাদের ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব পেতে। ইনুইট কখনও মিথ্যে কথা বলে না, আমার কথা বিশ্বাস করো।

কিন্তু নিষ্ফল আবেদন। নিস্তব্ধ পাহাড়। তার মাথায় বা ওপাশে জনপ্রাণী আছে বলে মনে হয় না।

এক পাশে বসে অ্যাপল্‌টন, মার্টিন ও লেয়ার্ড নিবিষ্ট চিত্তে ভাজা মাছ, পাউরুটি আর পনির ধ্বংস করে চলেছে। তাদের শান্ত সমাহিত নির্বিকল্প অবস্থা দেখে আমি হেসে ফেললাম।

আনাটক বেশ মুষড়ে পড়েছে। তার চোখে মুখে বেদনা ও সংশয়,—ততঃ কিম্? এর পর কি তাহলে মার্টিনি বা আপল্‌টনি কারবার শুরু হবে?

চিন্তিত কণ্ঠে ফুলটন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন,—এখন কি করণীয়, চৌধুরী?

মনে-মনে আমিও যে বেশ একটু ঘাবড়াই নি তা নয়, তবু যথাসাধ্য সহজ কণ্ঠে বললাম,—চিন্তার কি আছে, অধ্যাপক ফুলটন? ওদের এবার জিজ্ঞেস করা যাক, আমরা থাকবো, না চলে যাবো।

তাই হলো। শেষ পর্যন্ত অন্তরের সবটুকু আকুতি জানিয়ে অনাটক জিজ্ঞেস করলো,—তোমরা কথা বলো। আমাদের কথার জবাব দাও। বলো, আমরা কি আসবো তোমাদের কাছে, না ফিরে যাবো?

নিস্তব্ধ কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই চমকে উঠলো সবাই। অ্যাপল্‌টন ও মার্টিন তো উত্তেজনায়· লাফিয়েই উঠেছে।

পাহাড়ের মাথা থেকে এক অলক্ষ্য মানুষের জলদ-গম্ভীর কণ্ঠস্বর কানে এল। যা বললো, তার অর্থ ঃ ফিরে যাও তোমরা।

বিস্ময়ের চমক কাটতেই গেল কয়েক মুহূর্তে। অধ্যাপক ফুলটনের দিকে তাকিয়ে দেখি, তাঁর হাত মুষ্টিবদ্ধ, চোখে মুখে উত্তেজনা। বুঝতে পারছি, ভদ্রলোক বিষম দোটানায় পড়েছেন। বললাম,—হতাশ বা উত্তেজিত হবেন না, অধ্যাপক ফুলটন। ওরা যে কথা বলেছে, সেই তো যথেষ্ট। অনন্তকালের অপরিচয়ের ব্যবধান, সংস্কার ও ভয় এক-আধ ঘণ্টার বক্তৃতায় ভেসে যাবে, এতখানি আশা করা কি ঠিক? ভেবে দেখুন, আপনি বিজ্ঞানী, জটিল মনুষ্যজীবনকে এত সহজ ও লঘু করে দেখা কি ঠিক?

উত্তেজিত অ্যাপল্‌টন খেঁকিয়ে উঠলো,—চুলোয় যাক তোমার ওসব জ্ঞান-বিতরণ! এখন কী করতে চাইছো বলো।

উপেক্ষার দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকিয়ে ফুলটন সাহেবকে বললাম, —আমার মতে, আজ আমরা ফিরে যাব, কিন্তু ওদের জন্যে রেখে যাবো উপহার। আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের আন্তরিকতা ও ভালোবাসা দিয়ে ওদের আমরা জয় করবোই। ওরা বন্য নয়, বর্বর নয়। তাই হিংসার কাছে নয়, বন্ধুত্বের কাছে ওরা হার মানবেই।

শেষ পর্যন্ত তা-ই ঠিক হলো। অবরুদ্ধ আবেগ আনাটক আর লুকিয়ে রাখতে পারে না, দু-হাতে জড়িয়ে ধরলো আমাকে।

ওদের উদ্দেশ করে সে বললে,—বেশ, চলে যাচ্ছি আমরা। কিন্তু যাবার সময় এখানে রেখে যাচ্ছি কিছু উপহার। বিদেশি বন্ধুদের এই উপহার তোমরা গ্রহণ করো। তোমাদের বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমরা আবার আসবো।

ফিরে চলেছি। আনাটকের পরামর্শে পেছনে তাকানো বারণ। সুতরাং কী ঘটছে সেখানে, বোঝার উপায় নেই। অ্যাপল্‌টন আর মার্টিন চলেছে গজর-গজর করতে করতে। এ ব্যবস্থায় স্বভাবতই ওরা খুশি নয়।

এক সময় অ্যাপল্‌টন বললে,—শোন চৌধুরী, অটোয়ায় ফিরে তোমায় এবার কিন্তু গির্জায় ভর্তি করে দেওয়া হবে। পুরুত হবে তুমি আর যীশুর বাণী প্রচার করবে। এবার আর তোমায় ছাড়ছি না।

আমি মুচকি হাসলাম।

হাসছো যে বড়? —মার্টিন জিজ্ঞেস করে।

—হাসছি না, প্রার্থনা করছি!

প্রার্থনা? কিসের প্রার্থনা? —অ্যাপল্‌টন খেঁকিয়ে ওঠে।

তার মাথায় এক থাপ্পড় মেরে বললাম,—উত্তেজিত হয়ো না বৎস! যীশুর কাছে প্রার্থনা করছি, বাছাদের অপরাধ নিও না প্রভু, ওরা জানে না, ওরা কী বলছে। কী পাপ করছে!

ঔফ! হোঁৎকা অ্যাপল্‌টন সঙ্গে-সঙ্গে বসে পড়লো।

অধ্যাপক ফুলটন সমেত হেসে উঠলো সবাই। দু-হাতে মাথাটা চেপে ধরে ঝিম মেরে বসে থেকে অ্যাপল্‌টন এগিয়ে এল আমার কাছে। বললে,—চৌধুরী, হাতটা দাও তো!

তারপর করমর্দনের ভঙ্গিতে হাতটা চেপে ধরে বললে,—হ্যাঁ মরদ বটে! রদ্দাটা মেরেছ যা হোক, মাথাটা ঘুরে গেছলো।

—রদ্দা! রদ্দা মারলাম কোথায়?

—ইয়ার্কি! আমার মাথায় বিরাশী সিক্কা ওজনের যেটা হাঁকড়ালে, সেটা কী?

আরে ছোঃ ছোঃ! —আমি থুতু ফেললাম,—মরদদের রদ্দা মারা চলে। বাচ্চাদের কেউ রদ্দা মারে নাকি? ছি-ছি, কি যে বলো অ্যাপল্‌টন! আদরের থাপ্পড়কে রদ্দা বলছো?

সবাই আবার হেসে ওঠে হো-হো করে। হাসতে-হাসতে ফুলটন বললেন,—ওঃ! কী বিচ্ছু রে বাবা।

হঠাৎ পেছনে একটা চিৎকার কানে এল।

তড়িৎ-বেগে ফিরে দাঁড়াতেই দেখি, বিচিত্র সাজপোশাক পরা দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ এক এস্কিমো বল্লম হাতে ছুটে আসছে আমাদের দিকে, হাত নেড়ে থামতে বলছে।

কয়েকটি অস্বস্তিকর মুহূর্ত।

কাছে এসে লোকটি যা বললে, তার অর্থ হলো,—চলো, সর্দার তোমাদের ডাকছে।

সর্দার ডাকছে! সবাই হকচকিয়ে গেলাম। এত তাড়াতাড়ি জয়লাভ করবো, কেউ আশা করি নি। সবারই চোখমুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। মার্টিন আর অ্যাপল্‌টনেরও।

লোকটা আগে আগে চলছে—নীরবে দীর্ঘপদক্ষেপে। পরনে তার ফারের বা লোমশ চামড়ার পোশাক—গায়ের 'পার্কা বা শার্ট থেকে ট্রাউজার জুতো সবই।

পাহাড়ের চড়াই-উতরাই পার হয়ে ঘণ্টাখানেক পরে ওপারে আসতেই চমকে গেলাম।

বিস্তৃত এক ভূখণ্ড—উঁচু এবড়ো-খেবড়ো অসমান। পঞ্চাশ-ষাটটি চামড়ার তাঁবু সেখানে। এস্কিমোদের গ্রীষ্মবাস। অত্যন্ত পলকা। কয়েকখানা লম্বা মোটা কাঠির ওপর ক্যারিবু

বা বলগা হরিণের চামড়া বিছিয়ে তৈরি হয়েছে তাঁবুগুলো। প্রায় প্রত্যেকটি তাঁবুর মধ্যে উঁচুতে আড়াআড়িভাবে খাটানো লম্বা কাঠি বা হাড় থেকে মাংসের খণ্ড ঝুলছে। পরে বুঝেছিলাম, দীর্ঘ শীত রাত্রির জন্য মাংস শুকিয়ে রাখার এই ব্যবস্থা।

বয়স্ক নারীপুরুষ যুবা ছেলেমেয়ে সব এসে জড়ো হয়েছে। অপার বিস্ময় ও আশঙ্কা তাদের চোখে। পালে পালে কুকুর। শুয়ে বোধহয় রোদ পোয়াচ্ছিল। আমাদের সাড়া পেয়েই ডাকতে শুরু করেছে। ডাক তাদের নেকড়ের মতো। সেই একটানা সুরেলা চিৎকার, যেন আর্তনাদ করছে। বয়স্ক লোকদের ধমকানিতে তাদের চিৎকার বন্ধ হলো বটে, কিন্তু গরগরানি থামে না।

দূরে-বিস্তৃত ভূখণ্ডটির পশ্চিমে তুষারে ঢাকা পর্বতটা উজ্জ্বল সূর্যকিরণে ঝলমল করছে। উত্তরে কিছুদূরেই সমুদ্র। চারদিকে ফুল আর পাখি। কাছে পিঠে কোথাও ডোবা বা জলাভূমি চোখে পড়ে না। গ্রীষ্মকালীন বসবাসের পক্ষে উপযুক্ত স্থানই বটে।

লোকটি যার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলে, বুঝলাম সে-ই গোষ্ঠীর মোড়ল বা সর্দার। দীর্ঘকায় বিরাট চেহারা—দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। বয়স বোঝার উপায় নেই—চল্লিশও হতে পারে, পঞ্চাশ-পঞ্চান্নও হতে পারে।

দোভাষির কাজ করে আনাটক। ফুলটন সাহেবের আলাপ চলে সর্দারের সঙ্গে।

এদেশের দক্ষিণে যে বিশাল দুনিয়া আছে, সেখানে নানা আকারের নানা জাতের কোটি-কোটি লোক বাস করে, তা ওদের ধারণায় আসে না। যেসব উপহার-দ্রব্য আমরা রেখে গেছিলাম, তার মধ্যে ছোরা একখানা। ছোরাখানার কাটবার ক্ষমতা তারা দেখেছে, কিন্তু ওটা কিসের তৈরি বুঝতে পারে নি। রাইফেলের আওয়াজ তারা শুনেছিল, তার ধোঁয়াও দেখেছিল আর দেখেছিল শেয়ালটাকে হঠাৎ মারা পড়তে। কিন্তু কী ব্যাপার, কিছুই বুঝতে পারে নি। বিরাট-বিরাট গাছপালা, গাছপালার গহন জঙ্গল, বাড়িঘর অট্টালিকা, চাকাওলো যন্ত্রযান, এরোপ্লেন, কলকারখানা, এ সবই তাদের বুদ্ধির অগম্য। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন।

কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করছি—আমাদের অনেক কথা, অনেক কিছুই ওরা বুঝতে পারছে না, অথচ তাই বলে হেসে উড়িয়েও দিচ্ছে না, বরঞ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে বুঝবার চেষ্টা করছে, শুনছে উৎকর্ণ হয়ে।

হাত-পাঁচেক দূরে একটি তরুণ যুবা দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘোন্নত চেহারা, বয়েস কুড়ি-বাইশ হবে। বারে-বারে আমার নজর যাচ্ছে তার দিকে। এক আকর্ষণী শক্তি আছে তার চেহারায়। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে যেন গিলছে আমাদের কথা। মাঝে-মাঝে তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখ খুশিতে ঝলকে উঠছে।

পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলাম তার কাছে। ভাঙা-ভাঙা এস্কিমো ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম,—তোমার নাম কী?

আমার মুখে তাদের ভাষা শুনে ছেলেটি তো অবাক। পরক্ষণে হাসিতে তার দাঁত দু-পাটি ঝিকমিক করে উঠলো, বললে—সীটুক। তোমার নাম?

—রঞ্জন।

রঙ্গজঙ্গ। বাঃ! —নামটা সে উচ্চারণ করে বারবার। বেশ খুশি।

কথা বলতে বলতে দুজনে বেরিয়ে এলাম ভিড় থেকে। সীটুক সর্দারের ছেলে। সর্দারের

নাম সামুসাঙ্গা। এস্কিমো ভাষায় আমার জ্ঞান কত কম, তা বোধহয় না বললেও চলে, শব্দের ভাঁড়ারেও তেমনি ছুঁচোর কেত্তন। কিন্তু প্রীতি ও আন্তরিকতা যেখানে মুখ্য, ভাষার প্রতিবন্ধ সেখানে টেঁকে না। তাই ঘণ্টা দেড়েক পরে যখন বিদায় নেবার সময় এল, সীটুক আমার হাত ধরে বললে,—আবার আসবে কিন্তু। আমিও যাবো।

॥ চার ॥

কয়েক দিন কেটে গেছে। এস্কিমো গ্রামটির সঙ্গে পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। সীটুকের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা জন্মেছে সবচেয়ে বেশি।

সহজ সরল জীবনযাত্রা এদের। রোগমুক্ত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জীবন। উত্তরের এই দারুণ ঠাণ্ডায় কোনও রোগবীজাণুই বাঁচতে পারে না।

এরা যে মঙ্গোলিয়ান জাতিগোষ্ঠীর লোক, তাতে সন্দেহ নেই। গায়ের রঙ, আমাদের বিচারে গৌরবর্ণ হলেও, তামাটে বলতে হবে। চোয়াল উঁচু, সোজা কালো চুল আর কিছুটা তির্যক বা তেরছা কালো চোখ।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, যে কোনও কারণেই হোক দু-হাজার আড়াই-হাজার বছর আগে এদের পূর্বপুরুষেরা এশিয়া থেকে অজ্ঞাত দেশের সন্ধানে দল বেঁধে রওনা হয়েছিল এবং প্রণালী পার হয়ে ঢুকেছিল উত্তর আমেরিকার আলাস্কায়। সেখান থেকে কালক্রমে তারা উত্তরাঞ্চল বরাবর ছড়িয়ে পড়েছে পূর্ব দিকে গ্রিনল্যান্ড পর্যন্ত। কিছুটা দক্ষিণে কানাডার ল্যাব্রাডার পর্যন্তও এগিয়ে গেছে অনেকে।

আনাটকের মতো অনেকে আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে। লেখাপড়া শিখেছে। খ্রিস্টান ধর্মও গ্রহণ করেছে। তেমনি আবার সভ্য জগতের রোগব্যাধি ও মহামারিতে আর শ্বেতকায়দের হিংস্র বন্দুকের গুলিতেও মরেছে হাজার-হাজারে। যত দূর জানা যায়, শ্বেতাঙ্গদের আমেরিকায় আসার আগে এদের সংখ্যা ছিল কয়েক লাখ, বর্তমানে সেটা এসে হাজার পঞ্চাশেকে দাঁড়িয়েছে।

যে নতুন গোষ্ঠীটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হলো, আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে তাদের ইতিপূর্বে আর কোনও যোগাযোগ হয় নি। যন্ত্র ও যান্ত্রিক সভ্যতা, তার আধিব্যাধি ও ধর্মের ছোঁয়াচ থেকে তাই তারা মুক্ত।

বরফ আর তুষার আর দুরন্ত ঠাণ্ডার সঙ্গে লড়াই করে তাদের বাঁচতে হয়। এ জীবনের সঙ্গে তারা বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

খাদ্যের জন্য শিকারই তাদের একমাত্র ভরসা। বিশেষত সমুদ্রে শিকার। স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মের কিছু-কিছু মস্ বা শৈবাল আর বেরিজাতিয় কিছু ফল ও লতাপাতা ছাড়া শাকসবজি ফসল ইত্যাদি উদ্ভিদজাতীয় খাদ্যের একান্ত অভাব। তাই এরা মাংসাহারি, আমিষ খাদ্যের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আর মাংস এরা খায়ও বটে। পরিমাণ দেখলে আঁতকে উঠতে হয়।

এস্কিমোরা যাযাবার শুধু স্বভাবের দিক দিয়ে নয়, প্রয়োজনের তাগিদেও। শিকারের ওপরই যেখানে একান্ত নির্ভর, সেখানে শিকার দুর্লভ হলে তারা অন্যত্র সরে যাবেই। যেখানে শিকারের প্রাচুর্য, সেখানেই ওরা।

যুগ-যুগান্তের অভ্যাসের ফলে ক্লান্তিহীন পরিশ্রমে এরা অভ্যস্ত—মেয়েপুরুষ সবাই।

সাময়িক বাধা ও ব্যর্থতাকে তারা আরও পাঁচটা ব্যাপারের মতো দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে শিখেছে। বিপদ বা আঘাতের যন্ত্রণা, খিদে ও অনাহারের মধ্যে থেকেও তাদের আমি প্রাণ খুলে হাসতে ও রসিকতা করতে দেখেছি। প্রকৃতিগতভাবেই তারা ফুর্তিবাজ, হাসিখুশি ও রসিকতাপ্রিয়। তেমনি আবার ওস্তাদ কারিগরও বটে। কাঠ, হাড় বা সিন্ধু-ঘোটকের দাঁত দিয়ে তৈরি ওদের জিনিসগুলো দেখলে তাজ্জব বনতে হয়।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। এস্কিমো গ্রামটির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হওয়ার পর থেকে নিজেদের দলে আমার খাতির ও প্রতিপত্তি বেড়ে গেছে বহু গুণ। ফুলটন সাহেব ও আনাটকের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা শোনার পর অভিযানের নেতা ডঃ ইস্টম্যান ও অন্যান্য সবার উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনে আমি, সত্যি কথা বলতে কি, বেশ বিপন্ন ও কাহিল হয়ে পড়েছিলাম।

এস্কিমো সর্দার সামুসাঙ্গা, সীটুক ও তাদের গোষ্ঠীর আর সবার আমার প্রতি আস্থা ও ভালোবাসা দেখে ডঃ ইস্টম্যান শেষ পর্যন্ত নির্দেশ দিয়েছেন—এস্কিমোদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব মিঃ চৌধুরীর ওপর দেওয়া হলো। অভিযানের কাজের চাপে যোগাযোগ রাখার কাজ যেন ব্যাহত না হয়, কারণ যোগাযোগ রাখাটা আমাদের উদ্দেশ্যের পরিপূরক।

সেদিন আমাদের আমন্ত্রণে এস্কিমো গাঁয়ের প্রায় সবাই এসেছিল আমাদের এখানে। আমি আর আনাটক গিয়ে তাদের নিয়ে এসেছিলাম। তার আগে সীটুক অবশ্য এক দিন এসে গেছে।

সব কিছু দেখে ওরা হকচকিয়ে গিয়েছিল বললেও কম বলা হয়। সে যে কী বিস্ময় ওদের চোখে-মুখে, তা না দেখলে বোঝা যাবে না। আমাদের তৈরি তাঁবু, তৈজসপত্র, সুতির পোশাক, পশমি কাপড়-চোপড়, রাইফেল, পিস্তল, রিভলবার, মেসিনগান, ছোট-ছোট কাঠের ও রবারের নৌকা—কোন্‌টা বলবো, সব কিছুই নতুন ও আজব তাদের কাছে।

আর জাহাজখানা! বিরাট দানবীয় জলযানটার দিকে তারা অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল আতঙ্কমিশ্রিত শ্রদ্ধা নিয়ে। জাহাজে উঠতে প্রথমে তো কিছুতেই রাজি হয় না। শেষে সীটুকের আগ্রহই প্রাধান্য পেল।

জাহাজের মধ্যে বিভিন্ন তলা, ঘরবাড়ি, চেয়ার-টেবিল, যন্ত্রপাতি, সবকিছুই ঝকঝক তকতক করছে। সে-সব স্পর্শ করতেও যেন শঙ্কা ও সংকোচ ওদের।

চোখে ওদের নিদারুণ বিস্ময়, মনে ভয় ও কৌতূহল ঃ আচ্ছা কে চালায় এ দানবটাকে? লোক তো অনেক দরকার?

যত বলি, এটা যন্ত্রে চলে, ইঞ্জিনে চলে, ওরা বুঝতেই পারে না।

কি করেই বা বুঝবে? হাজার বছরের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস ওদের মন ও সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আকাশ, বাতাস, জল, বরফ, সমুদ্র, পাহাড় পর্বত, জন্তু-জানোয়ার, পশুপাখি প্রভৃতি সবকিছুরই এক-একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে। এমনি অসংখ্য দেবদেবী, দৈত্যদানোর অস্তিত্বে বিশ্বাসী তারা। তাদের ধারণা, আমরা যে করে হোক এইসব দেবদেবী দৈত্যদানোকে পাকড়াও করে কাজে লাগিয়ে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েছি।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সামুসাঙ্গা ও সীটুকের আগ্রহে জাহাজের ইঞ্জিনটা চালিয়ে দেওয়া হলো। গর্জন করে দুলে উঠলো জাহাজ, বেজে উঠলো হুইস্‌ল্‌। উঃ! তার পরে যে দৃশ্য দেখা গেল, তা ভাষায় ব্যক্ত করার নয়। একমাত্র সীটুক ও সামুসাঙ্গা ছাড়া গোটা

এস্কিমো গোষ্ঠীই যেন নিদারুণ ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলো। সীটুক ও সামুস্যাঙ্গা শুধু দাঁড়িয়ে রইলো দাঁতে দাঁত চেপে।

তাড়াতাড়ি ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হলো। তাকিয়ে দেখি, প্রচণ্ড ভয়ে ও বিস্ময়ে সবাই যেন পাথর বনে গেছে।

আনাটক আর আমি অনেক করে বহুক্ষণ বোঝালাম তাদের ঃ এটা কোনও ভোজবাজি বা মন্তর-তন্তরের কাজ নয়, মগজ বা মস্তিষ্ক খাটিয়ে মানুষ একে একে তৈরি করেছে এসব জিনিস, যেমন ওরা তৈরি করছে ওদের কাইয়াক, উমিয়াক, বল্লম, সাজপোশাকাদি। অনেকে কিছুটা বুঝলো, অনেকে কিছুই বুঝলো না। সবচেয়ে যে বেশি বুঝলো, সে হলো সীটুক। ভয় তার মধ্যেও আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে অনন্ত কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা।

জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। সূর্য আর দিগন্তের নিচে নামছে না। আকাশে ঘুরছে অবিরাম। চব্বিশ ঘণ্টাই দিন আর দিন। দুনিয়ায় 'অন্ধকার' বলে যে একটা কথা আছে, তা কে বলবে! দরকার হলে খাই, ক্লান্তি লাগলে ঘুমোই। অদ্ভুত জীবনযাত্রা!

শীতে সমুদ্র জমে শক্ত কঠিন বরফ হয়ে ছিল, উঁচু-নিচু ঢেউ-খেলানো পুরু ঘষা কাচ যেন। সেটা গলেছে, এখনও গলছে। ডাঙায় পাহাড়ি ঢাল থেকে বিষম তোড়ে গলা তুষার নামছে, বিরাট-বিরাট স্রোতস্বিনীর আকারে গর্জন করতে করতে ছুটছে সমুদ্রের দিকে। অসংখ্য জলা আর ডোবার সৃষ্টি হয়েছে এখানে ওখানে সেখানে।

সুদূর সুমেরু রাজ্য এসময় শব্দময় বর্ণময়—নানা বৈচিত্র্যে মোহময়।

বজ্র-গর্জনে সমুদ্রে বরফ ভাঙছে, নিচের জল বেরিয়ে পড়ছে। সেখান থেকে দীর্ঘকাল পরে আসছে হাজার-হাজার সীল। বেরিয়ে আসছে সিন্ধুঘোটক, আর দৈত্যাকার তিমি, হাঙর প্রভৃতি নানা জাতের অপর্যাপ্ত মাছ। বিরাট-বিরাট বরফের চাংড়া স্রোতে পাক খাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে স্রোতের টানে, ভয়ংকর আওয়াজ তুলে একটার সঙ্গে আরেকটার ধাক্কা লাগছে, সময়-সময় ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

এস্কিমোদের কাছে বছরের এই সময়টাই সবচেয়ে ভালো সময়—এই বসন্ত, গ্রীষ্ম ও হেমন্ত ঋতু। দীর্ঘ শীতের রাতে খাদ্যের ভাণ্ডার উজাড় হয়ে গেছে। সে ভাণ্ডার এখন আবার ভরে তুলতে হবে। শিকার আর শিকার—এস্কিমো গাঁয়ে এখন শিকার ছাড়া কথা নেই।

জলে স্থলে সর্বত্র শিকার চলেছে। ডাঙায় জন্মেছে লতাগুল্ম আর কয়েকরকম বেরিজাতের ফল। এ সবই এস্কিমোদের খাদ্য। বিষাক্ত কোন কিছুই জন্মায় না এই শীত আর বরফের দেশে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হই-হই করে পাহাড়ে, পর্বতে ঘুরছে। জাল দিয়ে পাখি ধরছে। বেরি ফল, সুগন্ধি লতাপাতা সংগ্রহ করছে, মাংসের সঙ্গে মশলা আর স্যালাড হিসাবে সেগুলো উপাদেয়। পাখির বাসা থেকে ডিমও সংগ্রহ করছে তারা, মাঝে-মাঝে কাঁচা-কাঁচা খেয়ে ফেলছে কপাকপ। দীর্ঘ শীত রাত্রির খিদে আর অনাহারকে মনে হচ্ছে অতীত দুঃস্বপ্নের মতো।

কিন্তু বিষম সাংঘাতিক অবস্থা আমাদের! বিচিত্র সাংঘাতিক জাতের ডাঁশ, মশা ও মাছির ঝাঁকের আক্রমণে আর কামড়ে অসহনীয় হয়ে উঠেছে আমাদের জীবনযাত্রা। সংখ্যায় তারা অসংখ্য অগুনতি—ঝাঁক আর ঝাঁক!

সুমেরু-গ্রীষ্মের এটাই সবচেয়ে বড় অভিশাপ। নিরানন্দ দীর্ঘ শীত ঋতুর দুর্জয় ঠাণ্ডার পর স্বল্পস্থায়ী এই গ্রীষ্মের আগমন সুমেরু-বাসিন্দাদের কাছে পরম আশীর্বাদ হলেও নিরবচ্ছিন্ন আশীর্বাদ যে নয়, তা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি।

বরফ-গলা জলের ডোবা ও জলাভূমিতে এ সময় জন্মায় অসংখ্য ডাঁশ, মশা ও মাছির ঝাঁক—নানা জাতের মারাত্মক কীটপতঙ্গ। শীতকালে এদের ডিম ও শুঁয়োর গুটি জমে বরফের মতো শক্ত হয়ে থাকে। রোদের উষ্ণতায় এই সব গুটি থেকে বেরিয়ে আসে ওইসব পোকামাকড়ের বিরাট বিরাট ঝাঁক। বসন্ত থেকে হেমন্ত পর্যন্ত এরা উত্তরের বাসিন্দাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে।

ঝাঁকে-ঝাঁকে এরা যখন ওড়ে, তখন এদের কামড়ে ক্যারিবু বা বলগা হরিণ, কুকুর প্রভৃতিও মাঝে-মাঝে পাগল হয়ে যায়, মারাও পড়ে সময়-সময়। এদের আসতে দেখলে, উত্তরাঞ্চলের এমন যে হিংস্র শ্বেতভল্লুক, নেকড়ে প্রভৃতি, তারাও পালাতে পথ পায় না।

সেই অবস্থা আমাদেরও। যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা আর কাকে বলে! আমরা যেখানে তাঁবু পেতেছি, তার থেকে কিছুটা দূরে-দূরে অনেক ডোবা আর জলা। ফলে অবস্থা হয়েছে আরও শোচনীয়। তাঁবুগুলোর সাদা দেয়ালে ওদের ঝাঁক এসে যখন বসে, তখন দূর থেকে দেয়ালগুলোকে কালো ছাড়া কে বলবে সাদা!

ওদের সঙ্গে তাই আমাদের লড়াই চলেছে অবিরাম—যাকে বলে টিঁকে থাকার লড়াই। ওষুধপত্র ছিটিয়ে অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে এসেছে বটে, কিন্তু রক্তবীজের বংশের বুঝি শেষ নেই।

এস্কিমো গাঁয়ের কারওরই মুহূর্তের সময় নেই। তেমনি সময় নেই আমাদেরও। জমি জরিপের কাজে আর খনিজের ধান্দায় টোটো করে ঘুরছি প্রায় সবসময়—পালা করে। খাদ্যের ভাণ্ডার ভর্তি রাখার জন্যে শিকারও চলেছে তেমনি।

বেশ কয়েকটা মূল্যবান খনিজের সন্ধান ইতিমধ্যেই পেয়েছি আমরা। পেট্রোলিয়ামও পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে সামুসাঙ্গা ও সীটুকের সাহায্য ও পরামর্শের দাম মোটেই কম নয়। কিন্তু থাক ওসব কথা। বেশি বলা চলবে না।

আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য সীটুক ছটফট করে, ফাঁক পেলেই ছুটে আসে ডেরায়। আমাকে না পেলে, কোনদিকে গেছি শুনে নিয়ে মাইলের পর মাইল যেন গন্ধ শুঁকে ছোটে আমার খোঁজে। সত্যি কথা বলতে কি, নিবিড় অন্তরঙ্গতায় সীটুক যেন জড়িয়ে ধরেছে আমাকে।

ইতিমধ্যে এস্কিমো ভাষা আমি আরও খানিকটা রপ্ত করে ফেলেছি। আর সেই সঙ্গে সীটুককেও শেখাচ্ছি আমাদের ভাষা। আমাদের ভাষা মানে ইংরেজি নয়—খাঁটি বঙ্গ ভাষা। সত্যি বুদ্ধিমান ছেলে সীটুক, বেশ তাড়াতাড়ি ধরে ফেলেছে। বলে, বাংলা শেখা নাকি খুব সহজ।

সীটুক আর আমি যখন বাংলায় কথা বলি, তখন তৃতীয় প্রাণী কেউই কিছু বুঝতে পারে না। অ্যাপলটন, মার্টিন, লেয়ার্ড, আনাটক উপস্থিত থাকলে, চেয়ে থাকে ফ্যালফ্যাল করে। আমি সীটুককে বলি,—আরে ভায়া, দ্যাখ, দ্যাখ, বোকাচন্দ্রের দল কেমন ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে! ওদের চোখ গেলে দিলে কেমন হয়?

হা-হা করে হাসতে থাকে সীটুক।

জুন মাসের শেষ।

সেদিন সীটুক এসে হাজির। এসেছে কাইয়াকে চড়ে। বললে,—চলো।

কোথায়? —বলতে-বলতে আমি এগিয়ে গেলাম কাইয়াকটার দিকে।

নৌকোটা যেমন হালকা, পলকাও তেমনি। কয়েকখণ্ড কাঠ আর হাড়ের ফ্রেমের ওপর চামড়া টানটান করে মোড়া। শুধু একজনের মতো বসবার জায়গা গোল করে কাটা। বোটে হিসাবে যা ব্যবহার করা হয়, তা লম্বা একখানা কাঠি বা লাঠি ছাড়া কিছু নয়। তার দুই প্রান্তে চওড়া দু-খানা কাঠ লাগানো বা বাঁধা। এই নিয়েই দূর-দূর সমুদ্রে ওরা চলে যায় স্বচ্ছন্দে। আশ্চর্য!

অবশ্য আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই। হিংস্র পরিবেশে বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হলে যেসব কায়দা-কানুন জানা দরকার, তা ওরা রপ্ত করেছে হাজার হাজার বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।

ধাতুর ব্যবহার ওরা জানে না। কিন্তু সেজন্য কোনও মাথাব্যথাও নেই। জলে ও ডাঙায় যেসব জন্তু-জানোয়ার ওরা শিকার করে, তাদের হাড় দিয়ে কিংবা সুদূর দক্ষিণাঞ্চল থেকে সমুদ্র-স্রোতে কালেভদ্রে যেসব কাঠ ভেসে আসে, তাই দিয়ে ওরা তৈরি করে শিকারের অস্ত্রশস্ত্র।

ওদের এই নৌকা কাইয়াক বা উমিয়াকের ফ্রেমও তৈরি হয় তিমির হাড় বা ওই ভেসে-আসা কাঠ দিয়ে। সেই ফ্রেম তারপর চামড়া দিয়ে ছেয়ে, জন্তুর স্নায়ু দিয়ে ওরা সেলাই করে দেয়। স্লেজও তৈরি হয় এই হাড় বা কাঠ দিয়ে।

পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য জন্তু-জানোয়ারের লোমশ চামড়া তাদের কাছে আদর্শস্থানীয়। বাসস্থান তৈরি করতে গরমের সময় লাগে খানকয়েক লম্বা সরু কাঠ, অভাবে জন্তু-জানোয়ারের হাড় আর কিছু বড় চামড়া। শীতের সময় লাগে বরফ, কোনও-কোনও এলাকায় পাথর, কাদা ইত্যাদি।

দেহের তাপ ও উষ্ণতা বজায় রাখতে আর জ্বালানির জন্য তারা ব্যবহার করে জন্তু-জানোয়ারের চর্বি। সীল, তিমি, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতির চর্বি বা তেল কেরোসিনের মতোই আলো দেয়।

কাইয়াকটার দিকে আমি এগিয়ে যেতেই সীটুক এগিয়ে এল। বললে,—একটু চড়ে দেখবে নাকি?

বললাম,—মন্দ কী!

সীটুকের চোখে সেই দুষ্টুমির হাসিটা তখন আমি আমলই দিলাম না।

'বেশ' বলে সে আমাকে কাইয়াকের গোল করে কাটা ফাঁকা জায়গাটার ঠিকমতো আঁটসাট করে বসিয়ে হাতে বোটে দিয়ে বললে,—চালাও!

বোটেটা কেবল জলে ফেলেছি, সঙ্গে-সঙ্গে এ কী! এ কী! নৌকাটা যে উলটে গেল আমাকে নিয়ে। জলের মধ্যে একপাক খেয়ে পরক্ষণেই কিন্তু সে আবার সোজা! বরফ-গলা ঠাণ্ডা জলে এক পাক নেয়ে উঠলাম। গা-মাথা বেয়ে জল ঝরছে। কাঁপছি হি-হি করে। জল সেখানে অল্প হলেও কাইয়াক থেকে যে বেরিয়ে আসবো, তার উপায় নেই। কোমর পর্যন্ত ভেতরে আটকানো।

কানে এল হাসির শব্দ। সবাই হাসছে। সীটুকও হাসছে আর চেঁচাচ্ছে,—কি হলো, রন্‌জং? ঘাবড়িও না। ঠিকমতো বোটে ফেল।

মাস খানেকের চেষ্টায় 'রঙ্গজঙ্গ' থেকে আমি 'রন্‌জং-এ প্রমোশন পেয়েছি সীটুকের কাছে।

সে না বললেও বোটে ফেলতাম। কিন্তু বোটে ফেলার সময় কোমরটা কেবল একটু টান করেছি, অমনি—গেল গেল! ওরে ব্বাবা! আবার উল্টে গেছে কাইয়াক। এক পাক খেয়ে পরক্ষণেই আবার সে সোজা—আগের মতোই।

নাক-মুখ দিয়ে সমুদ্রের ঠাণ্ডা লোনা জল বেরিয়ে এল খানিক। জামা-কাপড় ভিজে সপসপ।

হো-হো-হি-হি-হা-হা-তীরে হাসির হুল্লোড়! পেট থেকে খানিক লোনা জল বেরিয়ে এল। বেশ বুঝতে পারছি, কাইয়াক চালাতে গেলে আগে ব্যালান্স বা ভারসাম্য রক্ষা করার কায়দাটা রপ্ত করা দরকার।

হাসতে-হাসতে সীটুক এগিয়ে আসছে। হি-হি করে শীতে কাঁপতে-কাঁপতে আমি তখন ব্যালান্স করার চেষ্টা করছি। সীটুককে আসতে নিষেধ করবো ভেবে কেবল ঘাড় ফিরিয়েছি, অমনি—এই! এই! বুব-বুব! হতভাগা আবার ওলটালো।

বাপরে! আবার বেশ কিছু জল ঢুকলো।

ওরে বাবা! শীতে যে জমে গেলাম!

সীটুক এসে কাইয়াক কূলে টেনে তুললো আমাকে সুদ্ধ। চূড়ান্ত নাস্তানাবুদ অবস্থা—সবাই প্রাণভরে উপভোগ করছে।

জামা-কাপড় পাল্টে কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে আসতে সীটুক বললে,—চলো।

—কোথায়?

—আঃ চলোই না।

ত্রস্ত চোখে আমি কাইয়াকটার দিকে তাকাতেই আবার সবার দমফাটা হাসি। হাসতে হাসতে সীটুক বললে,—নাহে, জলে নয়, এবার হেঁটেই যাবো।

বললাম,—বেশ দাঁড়াও। হাতিয়ারপত্তর নিয়ে আসি।

সীটুক বললে,—রণ্‌জং, তুমি বলছিলে, আমাকে বন্দুক চালানো শিখিয়ে দেবে। আজই শেখাতে হবে কিন্তু।

চকিতে দুষ্টুবুদ্ধি মাথায় খেলে গেল। বললাম,—পারবে কি?

আহত কণ্ঠে সীটুক বললে,—তার মানে?

'আচ্ছা বেশ' বলে ঘরের ভেতর থেকে বেছে একটা রাইফেল নিয়ে এলাম। গুলি ভরে ওটা সীটুকের হাতে দিলাম,—আকাশের দিকে তাক করে ছোঁড় এইভাবে।

গুডুম!

সঙ্গে-সঙ্গে সীটুকও চিৎপাত। রাইফেলটা ছিটকে পড়েছে।

সবাই হেসে ওঠে।

মুহূর্তের মধ্যে সীটুক উঠে দাঁড়ালো। ডানায় একটু চোট লেগেছে মনে হলো। কিন্তু সবচেয়ে চোট লেগেছে তার আত্মসম্মানে। বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললে,—কী আছে ওটার মধ্যে? পেছনে ধাক্কা মারলে যে!

মুখ কাচুমাচু করে ধীরে-ধীরে সে বললে,—থাক, আর দরকার নেই।

তার মানসিক অবস্থা আমি বুঝতে পারি। কষ্ট হলো। বললাম,—ঘাবড়াচ্ছ কেন,

সীটুক? কোনও কিছু শিখতে গেলে প্রথম প্রথম এক-আধুটি অসুবিধে হয়ই। দেখলে না, তোমার ওই হতভাগাটায় চাপতে গিয়ে কিভাবে আমি নাজেহাল হলাম? এসো, শিখিয়ে দিচ্ছি।

সীটুকের চোখমুখ মুহূর্তে ঝলমল করে ওঠে। সে হই-হই করে উঠলো—ও-হো শয়তান! তার বদলা নিলে বুঝি?

আমি মুচকি হাসলাম।

সমুদ্রের ধার দিয়ে আমরা চলেছি। বাহন সওয়ারের স্কন্ধে চেপেছে, অর্থাৎ সীটুক ঘাড়ে নিয়েছে কাইয়াকটা। উঁচু-নিচু অসমান জমি। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বরফ তখনও গলে নি। পাড় কোথাও উঁচু, কোথাও বা নেমে গেছে নিচের দিকে।

হঠাৎ সীটুক দাঁড়িয়ে পড়লো। ফিসফিস করে বললে,—চুপ। ওই দেখো!

সামনের দিকে তাকালাম। সাদা বরফ ছাড়া কিছুই নজরে পড়ে না। সীটুক আমাকে নিয়ে একটা টিবির আড়ালে লুকোতে-লুকোতে বললে,—দেখতে পাও নি? ভালো করে তাকিয়ে দেখো।

ক্ষিপ্র হাতে কাইয়াক থেকে সে বের করছে দীর্ঘ বল্লম একটা। তার সঙ্গে বাঁধা জানোয়ারের স্নায়ু দিয়ে তৈরি লম্বা মোটা দড়ি।

কী! দেখতে পেয়েছো? —ফিসফিস করে সীটুক জিজ্ঞেস করে।

—হ্যাঁ, দুটো জানোয়ার মনে হচ্ছে চারপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে। একটা খুব বড়, অন্যটা ছোট।

—হ্যাঁ, আস্তে। নানুক আর তার বাচ্চা। বাচ্চাটা খুব ছোট। দেখে মনে হচ্ছে, গত শীতে জন্মেছে।

চমকে উঠলাম। নানুক! সুমেরু অঞ্চলের একচ্ছত্র অধিপতি বিরাটদেহী হিংস্র ভয়াল শ্বেতভল্লুক। নানুক তার এস্কিমো নাম। সুমেরু অঞ্চলে এই প্রথম তাকে দেখলাম।

পূর্ণবয়স্ক নানুক ওজনে চারশো কেজি পর্যন্ত হয়। যেমন অসম্ভব জোর তার গায়ে, তেমনি থাবায়। তা ছাড়া থাবার আছে বড়-বড় ধারালো বাঁকা নখ।

যেমন ডাঙায়, তেমনি জলেও এরা চলতে ওস্তাদ। এদের উভচর বলা চলে। সমুদ্রে সাঁতার কেটে সীলের পেছনে এরা স্বচ্ছন্দে তাড়া করে ফেরে শত-শত মাইল।

শীতের সময় বাচ্চা হয় এদের। শীত আসতেই শ্বেতভল্লুক বরফে গর্ত খুঁড়ে সেই গুহার মধ্যে আস্তানা নেয় দীর্ঘ ঘুমের জন্য। শীতের শেষ দিকে বাচ্চা হয়—একটা বা একাধিক। এতবড় জন্তুর বাচ্চা হয় কিন্তু এতটুকু। ছোট্ট এক মাংসের দলা যেন। আকারে বড়জোর বড়সড় ইঁদুরের মতো। সম্পুর্ণ অন্ধ। গায়ে লোম প্রায় নেই বললেও চলে।

কিন্তু মা হিসেবে শ্বেতভল্লুকীর স্নেহের তুলনা নেই। হেন কাজ নেই, যা সে সন্তানের জন্যে করতে পারে না। কোনও দুশমন এ সময় তার ধারেকাছেও ঘেষতে সাহস করে না। স্নেহময়ী জননী অন্ধ সন্তানকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। তার দেহের উষ্ণতায় আর বুকের দুধে বাচ্চার চোখ ফোটে, সে বড় হয়। বছর দুয়েক সে মায়ের সঙ্গে ঘুরে দুনিয়ার হালচাল সব বুঝে নেয়। তারপর একদিন যাত্রা শুরু করে নিজের পথে।

কিন্তু শীতের ঘুম নেই পুরুষ নানুকের। বাচ্চা হলো কিনা, তা নিয়েও মাথাব্যথা

নেই। ও ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত উদাসীন। দীর্ঘ শীতের রাতে শিকারের সন্ধানে সে ঘুরে বেড়ায়—নিঃসঙ্গ একলা। প্রচণ্ড মেরুঝঞ্ঝা ও তুষারপাতের মধ্যে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘোরে ভয়াল মৃত্যুদূতের মতো।

তাকিয়ে দেখি, মা নানুক বাচ্চাকে নিয়ে এগোচ্ছে অতি ধীরে, সময়-সময় দু-এক ইঞ্চির বেশি নয়। মাঝে-মাঝে থাবা দিয়ে নাক আড়াল করছে।

কী ব্যাপার, ওটা করছে কেন?—জিজ্ঞেস করি।

সীটুক বলে,—কাছেই সীল আছে, ও দেখতে পেয়েছে। তাই শিকার করতে এগিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে ওদের ছলা-কলার বুদ্ধির শেষ নেই, ধৈর্যেরও সীমা নেই। সীলগুলো কিন্তু ঠিক তার উলটো। মগজ বলে কোনও বস্তু বোধহয় তাদের নেই, কিন্তু কৌতূহল আছে ষোলো আনা। আর সেই জন্যে মারাও পড়ে। নানুকের সারা গা ধবধবে সাদা, শুধু নাকের ডগাটা কালো। থাবা দিয়ে নাকটা আড়াল করে ও যখন এগোয়, সীল তখন মহা কৌতুকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, কীভাবে বরফের একটা খণ্ড এগিয়ে আসছে তার দিকে। তারপর নানুক যখন ঝাঁপ দেয় একসময়, তখন আর পালাবার সময় থাকে না। থাবার প্রচন্ড আঘাতে তার সব কৌতূহলের ইতি ঘটে।

সীটুককে একটা ঠেলা দিলাম,—আরে, দ্যাখ-দ্যাখ, অল্প দূরে একটা শেয়াল উঁকিঝুঁকি মারছে!

সীটুক তখন কাইয়াক থেকে বড় একখানা চারকোণা সাদা রঙের চামড়া বের করেছে। তার দু-পাশে দু-খানা সাদা রঙের হাড় আটকানো। দেখতে অনেকটা ফেস্টুনের মতো।

ওটা ঠিক করতে-করতে সে বললে,—ওতে অবাক হবার কি আছে? নানুকের পেছনেই তো শেয়াল ঘোরে। শিকার মেরে খাওয়া-দাওয়া সেরে নানুক চলে গেলে, যেসব উচ্ছিষ্ট পড়ে থাকে, তা-ই খায় ওরা। অবশ্য ভয়ে ওরা নানুকের কাছে-পিঠে কক্খনও আসে না।

হঠাৎ চমকে উঠলাম, কী ওটা? শেয়াল তো নয়! সীটুককে আবার ঠেলা দিলাম,—আরে দ্যাখ তো, ছুটে আসছে ওটা কী? নেকড়ে না?

সীটুকও চমকে উঠলো। অ্যাঁ নেকড়ে! লাফিয়ে উঠলো সে,—আরে তাই তো! জ্বাা, সব বোধহয় ভেস্তে গেল!

—কেন?

—এখনি দেখতে পাবে।

নেকড়েটা ছুটে আসছে। মাঝে-মাঝে থমকে দাঁড়াচ্ছে। বাতাসে গন্ধ শুঁকছে মনে হয়। তারপর আবার ছুটছে। শেয়ালটা ততক্ষণে হাওয়া। নানুকের চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত দূরে এসে নেকড়ে থমকে দাঁড়ালো একবার। তার লাল টকটকে জিব দিয়ে লালা ঝরছে। তীক্ষ্ণ ভয়ংকর দাঁত দু-পাটি ঝকমক করে উঠলো। লোলুপ দৃষ্টি তার নানুক বাচ্চাটার দিকে।

নিঃশব্দে ছুটে আসছে সে।... আর মাত্র চার-পাঁচ হাতের ব্যবধান। সমস্ত রক্ত বুঝি আমার বুকে এসে জমা হয়েছে। গেল গেল! বাচ্চাকে লক্ষ্য করে নেকড়ে লাফ দিয়েছে। গেল বাচ্চাটা!

পরক্ষণে কী হলো ঠিক বুঝলাম না। মা নানুক হঠাৎ কেন জানি না চঞ্চল হয়ে উঠলো। ঘাড় ফেরাতেই সে দেখে—নেকড়ে, লাফ দিয়েছে।

তারপর—বিদ্যুতের চমক যেন। দু-পায়ে সে তীরের মতো উঠে দাঁড়ালো। চোখের পলক ফেলতে যে সময় লাগে, তার সিকি ভাগ সময়ও বোধহয় লাগলো না, নেকড়ে লাফ দিয়ে নিচে পড়ার আগেই শূন্যে থাকতেই—মা নানুকের থাবা গিয়ে পড়লো তার ওপরে। পর মুহূর্তে দেখলাম, নেকড়ে দশ-বারো হাত দূরে ছিটকে পড়ে ছটফট করছে। দুরন্ত রাগে গরগর করতে-করতে ছুটে গেল নানুকী। দুল-দুল করে পেছনে গড়াতে-গড়াতে ছুটলো তুলোর বলের মতো সাদা লোমশ বাচ্চাটা। নেকড়ে উঠবার চেষ্টা করলো, দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো। পরক্ষণে নানুকী ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। নখ আর দাঁত দিয়ে ফালা-ফালা করে ফেললো তাকে। মায়ের তখন সে কী ভয়ংকর চণ্ডীমূর্তি! সন্তানের ওপর আক্রমণ—তাই যেমন রাগ, তেমনি হিংস্রতা!

নানুক কেন সুমেরু অঞ্চলের পশুরাজ, আজ বুঝলাম। অতবড় জানোয়ার, জবুথুবু চেহারা। অথচ কী তার ক্ষীপ্রতা! আর কী প্রচণ্ড শক্তি।

হঠাৎ নানুকী ফিরে দাঁড়ালো—আমরা যে দিকে আছি সেইদিকে। ক্রুদ্ধ ভয়াল চেহারা। বাতাসে গন্ধ শুঁকছে সে।

সীটুক ভয় পেয়ে গেল। সর্বনাশ! ও বোধহয় আমাদের গন্ধ পেয়েছে। বাতাসের গতি পালটে গেছে, আমাদের দিক থেকে হাওয়া বইছে ওর দিকে।

সত্যিই তাই। নানুকী পায়ে পায়ে সর্তক পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। চোখে বিষাক্ত কুটিল দৃষ্টি। রাগে গরগর করছে।

সীটুক অস্থির হয়ে ওঠে,—সর্বনাশ, আর বুঝি রক্ষে নাই! দলে ভারী না থাকলে আর কিংমিক-এর পাল সঙ্গে না থাকলে নানুক শিকার করা, বিশেষত মা-নানুকের সঙ্গে মোকাবিলা করা অসম্ভব। কী করবো এখন?

উত্তরাঞ্চলের এই বরফ-রাজ্যে এস্কিমোদের সবচেয়ে বড় সহায় ও বন্ধু হলো তাদের কুকুরের পাল। ওই সব কুকুরকে আমরা বলি হাস্কি কুকুর, এস্কিমোরা বলে কিংমিক।

মা নানুক এগিয়ে আসছে একটু একটু করে আর গন্ধ শুঁকছে বাতাসে। পেছনে তুলোর বলের মতো বাচ্চাটা। ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে ওটাকে কোলে তুলে নিই।

রাইফেলটা বুকে চেপে ধরে আমি তখন দম বন্ধ করে মনে-মনে প্রার্থনা করছি,—নানুকী চলে যাক। ও যেন না আসে এদিকে। সন্তান নিয়ে মা নিরাপদে ফিরে যাক। ৩০.৩০ ক্যালিবারের রাইফেল আমার হাতে। বোধহয় এক গুলিতেই শেষ করে দেওয়া যায় মা নানুককে। রক্ষে যে, সীটুকের মনে নেই এই রাইফেলের কথা।

হঠাৎ নানুকী থমকে দাঁড়ালো।

সীটুক হাঁফ ছাড়ে—উঃ বাঁচা গেল। বাতাসের গতি পালটেছে।

ক্ষণপরেই নানুকী বাচ্চাকে পাশে নিয়ে রওনা দিল সমুদ্রের বিপরীত দিকে। সীল শিকারের মেজাজ আর নেই বোধ করি।

সীটুককে বললাম,—চলো সীলগুলোকে এবার আমরাই শিকার করি।

সীটুক বললে,—সীল কি আর আছে এতক্ষণ? শব্দ শুনে হয়তো পালিয়েছে। তবু তাই চলো। বোকা জানোয়ার—থাকলেও থাকতে পারে।

সাদা ফেস্টুনটার এক প্রান্তের আটকানো কাঠিটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে সীটুক বললে,—ধরো। বুকে হেঁটে যেতে হবে কিন্তু।

—কিন্তু এটা কী?

—কেন, সাদা একখণ্ড চলন্ত বরফ! এর পেছনেই তো আমরা থাকবো। নানুকের কাণ্ডটা দেখনি?

বুঝেছি। —আমি বললাম,—তা তুমি তো বল্লম দিয়ে শিকার করবে। আমি কি রাইফেল চালাবো?

রাইফেল? ও-হো, তোমার কাছে রাইফেল আছে মনেই ছিল না।—বলতে-বলতে সীটুক তাকায় আমার দিকে,—তা রাইফেল দিয়ে নানুকটাকে গুলি করলে না কেন?

আমারও মনে ছিল না। —খুব সহজ কণ্ঠেই বললাম মিথ্যেটা। না বলে উপায় নেই। উত্তরাঞ্চলের এই নির্মম পরিবেশে জীবন-মরণ রক্তাক্ত হানাহানির মধ্য দিয়ে যাদের টিকে থাকার লড়াই চলে সর্বক্ষণ, তাদের কাছে লোভনীয় শিকারের প্রতি দয়া-মায়া-মমতা দেখানোর চেয়ে হাস্যকর অসম্ভব কিছু নেই। এসব ভাব-প্রবণতা ওরা বুঝতে পারে না।

আমার কথা সীটুক সরল মনেই গ্রহণ করলে। ওরা মিথ্যে বলতে জানে না, তাই অপরের মিথ্যেও ধরতে পারে না। আপসোসের সঙ্গে বললে,—এঃ, নানুকটা ফসকে গেল!

আপসোস হবারই কথা। শ্বেতভল্লুকের দেখা সহজে মেলে না, মিললেও শিকার করা খুব দুরূহ। সময়-সময় জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়। নানুকের লোমশ চামড়ায় ওদের চমৎকার পোশাক হয়। চর্বি ও মাংস সুস্বাদু। একমাত্র বিষাক্ত লিভারটা ছাড়া কোনও কিছুই ফেলা যায় না।

সাদা পর্দাটা ফেস্টুনের মতো সামনে ধরে আমরা বুকে হেঁটে রওনা হই। বরফের ঢাল বেয়ে বেশ কিছুদূর গিয়ে নিচে সামনের দিকে উঁকি মারলাম। সমুদ্রের কিনারায় বেশ খানিকটা বরফে ঢাকা পাটাতনের মতো জায়গা। চারটে সীল বসে রোদ পোয়াচ্ছে সেখানে আর গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে তাকাচ্ছে চারদিকে। তিনটে সীল আকারে বেশ বড়, ওজনে এক-একটা প্রায় দুশো কেজি হবে। চতুর্থটা কিছুটা ছোট।

সীল আমি আগেও অনেকবার দেখেছি, শিকারও করেছি। যখনই দেখি, অবাক লাগে। জলচর এরা, অথচ তিমির মতোই স্তন্যপায়ী। ডিম হয় না, এদের বাচ্চা হয়। এককালে, হয়তো সেই কোন সুদূর আদিম যুগে তিমির মতো এরাও ছিল ডাঙার প্রাণী। তারপর যে কোনও কারণেই হোক জলে নেমে যায়। ওদের লম্বা পা চারটে আজো তার সাক্ষ্য বহন করছে, তিমির মতো তা লুপ্ত হয়ে যায় নি। কিন্তু সে পায়ে আজ আর হাঁটার কাজ চলে না, প্রকৃতি সেগুলোকে জলে সাঁতার কাটার উপযোগী করে দিয়েছে।

গোল-গোল চোখে ওদের বোকা-বোকা চাউনি। দেখলে কেমন যেন মায়া হয়। হঠাৎ সীটুকের খোঁচা খেয়ে সজাগ হয়ে উঠলাম।

তারপর কয়েক মুহূর্তে। সীটুকের বল্লমে একটা আর আমার রাইফেলে তিনটে সীল মারা পড়লো।

সীটুকের যে কী আনন্দ! আমাকে জাপটে ধরলো। এতখানি সাফল্য ওর কল্পনাতীত! রাইফেল যে এত শক্তিমান, তা-ও বোধহয় ওর ধারণায় ছিল না।

সীটুকের আনন্দ বুঝতে পারি। বেঁচে থাকার ব্যাপারে সমুদ্র-প্রাণীর ওপরই ওদের সবচেয়ে বড় নির্ভরতা। তার মধ্যে সীলের স্থান সবার ওপরে। সীলের প্রতিটি অংশই তাদের

কাজে লাগে। তার মাংস ওদের প্রধান খাদ্য। পুরু চর্বি শুধু খাদ্যই নয়, জ্বালানি হিসেবেও সবচেয়ে উপযোগী। চামড়ায় পোশাক-পরিচ্ছদ ও জুতো হয়। হাড়ে হয় অস্ত্রশস্ত্র ও তৈজসপত্র। অর্থাৎ তার কোনও কিছুই ফেলা যায় না।

ক্ষিপ্র হাতে সীটুক সবচেয়ে বড় সীলটার চামড়া ছাড়াতে শুরু করে। চামড়ার যাতে ক্ষতি না হয়, সেদিকে ওদের খর দৃষ্টি। ওজনে সীলটা দেড় কুইন্টাল বেশি ছাড়া কম নয়। কোনও-কোনও জাতের সীলকে আমি তিন কুইন্টালের হতে দেখেছি।

চামড়া ছাড়াতে-ছাড়াতে সীটুক মাঝে-মাঝে কাঁচামাংসের বড়-বড় খণ্ড মুখে ফেলে দিচ্ছে। চিবোনোর সময় ফুটে উঠেছে অসীম তৃপ্তি, মনে হচ্ছে যেন রসগোল্লা খাচ্ছে।

আমাকে এক সময় পাহারায় রেখে সীটুক ছুটলো খবর দেবার জন্যে। তারপর আমাকে কেন্দ্র করে সে এক মহোৎসব!

॥ পাঁচ ॥

জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। সুমেরু রাজ্যে পুরো গ্রীষ্মকাল। বারেকের জন্যও সূর্য অস্ত যায় নি। শুধু রোদ আর রোদ। আবহাওয়াও ভারী মনোরম।

আর তারই মধ্যে দিনের পর দিন শিকার চলেছে এস্কিমোদের—শ্রান্তি নেই, বিরাম নেই। এটা তাদের জীবনমরণের প্রশ্ন। সুদীর্ঘ শীত রাত্রির অন্ধকার আর দুঃসহ ঠাণ্ডা চেপে বসার আগেই খাদ্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে হবে, নয়তো সপরিবারে অনাহার মৃত্যু।

ইতিমধ্যে শয়ে-শয়ে সীল মারা পড়েছে ওদের হাতে। স্যালমন, হেরিং, কড এসব মাছ যে কত ধরা হয়েছে, তার বোধহয় ইয়ত্তা নেই। তিমি, সিন্ধুঘোটকও শিকার করা হয়েছে বেশ কিছু। ডাঙায় ক্যারিবু বা বলগা হরিণ, শেয়াল, খরগোশ আর নানা জাতের পাখি যা মারা হয়েছে, তার পরিমাণও নেহাত কম নয়।

সীটুকদের গ্রাম ছাড়া আর দুটো এস্কিমো বসতির খবর আমরা পেয়েছি। কিন্তু এখান থেকে অনেক দূরের পথ। আমাদের সম্পর্কে তাদেরও মনে সেই আদিম আতঙ্ক ও বিরূপতা। আরো দূরে সরে গেছে তারা।

সীটুকদের সঙ্গে প্রায়ই আমাকে শিকারে বেরোতে হচ্ছে—কখনও জলে, কখনও ডাঙায়। আমি সঙ্গে থাকায় সীটুকদের এবারের ফূর্তির সীমা নেই। হাড় ও কাঠের তৈরি মান্ধাতা আমলের বর্শা বা তীরধনুক দিয়ে শিকার করা আর রাইফেল দিয়ে শিকার করার মধ্যে পার্থক্য কতখানি, তা বোধহয় বলার দরকার করে না।

এইসব শিকারের মধ্যে দুটো শিকার মনে রাখার মতো। একটা ডাঙায় ক্যারিবু বা বলগা হরিণ শিকার, অন্যটা সমুদ্রে ওয়ালরাস বা সিন্ধুঘোটক শিকার।

সেদিন সীটুক এসে হাজির। তাড়া খুব। কী ব্যাপার! না, ক্যারিবু শিকারে যেতে হবে। শুনে মার্টিন আর অ্যাপল্টন তো লাফিয়ে উঠলো। কিন্তু বাধ সাধলেন ডঃ ইস্টম্যান ঃ না। ক্যারিবু শিকারে গেলে, ফিরতে অন্তত তিন-চার দিন লাগবে। এখানকার এত জরুরি কাজ ফেলে ওদের যাওয়া চলবে না। চৌধুরী একাই যাবে।

দক্ষিণে প্রায় একদিনের পথ যাবার পর একটা নদী পার হলাম আমরা। সঙ্গে কিংমিকের পাল। আরো কিছু দূর যেতেই যে দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হলো, তা চমকপ্রদ।

সামনে চরছে ক্যারিবুর পাল। তাদের মধ্যে বাচ্চাও আছে। আমাদের গন্ধ পেয়ে

অনেকেই পালাতে শুরু করলো। ভারি সর্তক ওরা। শিক্ষিত কিংমিকের দল ঘিরে ধরলো বাদবাকিদের। তারপরের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। রাইফেল আর বর্শায় ঘায়েল হলো বেশ কিছু।

অদ্ভুত স্বভাব এই প্রকাণ্ড প্রাণীটির। মাথায় শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত বিরাট দুই শিং। দক্ষিণের গহন অরণ্যে এদের শীতাবাস। বসন্তের আভাস জাগতেই এরা পালে পালে বেরিয়ে আসে বনভূমি থেকে। বরফ গলার আগেই তুষার-ঢাকা তুন্দ্রা-প্রান্তরের ওপর দিয়ে তারা রওনা হয় উত্তর দিকে। আগেই বলেছি, বসন্তে ও গ্রীষ্মে উত্তরাঞ্চলে জন্মায় মস্ বা শৈবাল আর বড় বড় ঘাস। ক্যারিবুরা তৃণভোজী। জমাট-বাঁধা নদী হ্রদ জলাভূমি পার হয়ে পালে পালে এরা এগিয়ে চলে, শেষে গিয়ে পৌঁছায় সুমেরু সাগরের তীরে। সেখানে জন্ম হয় বাচ্চাদের।

তারপর গ্রীষ্মের শেষে এক সময় আবার শুরু হয় তাদের ঘরে ফেরার পালা। বাচ্চারা ততদিনে বড় হয়েছে, দীর্ঘ পথ চলার মতো শক্ত সমর্থও হয়েছে। তারা ফিরে চলে দক্ষিণের অরণ্য-আবাসে। নভেম্বর নাগাদ পৌঁছোয় সেখানে।

এস্কিমোদের কাছে ক্যারিবুর প্রয়োজনীয়তা বলে শেষ করা যায় না। গোটা জন্তুটাই ওদের খাদ্য। মাংস থেকে শুরু করে চোখ আর পেটের ভেতরকার আধা-হজম হওয়া শৈবাল পর্যন্ত। চোখ দুটো যেমন অতি প্রিয় খাদ্য, তেমনি ওই আধা-হজম হওয়া মস্‌ও—ওরা এটাকে যা বলে, তার অর্থ 'তুন্দ্রা স্যালাড্'।

তাছাড়া ক্যারিবুর লোমশ চামড়ায় হয় এদের পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘুমোনোর বিছানা, জুতো ও কম্বল। লোম-ছাড়ানো পালিশ-করা চামড়ায় হয় তাঁবু, তরল জিনিস রাখার পাত্র আর কাইয়াক, আর স্লেজগাড়িতে হাস্কি কুকুর বা কিংমিক্‌দের জোতার ফিতে ইত্যাদি। স্নায়ু দিয়ে তৈরি হয় চাবুক, সুতো, হারপুনের দড়ি। হাড় আর শিং দিয়ে হয় অন্যান্য বহু জিনিস—ছুরি, তীর, সূচ ইত্যাদি। আর চর্বি ও হাড়ের মজ্জা জ্বালানির কাজ করে।

এবার বলি ওয়ালরাস বা সিন্ধুঘোটক শিকারের কথা। বিচিত্র ভয়াল দর্শন এই প্রাণীটিকে শিকার করা শুধু দুরূহই নয়, অনেকসময় বিপজ্জনকও বটে—বিশেষত এস্কিমোদের ওই সেকেলে বর্শা বা হারপুন দিয়ে।

শুনতে অবাক লাগে, সীল বা তিমির মতো সিন্ধুঘোটকও এককালে ডাঙার প্রাণী ছিল। বিরাটদেহী এই জীবটিও স্তন্যপায়ী, বাচ্চা হয় এদের—মাছের মতো ডিম হয় না। পা চারখানা আজো পুরোপুরি রয়েছে, তবে সীলের মতোই জলে সাঁতরানোর উপযোগী করে প্রকৃতি তার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সীলদের তুলনায় এরা শুধু আকারেই বিরাট নয়, একটা মস্ত পার্থক্যও আছে। ঠিক হাতির মতোই এদের ওপরের চোয়াল থেকে প্রকাণ্ড দুই গজদন্ত বেরিয়ে আসে। সময় সময় এ দুটো লম্বায় দু-ফুট পর্যন্ত হয়। মুখের সামনে কিছু লোম জন্মায়, দেখায় অনেকটা গোঁফের মতো। এদের নাম বাংলায় কেন যে সিন্ধুঘোটক হলো বুঝতে পারি নে, শুঁড় না থাকলেও সিন্ধুহস্তী নামটা বোধহয় অনেকটা মানানসই হতো।

সীলদের মতো সিন্ধুঘোটক কিন্তু মাছ খায় না, খায় ঝিনুক, শঙ্খ প্রভৃতি খোলাওয়ালা সামুদ্রিক প্রাণী। সমুদ্রের তলায় মাটি খুঁড়ে এসব খাদ্য জোগাড় করার জন্যেই ওই দাঁত দুটো তাদের না হলেই নয়। কদাকার বেঢপ বিরাট চেহারা নিয়ে ডাঙায় ওরা

খুবই অসহায়, চলাফেরায় মন্থর জবুথুবু। কিন্তু জলে সাঁতরায় ঠিক মাছের মতোই। সীলদের মতো এরাও গ্রীষ্মকালে দল বেঁধে তীরে বা বরফের চাংড়ার ওপরে উঠে রোদ পোয়ায়।

সেদিন উমিয়াকে চড়ে সীটুকদের সঙ্গে সমুদ্রে শিকার করতে বেরিয়েছি। সীল, তিমি শিকার করাই উদ্দেশ্য। সিন্ধুঘোটকের কথা মনেও নেই। কারণ তাদের দেখা পাওয়া দুরাশা, কদাচিৎ দেখা মেলে। ভাগ্যচক্রে অ্যাপল্টন সেদিন সঙ্গে আছে।

সীল শিকার হয়েছে কয়েকটা। সমুদ্রে ঘুরছি আমরা। হঠাৎ সবাই চমকে উঠলাম। দূরে তীরের কাছে বরফের ওপর বসে রোদ পোয়াচ্ছে বিশালকায় তিনটে সিন্ধুঘোটক। রোদে ঝিকমিক করছে তাদের প্রকাণ্ড গজদন্তগুলো।

সীটুকরা তো মহা উত্তেজিত। আড়ালে-আড়ালে সন্তর্পণে উমিয়াক দুটো এগিয়ে গেল। তারপরেই চললো রাইফেল আর হারপুন।

জখম হতেই সিন্ধুঘোটক তিনটে ভয়ংকর হয়ে উঠলো। কী সাংঘাতিক তাদের সে সময়কার চেহারা! বিষম আক্রোশে বরফের ওপর তারা দাঁতের ঘা বসিয়ে দিচ্ছে উপর্যুপরি। বুঝতে পারছি, শত্রুকে সামনে পেলে বিরাট ওই দাঁত দিয়ে নিমেষে ফালা-ফালা করে ফেলবে। সেই সঙ্গে সে কী গর্জন! লড়াইয়ের সময় তাদের গুরুগম্ভীর সে ভয়াল গর্জন সত্যিই আতঙ্কজনক। আজ বুঝলাম, সুমেরু-রাজ্যের এমন যে একচ্ছত্র অধিপতি শ্বেতভল্লুক, সেও কেন সিন্ধুঘোটকদের সহজে ঘাঁটাতে সাহস করে না।

সামুসাঙ্গা-সীটুকদের উল্লাস বোধহয় আন্দাজ করতে পারছো। প্রকাণ্ড তিন-তিনটে সিন্ধুঘোটক শিকার—তা-ও কিনা একদিনে! এ জাতীয় দুর্লভ সৌভাগ্য তাদের জীবনে ক্বচিৎ আসে।

সিন্ধুঘোটকের মাংস এস্কিমোদের খাদ্য। এক-একটা সিন্ধুঘোটক থেকে চর্বিও পাওয়া যায় প্রচুর। দাঁত দুটোও খুব মূল্যবান। দাঁত ও হাড় দিয়ে তারা বহু দরকারি জিনিস তৈরি করে। চামড়া দিয়ে তৈরি হয় উমিয়াক।

সুমেরু-রাজ্যের স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্ম এবার বুঝি বিদায় নিচ্ছে। আকাশে বাতাসে কেমন যেন বিষণ্ণতার সুর।

প্রায় দু-মাসের মধ্যে এই প্রথম সূর্য উত্তর দিগন্তে অস্ত গেল—অবশ্য তা অল্প সময়ের জন্যে।

হেমন্ত এল। পিছু-পিছু আসছে শীত। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছি প্রকৃতির আসন্ন রূপান্তর। চারিদিকে যেন বিষাদের যবনিকা নামছে। আমূল পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে সব কিছুর।

আমাদের বৈঠকে স্থির হয়েছে, দীর্ঘ শীত-রাত্রি আমাদের এখানেই কাটাতে হবে। ডঃ ইস্টম্যানের বক্তব্য, গবেষণা আর অনুসন্ধানের কাজ বেশ কিছু বাকি এখনও।

সুতরাং শীত কাটানোর উপযুক্ত তোড়জোড় চলছে।

কিছু দিন সীটুকের দেখা নেই। বুঝতে পারছি, সময়ের খুব অভাব। শীত এসে গেল প্রায়, তাই খাবার জোগাড়ের কাজে তাদের বোধহয় ফিনিশিং টাচ চলেছে। বিশেষ করে সীল-শিকারের পক্ষে এ সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সীলগুলো সবচেয়ে মোটা হয় এ সময়। মেদ-মাংসে আর চর্বিতে এত মোটা হয় যে, মারা পড়লেও সমুদ্রে তলিয়ে যায় না—ভাসতে থাকে।

দিন ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে, বাড়ছে রাতের দৈর্ঘ। উত্তর রাজ্যের রূপান্তর ঘটছে ধাপে-ধাপে। সকালে উঠে দেখছি, রাত্রির ঠাণ্ডায় অল্প অগভীর জল জমে গেছে, মাটি হিমাচ্ছন্ন, আর রাতের তুষারপাতে ঝিকমিক করছে পাহাড়ের মাথাগুলো। দিনের বেলায় রোদের তাপে তা আবার গলে যাচ্ছে। রাতের হিমে কাতর ফুলবধূরা দিনের তাপে আবার মাথা তুলছে, মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে যেন আবাহন জানাচ্ছে দিনমণিকে।

উত্তর দেশের কাছে বিদায় নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে মাইগ্র্যাট্রি বা পর্যটক পাখির দল। বাচ্চারা বড় হয়েছে। অজানা দক্ষিণ দেশ ডাক দিয়েছে তাদেরও। সেখানে আছে উষ্ণতা, আছে খাদ্য। তারাও তৈরি যাবার জন্যে।

তারপর একদিন বিদায় নিল তারা। আসন্ন শীত রাত্রির অন্ধকারকে পেছনে ফেলে রওনা দিল আলোর দিকে। হঠাৎ থেমে গেল শব্দকলরব। পেছনে থেকে গেল শুধু তিন চার জাতের পাখি—দাঁড়কাক, সাদা তুষার পেঁচা প্রভৃতি।

ইতিমধ্যে ফুলপরীরা চলে গেছে, রঙের বাহার শেষ। আর সেই সঙ্গে হিমাচ্ছন্ন উত্তরের প্রাণীদের দেহে এসেছে বিস্ময়কর বিরাট পরিবর্তন। প্রায় সব প্রাণীর লোম বা পশম সাদা হয়ে গেছে। গায়ে শুভ্র শীতের পোশাক। দীর্ঘ রাত্রির অন্ধকারে সাদা তুষার ও বরফের পটভূমিকায় এ পোশাকে তারা প্রায় অদৃশ্য।

কিন্তু খুদে লেমিং তার বাদামি-পোশাক পালটায় নি। —পালটানোর দরকার নেই বলে। বরফের নিচে তার গর্তাবাসে সে কাটিয়ে দেবে তুষারশুভ্র মাসগুলো।

তেমনি রং পালটায় নি আরো একটি প্রাণী—দাঁড়কাক! জেদি, দুঃসাহসী, কোনও কিছুতেই বুঝি তার পরোয়া নেই। আদিগন্ত শুভ্রতার মাঝে তার উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ যেন বিদ্রোহের প্রতীক!

॥ ছয় ॥

শীত আর শীত। শীত এসে গেছে। মৃত্যু-শীতল কফিনের সাদা পুরু আস্তরণে ঢেকে ফেলছে সব কিছু। চোখের সামনে দেখছি, উঁচুনিচু অসমান বরফের কবলে ধীরে-ধীরে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ছে গোটা দেশ—পাহাড়পর্বত, মাটি, সমুদ্র সব কিছু।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন একটানা বরফে পরিণত হওয়ার উপায় নেই সুমেরু সাগরের। সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা খেলে, ফেঁপে উপর দিকে ঠেলে ওঠে সমুদ্র। আর তার ফলে ফাট ও চিড় ধরে নতুন-জমা বরফে। ঢেউ ও স্রোতের সঙ্গে-সঙ্গে সে ফাট বা চিড় কখনও চওড়া হচ্ছে, কখনও বা জুড়ে যাচ্ছে একসঙ্গে। সময়-সময় তা ধাক্কা খাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে। মাঝে-মাঝে তাই কানে আসছে ভয়ংকর আওয়াজ।

এ সময় জাহাজ এখানে বাঁধতে পারে না। তার নিচে ও চারিদিকে বরফ জমে। বরফের চাপে আর ধাক্কায় চুরমার হয়ে যায় জাহাজ। নিচের বরফের চাপে যে-সব জাহাজ আপনা থেকে বরফের ওপরে উঠতে পারে, তারাই রেহাই পায় শুধু! সেভাবেই তৈরি আমাদের জাহাজটা।

শীতের আগমনে অনেক লম্বা হয়েছে রাত্রি। সূর্যদেবকে দিগন্তের ওপরে দেখা যায় মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে। অন্ধকার দৈত্য এগিয়ে আসছে গুড়ি মেরে।

সাঁ-সাঁ শব্দে বাতাস গর্জন করে চলেছে। বইছে হিম-ঝঞ্ঝা। জলে স্থলে আকাশে, সর্বত্র উড়ছে দুরন্ত শীত ঋতুর বিজয়কেতন। শুধু বরফ আর বরফ।

আর নিঃসীম স্তব্ধতা! বর্ণহীন শব্দহীন উত্তর রাজ্য যেন স্তব্ধ আতঙ্কে দম আটকে আছে, কখন তার ওপরে নেমে আসবে সুদীর্ঘ শীতরাত্রির অন্ধকার কালো যবনিকা।

সেদিন হঠাৎ সীটুক এসে হাজির। ইতিমধ্যে আমরা তাঁবু গুটিয়ে জাহাজে এসে আশ্রয় নিয়েছি। শীতের কামড় থেকে আত্মরক্ষার উপযোগী করে ঢেকে দেওয়া হয়েছে জাহাজটাকে। কিন্তু তাতেও কি ছাই ঠাণ্ডা মানায়?

সেই ঠাণ্ডার মধ্যেই সীটুকের সঙ্গে আমাকে বেরোতে হবে। বললাম,—কেন?

আরে চলোই না। —সে নাছোড়বান্দা। ওর ওই এক দোষ, গোঁ ধরলে আর কথা নেই। সুতরাং হি-হি করতে করতে রওনা হতে হলো।

পথে যেতে যেতে সীটুক বললে,—তুমি না ইগল তৈরি দেখতে চেয়েছিলে! চলো দেখবে, আমরা তোমাদের অনেকটাই কাছে এসে গেছি।

সত্যিই তাই। কিছুটা দূরে যেতেই সামনে পড়লো উঁচু এক বরফের ঢিবি —একটানা চলে গেছে বেশ কিছুটা। সেটা পার হতেই দেখা গেল, এস্কিমোদের নতুন আস্তানা গড়ে উঠছে। শীতের সময় শিকারের সুবিধার জন্যে তাদের এই বাসস্থান পরিবর্তন।

কর্মচঞ্চল এস্কিমো গ্রাম। বাড়ির পর বাড়ি বা ঘর উঠছে। হ্যাঁ ঘরই বটে, বরফের তৈরি ঘর—ইগলু!

সীটুকের বাবা সামুসাঙ্গা, মা, ভাই, বোন এবং গাঁয়ের আরও অনেকে এগিয়ে এলো হাসতে-হাসতে। আমায় পেয়ে তারা খুব খুশি।

অবাক চোখে আমি দেখছি, কিভাবে ওরা ইগলু তৈরি করছে। ওদের সম্বল শুধু যুগ-যুগান্তের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা, আর একখানা মাত্র ছুরি।

সীটুকদের ইগলু তৈরি শুরু হলো। তুষারের ঢিবি থেকে সম-চতুষ্কোণে তুষারখণ্ড কেটে আনা হচ্ছে একের পর এক। প্রতিটি খণ্ড প্রায় তিন-ফুট লম্বা, দু-ফুট চওড়া আর আট-ইঞ্চি পুরু—সুন্দর সমান করে কাটা। ইগলু তৈরি করছে সামুসাঙ্গা, অন্যেরা সরবরাহ করছে খণ্ডগুলো। সরবরাহের কাজে আমিও হাত লাগালাম। আনন্দে ঝলকে উঠলো ওদের চোখমুখ।

দেখতে দেখতে ইগলু উঠতে শুরু করে। একের পর এক তুষার-খণ্ড চাপানো হচ্ছে। রাজমিস্ত্রিরা যেমন দুই ইটের মাঝের ফাঁক সিমেন্ট দিয়ে এঁটে দেয়, সামুসাঙ্গা তেমনি দুটো খণ্ডের মাঝের ফাঁকটা এঁটে দিচ্ছে তুষার দিয়ে। গোল ইগলুর চারদিককার দেয়াল ক্রমেই বেঁকে যাচ্ছে ভেতরের দিকে—গম্বুজের আকারে।

কী অদ্ভুত দক্ষতা আর ক্ষিপ্রতা! চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই বাসস্থান তৈরি শেষ! ভেতরে ঢোকার দরজা মাত্র একটা। তা-ও খুব ছোট। তার সামনে—দু-পাশে ও ওপরে তুষার-খণ্ড দিয়ে বেশ কয়েক ফুট লম্বা এক সুড়ঙ্গ তৈরি করা হলো। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস, তুষারপাত আর হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এই ব্যবস্থা!

হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ইগলুর ভেতরে দেয়াল ঘিরে চওড়া উঁচু এক প্ল্যাটফর্ম বা মঞ্চ তৈরি হলো—ওই তুষার দিয়েই। লোমশ চামড়া বিছিয়ে দেওয়া হলো তার ওপর। এখানে বসে ওরা গল্প-গুজব করে, খায়-দায় বা ঘুমোয়।

বড় একপাত্র চর্বির তেলে শুকনো মসের তৈরি মোটা একটা সলতে জ্বেলে দিতেই

ভেতরটা আলোকিত হয়ে উঠলো। একটু পরেই কোথায় গেল ঠাণ্ডা। ইগলুর মধ্যে এখন আরামদায়ক উষ্ণতার ইমেজ।

আচ্ছা কিংমিকিরা থাকবে কোথায়? —আমি জিজ্ঞেস করলাম। যত দূর মনে হয়েছে, সীটুকদের কিংমিকের যে পাল আছে, সংখ্যায় তা চোদ্দ-পনেরোটা হবে।

সামুসাঙ্গা বললে,—কেন, বাইরে! তাদের জন্যে আবার আলাদা কোনও ব্যবস্থা করতে হবে নাকি?

আমি অবাক হলাম,—বাইরে দুর্দান্ত শীতের ঠাণ্ডায় ওরা বাইরে থাকে? তা ছাড়া নেকড়ে নানুকের হামলার ভয়ও তো আছে!

না, শীতে ওদের কোনও অসুবিধা নেই। —সামুসাঙ্গা বললে,—একটু বরফ খুঁড়ে সেখানেই ওরা কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে থাকে। তারপর তুষার পড়ে-পড়ে ঢাকনির মতো তৈরি হয় ওদের ওপর, তখন আর শীত থাকে না। আমাদের এই তুষার দিয়ে তৈরি ইগলুর মতোই আর কি! এই ভাবেই ওরা থাকতে অভ্যস্ত। আর নেকড়ের কথা কি বলছো? তারা ওদের ধারেকাছেও ঘেঁষে না। নানুক এলে অবিশ্যি অন্য কথা। কিন্তু তাতে আমাদেরই সুবিধে। নানুক শিকারের অমন সুবর্ণ সুযোগ খুব বেশি আসে না। গাঁয়ের সমস্ত লোক আর কিংমিকের আক্রমণে নানুক মারা পড়ে।

ইতিমধ্যে পীটুক এসে আমার সঙ্গে ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে দিয়েছে। আর ওয়েঙ্গা পাশে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখছে আমার জামাকাপড়, আর কী সব মাপ-জোক করছে।

সীটুকের ছোট ভাই পীটুক, বয়সে সাত-আট বছর। ওয়েঙ্গা ছোট বোন, বয়েস ষোল সতেরো। এত দিনে যেন ওদের পরিবারের একজন হয়ে গেছি—পীটুক আর ওয়েঙ্গার কাছে তাদের বড় ভাইদের মতো। ওদের যত কিছু হই-চই আমার সঙ্গে। গল্প না বললে রেহাই নেই—সবই আমাদের দক্ষিণ দেশের মানুষজন, কলকারখানা, বনজঙ্গল, জন্তু-জানোয়ার নিয়ে গল্প।

ওয়েঙ্গাকে জিজ্ঞেস করলাম,—কী করছো কী?

ওয়েঙ্গা বললে,—কিসের তৈরি তোমার এ পোশাক?

—কেন, পশমের।

ওতে শীত মানায়? —মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করে ওয়েঙ্গার মা।

আমার মুখে করুণ হাসি ফুটে উঠলো। শীত যে কি মানায়, তা তো হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি! দিন তো এখনও পড়ে আছে। তাকিয়ে দেখি, সামুসাঙ্গা, সীটুক, ওয়েঙ্গা আর তার মায়ের চোখে কৌতুকের হাসি।

কিছুক্ষণ পরে বিদায় নিলাম তাদের কাছ থেকে।

উঃ! কী প্রচণ্ড ঠাণ্ডা—দুঃসহ কল্পনাতীত।

সপ্তাহখানেক আগে সূর্য একবার উঁকি মেরেই বিদায় নিয়েছে। আর ওঠে নি। উঠবার কথাও নয়। দীর্ঘ একটানা শীতের রাত্রি শুরু হলো।

সব কিছু জমে বরফ। সাদা কঠিন বরফের দেশ। অন্ধকার ভয়ংকর—আবার তেমনি নিষ্প্রাণ জনহীন।

এ ঠাণ্ডায় জল, তেল, কালি প্রভৃতি যা কিছু জলীয় পদার্থ সমস্তই জমাট বেঁধে যায়। রবার, লোহা, যন্ত্রপাতি—দা, গাঁইতি, টর্চ, ইঞ্জিন—কোনটা বলবো, সবই অকেজো হয়ে পড়ে। দেশলাই জ্বালানোও মুশকিল, তার কাঠির বারুদও জমজমাট অর্থাৎ জমে জমাট। অবশ্য আমাদের কথা কিছুটা স্বতন্ত্র। এসব সমস্যা সমাধানের কিছু-কিছু সম্ভাব্য ব্যবস্থা নিয়েই আমরা এসেছি। তবু প্রতি পদক্ষেপেই হিংস্র প্রতিকূল পরিবেশ আর বিপত্তি। নানা ভুলভ্রান্তি ও অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এগোতে হচ্ছে।

দুরন্ত ঠাণ্ডায় কুকুর, নেকড়ে বা শেয়ালের গা থেকে কী ধরনের ধোঁয়া উঠতে থাকে, সেদিন প্রথম তার এক চমৎকার অভিজ্ঞতা লাভ করলাম।

হঠাৎ কানে এল নেকড়ের ডাক—জাহাজের একেবারে গায়ে। অবাক হবার কিছু নেই, বিদেশি অচিন রক্তের গন্ধ পেয়ে বোধহয় সরেজমিনে তদন্তে এসেছে। আমি আর লেয়ার্ড তাড়াতাড়ি রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

আবছা অন্ধকার। কিছু দূরে গোটা তিনেক জানোয়ার, নেকড়ে বলেই মনে হলো। তাদের গা দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, সেই ধোঁয়ায় ঢাকা মূর্তিগুলো প্রায় অস্পষ্ট। আমাদের দেখেই ছুট দিল তারা। ফুট তিরিশেক যেতে না যেতেই প্রায় অদৃশ্য, পেছনে রেখে গেল ধোঁয়ার তৈরি এক পথরেখা।

নিদারুণ ঠাণ্ডায় আমাদের জমে যাবার মতো অবস্থা। প্রায় পঙ্গু। দক্ষিণ দেশের শীতের পোশাকে এ ঠাণ্ডা বাগ মানে না। পোশাকের বোঝা চাপিয়ে কিছুটা হয়তো বাঁচা যায়, কিন্তু অবস্থা হয় জবুথবু, জাহাজের মধ্যেও চলাফেরার কাজেকর্মে দারুণ অসুবিধা—বাইরে বেরোনো তো দূরের কথা। কাজকর্ম তাই প্রায় বন্ধ।

কিন্তু ভাগ্যচক্রে এ অবস্থা থেকে শেষ পর্যন্ত রেহাই পেলাম আমরা, আর তা বলতে গেলে আমারই দৌলতে।

ইগলু তৈরি করার দিন সীটুকদের সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছিল, তা আগেই বলেছি। তারপর আবার একদিন সীটুক এসে হাজির। যথারীতি সেই মারাত্মক ঠাণ্ডায় আবার বেরোতে হলো তার সঙ্গে, গেলাম ওদের ওখানে।

সীটুকের বাবা-মার চোখে সেই কৌতুকের হাসি। আর ওয়েঙ্গা ও পীটুকের কথা কী বলবো! আমার দশা দেখে তারা তো হেসেই অস্থির।

ইগলুর মধ্যে আমায় ঢুকিয়ে সামুসাঙ্গা বললে,—তোমার ওসব সাজ-পোশাক খোল। আমাদের পোশাক তোমায় পরতে হবে।

অ্যাঁ! —আমি আতকে উঠলাম।

হ্যাঁ। আঁৎকাবার কিছু নেই। —সামুসাঙ্গা বললে,—পীটুকের মা আর ওয়েঙ্গা মিলে তোমার জন্য শীতের পোশাক বানিয়েছে। ওহে, ওটা নিয়ে এসো।

ওয়েঙ্গা ততক্ষণে আমার জামার বোতাম খুলতে শুরু করেছে। করুণ চোখে সবার মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু নাঃ, পুনর্বিবেচনার আশ্বাস কোথাও নেই।

অতএব নববেশ ধারণ করতে হলো। পোশাকের যে বোঝা চাপানো ছিল, তার তুলনায় এটা শুধু হালকাই নয়, অনেক খোলামেলা—স্বচ্ছন্দে হাত-পা খেলানো যায়।

পোশাক পরা শেষ হতেই সবাই আবার ইগলুর বাইরে বেরিয়ে এলাম—ঠাণ্ডা খোলা জায়গায়।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! কোথায় সেই ঠাণ্ডা? প্রায় বারোআনা পালিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমার নববেশের একটু বর্ণনা দিলে ভালো হয় বোধহয়। গায়ে ক্যারিবুর লোমশ চামড়ার দুটো পার্কা বা কোট বা শার্ট, নিচের পার্কাটা ওল্টানো, তার পশম আছে ভেতরের অর্থাৎ শরীরের দিকে, ওপরেরটার পশম বাইরের দিকে। পরণে শ্বেতভল্লুকের চামড়ার তৈরি ট্রাউজার আর পায়ে সীলের চামড়ার বুটজুতো। কোমরে বেল্ট। ট্রাউজারের নিচের অংশ আঁটসাঁট করে বুটের মধ্যে ঢোকানো। মাথা-মুখ ঢেকে উলভারিনের পশমি চামড়া দিয়ে তৈরি টুপি। উলভারিন উত্তর আমেরিকার এক জাতের জানোয়ার। নিঃশ্বাসের গরম জলীয় বাষ্প অন্য সব চামড়ার পশমে জমে গিয়ে হিমকণার আকারে জমা হতে পারে, কিন্তু উলভারিনের পশমে সে ভয় নেই।

পোশাকটা এত গরম যে, একটু ছুটোছুটি করলে শীতেও ঘামতে শুরু করবো বলে মনে হচ্ছে। এ ঠাণ্ডায় শরীর ঘামলে বড্ড অসুবিধায় পড়তে হয়। ঘাম সঙ্গে-সঙ্গে তুষারে পরিণত হয়, অবস্থা দাঁড়ায় খুবই কষ্টদায়ক। কিন্তু এ পোশাকে সে ভয় নেই। পার্কা এমন কায়দায় ঢিলেঢালা করে তৈরি যে, গরম বোধ হলেই দরকার মতো ভেতরে বাতাস ঢোকানো যায়। বেল্টটা খুলে দিলেও চলে।

সত্যি, কী যে স্বস্তি বোধ করছি, বলবার নয়! ঠাণ্ডাকে ঠাণ্ডা করার পক্ষে এ এক আদর্শ পোশাক। যুগ-যুগান্তের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আর টিকে থাকার তাগিদে এস্কিমোরা উদ্ভাবন করেছে এই পোশাক।

পরের ঘটনা বোধহয় আঁচ করতে পারছো। এদের সহযোগিতায় আমাদের দলের প্রত্যেকের গায়ে উঠেছে এই পোশাক। তার বিনিময়ে ওদের আমরা দিয়েছি ধাতুর ও কাঠের তৈরি অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। কিছুতেই ওরা নিতে রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত আমার জবরদস্তিই জয়ী হলো। তাকে জবরদস্তি না বলে সত্যাগ্রহ আর অভিমানও বলতে পারো। এই জিনিসগুলো পেয়ে তারা খুশিও হয়েছে খুব।

এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় গোঁফদাড়ি নিয়েও সময়-সময় মহা ঝামেলায় পড়তে হয়। দিন কয়েক আগেই ঘটেছে সেই হৃদয়বিদারক ঘটনা। অধ্যাপক ফুলটন কাজে বাইরে বেরিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলেন ধুঁকতে-ধুঁকতে।

আমরা চমকে গেলাম। এ কী! অধ্যাপকের কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ির বহর কোথায় গেল? তার জায়গায় উপরের ঠোঁট থেকে মুখ বেড় দিয়ে ঝুলছে জমাট এক বরফের চাপ!

কোথায় আবার যাবে? —ডঃ ইস্টম্যান বললেন,—নিঃশ্বাসের গরম বাষ্প গোঁফদাড়িতে জমাট বেঁধে বরফের মুখোশ পরিয়েছে। অধ্যাপক, বারবার আপনাকে বলেছি, জঞ্জাল সাফ করে ফেলুন। শীতকালে এখানে ওসব রাখা চলে না।

জঞ্জাল! অধ্যাপক ফুলটন কাতর চোখে তাকালেন ডঃ ইস্টম্যানের দিকে। অভ্যেস মতো দাড়িতে হাত বুলোতে গিয়েই সাঁৎ করে সরিয়ে নিলেন হাতটা। কনকনে ঠাণ্ডা বরফে হাত ঠেকেছে।

যাই হোক, তারপর সে কী ধ্বস্তাধস্তি! অনেক কষ্টে বরফ গলিয়ে সাফা করা হলো অধ্যাপককে।

শ্মশ্রুগুম্ফমুক্ত অধ্যাপকের মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের চোখে যেন পলক পড়ে না। কোথায় উবে গেছে সেই প্রবীণ ভারিক্কী চেহারা।

সবাই দম আটকে ছিলাম। কিন্তু ডিক আর মার্টিন কাশবার অছিলায় ফ্যাক-ফ্যাক করে উঠতেই, সবার দম ফুরিয়ে গেল, এমন কি ডঃ ইস্টম্যানেরও। মুহূর্তে কেবিনটা কেঁপে উঠলো।

ইস্-স! —গালে হাত দিয়েই অধ্যাপক যেন হায়-হায় করে উঠলেন। সোজা গিয়ে ঢুকলেন নিজের বিছানায় এয়ারব্যাগের মধ্যে।

পদে-পদে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হচ্ছে। কখনও ভয়ংকর, কখনও অপরূপ।

ঝড়—প্রচণ্ড ঝড় চলেছে গত ঘণ্টা বিশেক যাবৎ। সেই সঙ্গে তুষারপাত। পিচের মতো কালো আঁধারে ঢাকা বিশ্ব চরাচর। জাহাজের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি। বাইরে হিমঝঞ্ঝার উথাল-পাতাল আর শাঁ-শাঁ গর্জন। মাঝে-মাঝে কানে আসছে নেকড়েদের হিমেল ঠাণ্ডা ডাক। বাইরে দেখবার চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুই নজরে পড়ে না।

ঘণ্টা দুয়েকের পরে ঝড় কমে এলো। অবশ্য বাতাসের বেগ তখনও আছে, তুষারও পড়ছে ঝিরঝির করে। হঠাৎ কানে এল এক হিংস্র জানোয়ারের গর্জন, পরক্ষণে আর্তনাদ। তাড়াতাড়ি বাইরে আলো ফেললাম।

বিরাট এক নানুক শিকার ধরেছে—সেটা শেয়াল হতে পারে, নেকড়ে হতে পারে, আবার সীলও হতে পারে। আলো পড়তেই নানুকটা মুহূর্তের জন্যে হকচকিয়ে গেল। পরক্ষণে শিকার নিয়ে দে চম্পট!

তারপর হিমঝঞ্ঝা থেমে গেল একসময়। অন্ধকার যেন কিছুটা ফিকে হয়ে এসেছে। আমরা বাইরে বেরোনোর তোড়জোড় করছি।

হঠাৎ এ কী! রঙিন আলোয় দশদিক ভরে গেছে। সবাই চেঁচিয়ে উঠলো! —অরোরা বরিয়ালিস! অর্থাৎ মেরুপ্রভা।!

চেঁচাতে-চেঁচাতে আর ছুটতে-ছুটতে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। আকাশের দিকে তাকাতেই বিস্ময়ে নির্বাক।

কম্পমান একগুচ্ছ আলোকচ্ছটা চলে গেছে মাঝ আকাশ পর্যন্ত। প্রভাময় আলোকের এক ঝালর যেন নেমে এসেছে মহাকাশ থেকে। কখনও বা দীপ্ত হয়ে উঠছে, কখনও বা নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। কাঁপছে, নড়ছে। আর রং পালটাচ্ছে মাঝে-মাঝে—কখনও হলদে, কখনও লাল।

কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম, খেয়াল নেই। হঠাৎ ডঃ ইস্টম্যানের কণ্ঠ কানে এল,—তৈরি হয়ে নাও, বেরুতে হবে। পরে আরও দেখতে পারবে এই অরোরা বরিয়ালিস।

সত্যিই তাই। এর পর মেরুপ্রভা আকাশে দেখা গিয়েছে বারবার—শীতকালভোর। সবুজ ও বেগুনি রঙের মেরুপ্রভাও দেখেছি একাধিকবার। কিন্তু রং যাই হোক, আলোকচ্ছটা স্থির নিশ্চল থাকে না ক্ষণেকের জন্যও—কাঁপছে ও নড়ছে সবসময়।

বিজ্ঞানীরা আজো সঠিক বলতে পারেন না, কেন কিভাবে উৎপত্তি ঘটে এই মেরুপ্রভার। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত।

ডঃ ইস্টম্যানের নেতৃত্বে রওনা হলাম আমরা। মেরুপ্রভায় দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত। বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। শুভ্র বরফের ওড়না পরেছে যেন উত্তরভূমি।

মেরুপ্রভা নিভে আসছে একটু একটু করে।

হঠাৎ এ কী! হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম। অদূরে একটা ইগলু, তার সামনে একটা স্লেজ, স্লেজের সঙ্গে গোটা দশ-বারো কুকুর বাঁধা, কাছেই কয়েকজন এস্কিমো চলাফেরা করছে।

সবাই বেশ হকচকিয়ে গেছি। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ এরা এল কোত্থেকে?

ডঃ ইস্টম্যান বললেন,—কোথা থেকেও আসেনি। এটা মরীচিকা, আলোর কারসাজি। দূর দিগন্তের নিচে অদৃশ্য ওইসব বস্তুর ছায়ামূর্তি আলোয় প্রতিফলিত হয়ে হাজির হয়েছে আমাদের সামনে।

একটু পরেই সব মিলিয়ে গেল।

মরীচিকা এখানে এক ভূতড়ে ব্যাপার। রহস্যময় অপার্থিব মনে হয়। আর তার ফলে অনভিজ্ঞ মানুষ অনেক সময় বিপদে পড়ে, মারাও যায়।

কাছের আসল বস্তুও সময় সময় বিকৃত আকারে দেখা যায় এই মরীচিকার দৌলতে। একদিনের কথা বলি।

সীটুকের সঙ্গে বেরিয়েছি। সীটুকদের সবচেয়ে বড় ও বিশ্বাসী হাস্কি কুকুর বা কিংমিক আমাদের সঙ্গে।

গল্প করতে করতে দুজনে চলেছি। একটু এগিয়ে গেছে কিংমিকটা। হঠাৎ চমকে উঠলাম। আরে ব্বাপ, আমাদের সামনে প্রকাণ্ড এক নানুক। সর্বনাশ!

তড়িঘড়ি গুলি করতে যাবো, সীটুক হাত চেপে ধরলো। তারপরেই বুঝলাম, মরীচিকার পাল্লায় পড়ে কিংমিককে নানুক বলে ভুল করেছিলাম।

শব্দও অদ্ভুত ফষ্টিনষ্টি করে এই শীতের রাজ্যে।

অসম্ভব ঠাণ্ডা পড়েছে কয়েক দিন। হাড় পর্যন্ত যেন জমে যাচ্ছে। কিন্তু কাহাতক আর বসে থাকে যায় জাহাজের মধ্যে। হাতে পায়ে মরচে পরে গেল।

সুতরাং তিনজনে—আমি, মার্টিন আর ডিক বেরিয়ে পড়লাম একটু 'হাওয়া' খেতে। আর কেউ এয়ারব্যাগ থেকে বেরোতে রাজি নয়। অমন যে অ্যাপ্‌ল্‌টন, সে-ও কাহিল।

আকাশ পরিষ্কার। আবছা অন্ধকারে শীত তাড়ানোর জন্যে তিনজনেই ছুটছি। চলে এসেছি বেশ কিছুটা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লাম ঃ আরে কী ব্যাপার! কারা যেন কথা বলছে এস্কিমো ভাষায়, অথচ—অথচ দূরে কেউ কোথায় নেই।

ডিক বেশ একটু পেছনে পড়েছিল। গা ছম-ছম করা ওই কথাবার্তা তারও কানে গেছে, বুঝলাম। কারণ, বুলেটের মতো ছুটে আসছে সে। ও যে অত জোরে ছুটতে পারে, জানা ছিল না। হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে সে মার্টিনকে ঠেলে ফেলে দুজনের মাঝখানে জায়গা করে নিল। ডিকের এই আকস্মিক দেহক্ষেপে মার্টিন রুখে ওঠে।

কিন্তু ও কী! আবার অনেক মানুষের কণ্ঠস্বর—আমাদের আশেপাশে—কখনও জোরে, কখনও আস্তে, কখনও বা ফিসফিস করে! অশরীরী কারা যেন কথা বলছে।!

ডিককে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে মার্টিন ফিসফিসিয়ে উঠলো,—ও চো-চো-চৌ-ধু-র্-র্-র্-!

ব্যাপারটা আমি প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলাম। তবু একটু মজা করার লোভ ছাড়তে পারলুম না। বললাম,—তাই তো, কী ব্যাপার! গোরস্থান...

—অ্যাঁ! অ্যাঁ!! গোরস্থা... মার্টিন আর ডিকের ফিসফিসে গলা যেন হাহাকার করে

উঠলো। হাসি চাপতে আমি অন্যদিকে মুখ ফেরাতেই হঠাৎ কানে এল ধুপধাপ শব্দ। পাশে পেছনে তাকিয়ে দেখি, ডিকও নেই, মার্টিনও নেই। আবছা অন্ধকারে দূরে ছুটছে দুটো মূর্তি। সে কী প্রাণান্ত দৌড় প্রতিযোগিতা দুজনের মধ্যে!

আমিও ডাক ছেড়ে ছুটলাম তাদের পেছনে,—এই মার্টিন! এই ডিক! থামো-থামো—শোনো-শোনো—

অনেক দূরে গিয়ে তবেই দম ফুরলো দুজনের। তারপর খুলে বললাম ব্যাপারটা ঃ ভুতুড়ে কাণ্ডফাণ্ড কিচ্ছু নয়। এ রাজ্যে শব্দ নানারকম রসিকতা করে মানুষের সঙ্গে। অত্যাধিক ঠাণ্ডা পড়লে বহুদূর এলাকার শব্দও স্পষ্ট শোনা যায়।

ওঃ, এই কাণ্ড! দুজনে গুম মেরে রইল ক্ষণকাল, তার পরেই যেন খেপে উঠলো। জাহাজে ওদের এই বীরত্ব-কাহিনী প্রচার হবার পরের দৃশ্য বোধহয় দুজনের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। তাই ক্ষিপ্ত দুজনে ঃ আমায় খুন করে মনে জ্বালা মেটাবে!

শীত আর অন্ধকার—অন্ধকার আর শীত। আর বরফ। আর মাঝে মাঝে মেরুঝঞ্ঝা বা হিমঝঞ্ঝার একটানা ক্রুদ্ধ শাঁ শাঁ গর্জন। জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। উঃ! এত শীতে আর এই অন্ধকারে মানুষ বাঁচে কী করে!

এমনি যখন মানসিক অবস্থা, হঠাৎ তখন সীটুক এসে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ যেন অনেকটা হালকা হয়ে গেল। বেরিয়ে পড়লাম তার সঙ্গে। আনাটক, মার্টিন আর অ্যাপল্‌টনও সঙ্গে চললো।

অন্ধকারে চলতে চলতে সীটুককে জিজ্ঞেস করলাম,—কোথায় যাচ্ছি?

সীল শিকারে! —সীটুক বললে। তিনটে কিংমিক সীটুকের সঙ্গে।

জমাট-বাঁধা সমুদ্রের ওপর দিয়ে খুব সাবধানে সীটুকের পেছন-পেছন প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর আমরা একটা গর্তের সামনে এসে দাঁড়ালাম। বরফের গর্ত, ব্যাস ফুটখানেক হবে, চারধার মসৃণ। সীটুক বললে,—এখানে অপেক্ষা করতে হবে সীলের জন্যে।

অ্যাপল্‌টন অবাক। বললে,—এখানে অপেক্ষা করতে হবে! তা ওটা কী?

ফিসফিস করে সীটুক বললে,—চেঁচিও না। এটা সীলের গর্ত।

—সীলের গর্ত?

—হ্যাঁ। নিঃশ্বাস নেবার জন্যে সীলেরও তো বাতাস দরকার। কিন্তু সারা শীতকাল তাদের কাটাতে হয় কঠিন জমাট বরফের নিচে। কী করে নিঃশ্বাস নেবে? সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা খেলে, বরফ ফেটে চৌচির হয়ে যায়। সেইসব ফাটল আবার নতুন তুষার ও বরফে শক্ত জমাট বাঁধার আগেই সীল এইসব গর্ত তৈরি করে। মাঝে-মাঝে এখান দিয়ে উঠে তারা বাইরের বাতাস নেয়। নাও বুঝলে তো! এবার চুপ করো।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। গর্তের ধারে সীটুক। অদ্ভুত শিক্ষা এই কিংমিকদেরও। নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে সীটুকের পাশে, যেন বরফের তৈরি মূর্তি। বোধহয় মিনিট পনেরো-কুড়ি কেটেছে। হঠাৎ সীটুক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বর্শা চেপে ধরলো। পরক্ষণে গর্ত দিয়ে উপরে উঠে এল একটা মাথা—সীল একটা। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই বর্শা গেঁথে গেল তার গলায়।

তারপর কিছুটা ধস্তাধস্তি। সীলটাকে ওপরে তোলা হলো। ওজনে প্রায় মণ চারেক

হবে। অদূরে তীরভূমি, সীলটাকে টেনে আনা হলো সেখানে। বরফে বেশ গভীর একটা গর্ত করে সীলটাকে তার মধ্যে রেখে সীটুক ভালো করে বরফ চাপা দিলে। পরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে।

আবার রওনা দিলাম আমরা। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। তারপরেই আকাশে জেগে উঠলো সেই আলোকচ্ছটা মেরুপ্রভা। রঙ-বেরঙের আলোর ছটায় বরফ-ভুবন উদ্ভাসিত। এতদিনে মেরুপ্রভা অবশ্য আমাদের কাছে পুরনো হয়ে গেছে। শীত ঋতু যত এগোচ্ছে, ততই বারে বারে দেখা মিলছে তার।

মাইল খানেক বোধহয় গেছি, কিংমিক তিনটে দাঁড়িয়ে পড়লো। গজরাচ্ছে তারা। খুব অস্পষ্ট গরর-গরর গর্জন। আমরাও থমকে দাঁড়ালাম।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। দেখছি আমরাও। কিন্তু নাঃ, কিছুই নজরে পড়ছে না।

সীটুক হঠাৎ আমায় ঠেলা মারলে। ফিসফিস করে বললে,—নানুক! তার কণ্ঠে উত্তেজনা।

—নানুক কোথায়?

—ওই যে দূরে সীলের গর্তটা দেখছো, তার পাশেই একটা তুষারের ঢিবির মতো দেখতে পাচ্ছ? ওটাই নানুক, সীলের জন্য ঘাপটি মেরে বসে আছে।

তুষার-ঢিবিটা হঠাৎ নড়ে উঠলো। পরক্ষণে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মেরুরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট ভীষণদর্শন এক মহাকায় নানুক—লম্বায় আমাদের দেড় গুণেরও বেশি হবে, মোটাও তেমনি। আমাদের উপস্থিতি সে টের পেয়েছে। তার ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পাচ্ছি।

কিংমিক্ তিনটেও বিষম উত্তেজিত। গরগর করছে, ছুটে যেতে চাইছে তাকে আক্রমণ করার জন্য। সীটুক ঠেকিয়ে রাখছে তাদের।

ঠিক এই মুহূর্তে আবার নেমে এল অন্ধকার। মেরুপ্রভা অদৃশ্য।

নানুককে গুলি করার জন্যে রাইফেল হাতে আমি তৈরি। হঠাৎ অ্যাপল্টনের রাইফেল গর্জে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো নানুক।

তারপরেই ঘটলো বিষম কাণ্ড। ভয়ংকর রাগে গজরাতে-গজরাতে নানুক ধাওয়া করলো আমাদের দিকে। তীরবেগে ছুটে আসছে সে। আর সময় নেই।

সীটুক বোধহয় একটু অসর্তক হয়েছিল। হঠাৎ একটা কিংমিক তার হাত ফসকে ছুটে গেল নানুকের দিকে। সীটুক হায় হায় করে উঠলো। কিংমিকটা ততক্ষণে নানুককে লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে। তার পরেই 'ক্যাঁক' করে একটা শব্দ শুধু। ব্যস, মহাকায়ের ভীমবাহু বন্ধনে কিংমিক শেষ!

আমি রাইফেল চালালাম। সীটুকও বল্লম ছুঁড়লো।

নানুকের ভবলীলা সাঙ্গ হলে দেখা গেল, তার বাহুর বজ্রবন্ধনে কিংমিকের পাঁজরা চুরমার হয়ে গেছে। অ্যাপল্টনের গুলিতে সে কাঁধে জখম হয়েছিল। আমার গুলি তার বুকে লেগেছে, সীটুকের বর্শা বিঁধেছে পেটে।

কিংমিকটির জন্যে সীটুকের কণ্ঠে আপশোস। কিন্তু পরক্ষণেই জাগে আনন্দের আভাস,—আজকের রোজগারটা মন্দ হলো না, কি বলো? চামড়াটায় চারটে ছ্যাঁদা হলো, এই যা দুঃখ। —বলেই হেসে ফেললো সে।

জানুয়ারির মাঝামাঝি। পিচঢালা আঁধার আর শীত আর মাঝে-মাঝে হিমঝঞ্ঝা ও মেরুপ্রভার আলোকচ্ছটা।

ইতিমধ্যে সীটুক ও সামুসাঙ্গার সঙ্গে বেশ কয়েক বার স্লেজে করে শিকারে বেরিয়েছি। সীল-চামড়ার ফালি দিয়ে কিংমিকদের স্লেজে জোতা হয় পর-পর—জোড়ায়-জোড়ায়। সবার আগে থাকে পালের গোদা। লাগামের বালাই নেই। চালকের মুখের হুকুম বা লম্বা চাবুকের শব্দে ছুটতে থাকে কিংমিকদের পাল। এক-একটা স্লেজে থাকে সাধারণত সাতটা থেকে চোদ্দটা কিংমিক। স্লেজগুলো হয় দশ থেকে বারো ফুট লম্বা আর তিন ফুট চওড়া। চাকা নেই। পেছনের হাতল ধরে চালক গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করে।

কিংমিক জাত শিকারী। তীব্র তার ঘ্রাণশক্তি। বহু-বহুদূর থেকে সে শিকারের উপস্থিতি টের পায়।

দীর্ঘ এই শীতের রাত্রে সীটুক ও সামুসাঙ্গার সঙ্গে বার বার শিকারে গিয়ে বুঝেছি, এই বরফের রাজ্যে এস্কিমোদের সবচেয়ে বড় সহায় ও বন্ধু হলো এই কিংমিক। এরা না থাকলে এস্কিমো জাতটা বোধহয় অনেক আগেই লুপ্ত হয়ে যেত দুনিয়া থেকে।

শীতকালভোর এস্কিমোরা ফাঁদ পেতে শিকার ধরে। কিছুদূর অন্তর তারা পরপর ফাঁদ পেতে যায় মাইলের পর মাইল। ফাঁদে শেয়াল পড়লে নেকড়েরা খেয়ে ফেলে। ফাঁদের টোপ চুরি করে দাঁড়কাক। তাই কিছু সময় পর-পর ফাঁদগুলো পরীক্ষা করা দরকার। কিন্তু কিংমিকের সাহায্য ছাড়া তা অসম্ভব। প্রায়ই হিমঝঞ্ঝায় কয়েক ফুট গভীর তুষারের নিচে চাপা পড়ে যায় ফাঁদগুলো। কিংমিকই শুঁকে-শুঁকে হদিস বের করে সেগুলোর। আর কিংমিকের পাল ছাড়া নানুক শিকারের কথা ভাবতেও পারে না এস্কিমোরা।

উত্তর রাজ্যের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যেন নানুক আর কিংমিক। প্রথমজন একক শক্তিতে বিশ্বাসী। দ্বিতীয় জন বিশ্বাসী দলীয় শক্তিতে। একা সে নানুকের কাছে অসহায়, কিন্তু তাদের বহুর মিলিত শক্তির কাছে নানুক হার মানতে হয়।

॥ সাত ॥

সবার মনে আনন্দ-উত্তেজনা। যত দিন যাচ্ছে, ততই পিছু হটছে শীত ঋতু। চঞ্চল হয়ে উঠছে এস্কিমো গ্রাম।

আবার দেখছি প্রকৃতির রূপান্তর। ফেব্রুয়ারির প্রথমে আকাশে দেখা দিল ফিকে এক আলোর প্রভা। উঁচু মেঘের ফাঁকে ফাঁকে লালচে ও সোনালি দীপ্তি। তার ছটায় মায়াময় পরিবেশ জাগে নিচে বরফের বুকে। দীর্ঘ নীল-নীল ছায়ার আনাগোনা সেখানে। আর উত্তরের গাঢ় নীল আকাশে তারার ঝিলিমিলি।

যত এগোয় ফেব্রুয়ারি, ততই বাড়ে এই আলোর দীপ্তি। সে আলো অবশ্য থাকে না বেশি সময়। দ্বিগুণ আক্রোশে যেন ছুটে আসে তিমির দৈত্য। আলোক-শিশুর গলা টিপে মারতে চায়। কিন্তু বৃথাই তার সে আস্ফালন।

সূর্যের দেখা নেই তখনও। তবু অন্ধকার শীত ঋতুর অবসান আর প্রাণোচ্ছল বসন্তের আগমন প্রতীক্ষায় প্রকৃতি যেন উন্মুখ হয়ে আছে।

ফেব্রুয়ারি বিদায় নেয় এক সময়। হঠাৎ একদিন চমকে উঠি সবাই। ঊর্ধ্বাকাশে কী ওসব? সুবিশাল সব ছায়া ফুটে চলেছে মহাকাশ পথে!

অধ্যাপক ফুলটন বললেন,—পৃথিবীর ছায়া। আলোর পূর্বাভাস।

আকাশে কোথায় সেই তারার মেলা? আলোর আগমনে অদৃশ্য ওরা।

মার্চের প্রথম! নির্নিমেষ চোখে দেখছি প্রকৃতির অপূর্ব জাদুখেলা।

হঠাৎ চমকে উঠলাম, এক আলোর ফলক আকাশ ফুঁড়ে উঠে গেল মহাশূন্যে। তারপর আর একটা... আবার আর একটা... আবার আবার... একের পর এক... আকাশ-পৃথিবী আলোয় আলোময়। সম্মোহিত আমি। দীর্ঘ আঁধারোর পর মনে হচ্ছে আকাশ বুঝি জ্বলছে দাউ-দাউ করে।

তারপর... তারপর হঠাৎ দক্ষিণের দিগন্ত-রেখার উপরে লাফিয়ে উঠলো ও কে? রক্তজবার মতো টকটকে লাল প্রচণ্ড গোলাকার থালার মতো?

আকাশে বাতাসে যেন জয়ধ্বনি জাগলো ঃ জয়-জয়! দিনমণির জয়! আদিত্যদেবের জয়!

সূর্যের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ আমিঃ ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং...

আজ থেকে মৃত্যু-শীতল দীর্ঘ শীত ঋতুর অবসান ঘটলো উত্তরে রাজ্যে!

বসন্ত! বসন্ত এসেছে!

জীবনের জাদুদণ্ড হাতে উষ্ণ দিন নিয়ে ফিরেছে দিবাকর। আলো এসেছে, এসেছে তাপ। প্রাণের শিহরণ ও চঞ্চলতায় আর আনন্দ-হিল্লোলে আলোড়িত সুমেরু রাজ্য। ফুল বধূরা আবার ঘোমটা খুলছে, ফিরে আসছে পাখির ঝাঁক। জলে স্থলে বরফ গলছে, ভাঙছে আর দূরে সরে যাচ্ছে একটু একটু করে।

দিনের দৈর্ঘ বাড়ছে, পিছু হটছে তিমির রাত্রি।

রূপেরসে শব্দেবর্ণে ও গন্ধে আবার কানায়-কানায় ভরে উঠছে প্রকৃতি।

অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে বরফের ইগলু থেকে এস্কিমোরা বেরিয়ে এসেছে। উৎসবের আমেজ যেন বাতাসে।

গোলগাল তুলতুলে নানুকছানার মতো হল্লোড় ছুটোছুটি ও খেলা করছে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ফর্সা ছেলেমেয়েরা। লাল টুকটুকে দুই গাল, কালো কালো চোখ, ওদের কালো চুলের রাশি লুটিয়ে পড়েছে কপালে আর চোখে-মুখে। মুক্তির আনন্দে অধীর তারা। কখনও খেলছে, কখনও ফাঁদ পেতে শেয়াল ধরছে, কখনও ছুটছে পাখির পেছনে, কখনও বা বরফের উপর টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ে ছিপ দিয়ে মাছ ধরছে সমুদ্রে। বসে নেই কোনওসময়।

কর্মচঞ্চল এস্কিমো গ্রাম। বড়দেরও সময় নেই, বিশ্রাম নেই। শিকার আর শিকার।

তেমনি সময় নেই আমাদেরও। খনিজ-অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়েছে পূর্ণোদ্যমে। ঘরে ফেরার দিন আগত ওই। তাই কাজ চলেছে দ্বিগুণ উৎসাহে।

দলের সবাই উৎফুল্ল।

বিষাদ শুধু আমার মনে।

বিদায়ের দিন এগিয়ে আসছে। আমায় প্রায় প্রতিদিনই যেতে হচ্ছে সীটুকদের আস্তানায় বা তাদের সঙ্গে শিকারে। স্নেহ, প্রীতি ও অন্তরঙ্গতায়, আমি যে বাইরের কেউ, আমাকেও যে চলে যেতে হবে, তা বুঝি ওদের মনেও নেই। সামুসাঙ্গা, সীটুক, সীটুকের মা, ওয়েঙ্গা আর পীটুককে নিয়ে সে সংসার, সে সংসারে আমিও যেন একজন।

আর মাত্র বারো দিন, তারপরেই আমরা বিদায় নিচ্ছি এখান থেকে! —সেদিন বললাম সীটুককে, বললাম ওদের সবাইকে।

প্রথমটা ওরা থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু তারপরেই ঝেড়ে ফেলে দিল কথাটা। যেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আবার সেই হাসিগল্প। কিন্তু কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল ওয়েঙ্গা। তেমনি ভাবান্তর সীটুকের চোখে-মুখে।

দিন বসে থাকে না। একে-একে কেটে গেল এগারটা দিন। বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে। আজ ঘরে ফেরার পালা।

গোটা এস্কিমো গ্রাম ভেঙে পড়েছে জাহাজঘাটায়। আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় থমথমে আবহাওয়া। ভাষা হারিয়ে গেছে সবার। আমাদের যা কিছু বাড়তি, সবই দিয়েছি ওদের—তাঁবু, কাঠ, তৈজসপত্র সব কিছু। সামুসাঙ্গা আর সীটুককে দিয়েছি একটা করে রাইফেল আর অপর্যাপ্ত গোলাবারুদ। ওরাও তেমনি আমাদের উপহার দিয়েছে নানা জিনিস—কাঠ, হাড় আর সিন্ধুঘোটকের দাঁতের তৈরি কারুকার্যকরা সুন্দর সব জিনিস।

জাহাজ ছাড়বার সময় হয়ে এল। আমার জীবনে বোধহয় আর একটি চরম বিষাদের মুহূর্ত। সামুসাঙ্গা ও সীটুকের মা নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। অব্যক্ত ব্যথায় যেন বোবা বনে গেছে। সীটুক কেঁদে ফেললো। পীটুক ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে আমার দিকে। জলে টলমল করছে দুই চোখ। আর ওয়েঙ্গা! তার কাছে বিদায় নিতে গিয়ে আর সহ্য করতে পারলাম না। সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে, তার গাল বেয়ে টপটপ করে ঝরে পড়ছে উষ্ণ অশ্রু।

দ্রুত পায়ে জাহাজে এসে লুকোলাম।

জাহাজের বাঁশি বেজে উঠলো। হঠাৎ আনাটক এসে হাজির। বললে,—কী হচ্ছে? তোমায় খুঁজে-খুঁজে হয়রান। ওরা যে তোমায় ডাকছে!

নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করে ডেকে গিয়ে দাঁড়ালাম। জাহাজ সরে যাচ্ছে একটু একটু করে। ওদের চোখে বোবা-কান্না।

ভাঙা গলায় বললাম,—আবার আসবো। আবার ফিরে আসবো আমরা।

ধীরে-ধীরে ওরা মিলিয়ে গেল বাঁকের মুখে। মিলিয়ে গেল সীটুক, ওয়েঙ্গা, পীটুক, সামুসাঙ্গা আর সীটুকের মা।

দগ্ধ নিঃসীম মহামরুপথে

॥ এক ॥

খবরটা এসে পৌঁছতেই লাফিয়ে উঠলাম।

এত দিন ব্যাপারটা ছিল আলাপ-আলোচনার পর্যায়ে, এবার তা নির্দিষ্ট রূপ পেতে চলেছে। সুতরাং আর দেরি নয়।

অন্তরে শুনতে পাচ্ছি তুমুল হল্লা। শুনতে পাচ্ছি দুর্গম ভয়ংকরের আহ্বান। দুর্বার তার আর্কষণ। মেরু অর্থাৎ সুমেরু রাজ্যে গেছি। এবার মরুর পালা। না, শুধু মরু নয়, এবারের অভিযান শুরু মহামরুর বুকে।

ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ খোলসা করে বলি।

দেশবিদেশে খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদাদির খোঁজখবর ও আহরণের জন্যে কানাডায় সুবিশাল এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আছে। বলতে গেলে দুনিয়াজোড়া তার কর্মকান্ড। এ কোম্পানিতে সরকারের যেমন মোটা অংশ আছে, তেমনি আছে এ দেশের শিল্পবাণিজ্যে যারা মধ্যমণি ও শিরোমণি, সেইসব প্রতিষ্ঠানেরও। মেলস্যাম সাহেবরাও যে তার অন্যতম অংশীদার হবেন, তা বোধহয় না বললেও চলে। না, অন্যতম অংশীদারই শুধু নন, তাঁরা এর সবিশেষ-ক্ষমতাশালী অংশীদারও বটে।

এ কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত আছেন বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত সব বিশেষজ্ঞরাও—ভূবিজ্ঞানী, ধাতুবিজ্ঞানী, খনিজ বা মাণিক বিজ্ঞানী, জীব বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ্, পদার্থবিজ্ঞানী, আবহবিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ্, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি। সেদিক থেকে এ অভিযানে আমার যোগদানের ব্যাপারে প্রশ্ন উঠবে কিনা, কে জানে! আশঙ্কাটা মনে এলেই বড্ড অস্বস্তি বোধ হয়।

বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান উত্তোলনাদির জন্য সেইসব দেশের সরকারের সঙ্গে এই কোম্পানি চুক্তিবদ্ধ হয়। তারও আগে সরকারি পর্যায়ে চলে কথাবার্তা, চুলচেরা আলোচনা, দরকষাকষি ইত্যাদি। সেসব কূটকচালির ঝামেলা পার হয়ে শেষ পর্যন্ত চুক্তি সম্পন্ন হলে সে দেশের সরকারের সহযোগিতায় অনুসন্ধানের কাজ চালায় কোম্পানি। তারপর অনুসন্ধান যদি সফল হয়, অর্থাৎ প্রাকৃতিক-খনিজ সম্পদের খোঁজ যদি মেলে এবং পরিমাণাদি বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখার পর যদি লাভজনক বিবেচিত হয়, তবে তার উত্তোলন-আহরণেরও ব্যবস্থা করে এই কোম্পানি।

এ ব্যাপারে ঔপনিবেশিক শোষণ ও দাসত্ব থেকে মুক্ত সদ্য-স্বাধীন দেশগুলোর দিকে এইসব একচেটিয়া পুঁজিবাদী কোম্পানির স্বাভাবিক কারণেই নজর সবচেয়ে বেশি। জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে এসব কাজকে অগ্রাধিকার দিতে চায় সে দেশগুলো। কিন্তু আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক-কারিগরি সঙ্গতির দিক দিয়ে তারা এত দুর্বল যে, আপন ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে এসব কাজে হাত দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাদের এই অনুন্নত অসহায় অবস্থার সুযোগ নেবার চেষ্টা করে পাশ্চাত্য দেশের এইসব ধনিক-বণিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান।

অবিশ্যি সব ক্ষেত্রে যে ষোলোআনা সফল হয়, তাও নয়। রাজনীতি ও কূটনীতির খেলায় সদ্য-স্বাধীন অনেক দেশই, দেখা যায়, কম যায় না—তারা ইতিমধ্যেই বেশ সেয়ানা হয়ে উঠছে।

এবং তা হবার যথেষ্ট কারণও আছে। পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে বর্তমান রয়েছে জ্ঞানবিজ্ঞানে শক্তিসামর্থ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ সমাজতান্ত্রিক সব দেশ। সদ্যস্বাধীন দেশগুলো

উন্নয়নমূলক কাজে খুব সহজ শর্তে তাদের কাছ থেকে পেতে পারে সাহায্য ও সহযোগিতা। তার ফলে দরকষাকষির করার হিম্মত তাদের খুব বেড়ে গেছে। তাই সেয়ানে সেয়ানে চলে কোলাকুলি।

এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমি পুঁজিবাদী দেশগুলোর এবং তাদের ধনিক বণিকের অবস্থা যে খুব সুখকর নয়, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। একদিকে গরিব দেশগুলোর কাছ থেকে সবরকমের সুযোগসুবিধা ষোলআনার জায়গায় বত্রিশআনা আদায় করার দুরন্ত বাসনা, অন্যদিকে সন্দেহ ও ভয় ঃ এই সমাজতান্ত্রিক শয়তানরা আবার না এসে জোটে!

এমনি এক বিশ্রী দড়ি-টানাটানির কসরতের ভেতর দিয়ে চলতে হচ্ছে বর্তমান যুগের একচেটিয়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোকে।

যাই হোক, নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পেলাম, অ্যালজিরিয়ার সাহারা মরুভূমির দূরবর্তী অঞ্চলে খনিজ দ্রব্যাদির অনুসন্ধান ও আহরণের বিষয় নিয়ে বেশ কিছুকাল যাবৎ আমাদের কোম্পানির সঙ্গে অ্যালজিরিয় সরকারের যে টানাহ্যাঁচড়া চলছিল, তার ফয়সালা হয়েছে। চুক্তিস্বাক্ষরের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারটা চুকতেও আর দেরি নেই।

খবরটার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। কোম্পানির এমন একটা জায়গায় আমি আছি যে, তা কখনই উড়ো খবর হতে পারে না।

অ্যালজিরিয়া বনাম কোম্পানির কূটনৈতিক-অর্থনৈতিক খেলায় কার পক্ষে কোন্ দিকে কতটুকু পাল্লা ভারী হয়েছে, তা নিয়ে আমার মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। ও জাতীয় মাথাব্যথা অনধিকারচর্চারই নামান্তর। তাতে লাভ তো নেই-ই, বরং লোকসানের সম্ভবনা ষোলোআনা। শত মাথা কুটে মরলেও চুক্তির ভেতরের খবর কিছুই জানা যাবে না।

কাজেই যেটুকু খবর পেলাম, তা-ই যথেষ্ট। জানলাম, অ্যালজিরিয় সরকারের সহযোগিতায় মধ্য সাহারায় বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে খনিজ সম্পদের খোঁজাখুঁজি ও সংগ্রহের ব্যবস্থা করবে একমাত্র আমাদের কোম্পানিই। ব্যস, আর কি চাই! এ অভিযানে রঞ্জনকুমার চৌধুরীকে থাকতেই হবে।

সাহারা সম্বন্ধে খুব যে বেশি জানি তা নয়। তবে এটুকু জানি যে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড়, বৃহত্তম মরুভূমি এই সাহারা, বালি ও পাথরের মহাসুমদ্র, পৃথিবীর উষ্ণতম এই জায়গাগুলোর অন্যতম—প্রায় নির্জনে নিষ্প্রাণ চিরতৃষ্ণার্ত উত্তপ্ত ভয়াল। নিঃসীম এই মহামরুপ্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় উষ্ট্রারোহী যাযাবরের দল। কোনও-কোনও দল হয়তো পশু পালক বা ব্যবসায়ী। কিন্তু অনেকেই হিংস্র নির্মম দস্যু। মরুযাত্রীদের সর্বস্ব লুঠতরাজ করে, নির্বিচারে খুন করে তারা মিলিয়ে যায় সীমাহীন মরুর বুকে। এক কথায় সাহারা নির্মম ভয়ংকর।

আঃ! কথাটা ভাবতেও সারা দেহ যেন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। ভয়াল বিপদসংকুল এমন অভিযানের সুযোগ কখনই ছাড়া যায় না। এমন সুযোগ জীবনে দুবার আসে কিনা সন্দেহ। অতএব অভিযানে যাতে স্থান পাই, তার জন্যে এখুনি উঠে পড়ে লাগতে হবে।

সেইসঙ্গে সাহারা সম্বন্ধে নিজেকে তৈরি করাও দরকার। কাণ্ডজ্ঞান বাড়ানোর জন্য ও সম্পর্কে খবরাখবর পড়াশুনোর ব্যাপারাটাও ইত্যবসরে যতদূর সম্ভব সেরে ফেলতে হবে। দুর্দান্ত শীতের দেশ এই কানাডায় বসে দুর্দান্ত গরমের দেশ সাহারা মরুভূমি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা পড়াশুনো ব্যাপারটা ভাবতেও বেশ মজা লাগে। দেখা যাক।

॥ দুই ॥

সেদিন অপরাহ্ন বেলা। অফিসের কাজকর্ম শেষে উঠবো-উঠবো করছি, হঠাৎ দাপাতে দাপাতে ঝড়ের বেগে কামরায় ঢুকলো রবার্ট। লাল মুখ আরো লাল হয়ে উঠেছে।

এক পলক তাকিয়েই বুঝলাম ঝড় আসন্ন।

কিছুমাত্র ভূমিকা না করে সে গর্জে উঠলো,—কী ব্যাপার, অ্যাঁ?

নিপাট ভালোমানুষের মতো চোখ বড়-বড় করে শুধোই,—কিসের?

কিচ্ছু জানো না, তাই না, ধেড়ে শয়তান কোথাকার?— উত্তেজনায় রবার্টের মুখ আরও লাল হয়ে ওঠে ঃ ওই যে—ওই যে—কী যেন নাম—দুচ্ছাই কী যেন নাম ওই পচা নরকটা, যেখানে যাবার জন্য নাম পাঠিয়েছ—কী নাম তো?

এই হলো আমাদের রবার্ট, উত্তেজিত হলে সব গোলমাল করে ফেলে। যত রাগে, ততই গুলিয়ে যায় সব। পরিস্থিতি ঘোরালো দেখলে, ওর উত্তেজনায় ইন্ধন যোগানই হয় আমার একমাত্র লক্ষ্য। ব্যস, তা হলেই কাম ফতে—তখনকার মতো বাঁচোয়া।

গোবেচারার মতো মুখ করে আমি পিটপিট করে তাকিয়ে থাকি।

আরো চটে ওঠে রবার্ট,—কী, নিরেট হাবার মতো তাকিয়ে আছ যে? জায়গাটার নাম বলতে পারছো না? ওই যে ওই নরকটা, সেখানে যাবার জন্যে নাম লিখিয়েছ কেন, ধড়িবাজ?

বোকা-বোকা মুখে আমি শুধোই,—ওঃ, তাই বলো! তুমি বোধহয় অ্যালজিরিয়ার কথা জিজ্ঞেস করছো, তাই না?

ক্-কী! আবার চালাকি? —নিজের বাঁ তালুতে ডান হাতের ঘুষি মারে রবার্ট, আগুনে পোড়া ওই যে দেশটা—ওই যে মরুভূমিটা—বাপের জন্মে শুনিনি, কী নাম যেন ওটার? তা, ওই নরকে গিয়ে মরার বাসনা কি জন্যে হলো? আর জায়গা পেলে না?

ওঃ, বুঝেছি, বুঝেছি! —নির্বিকার কণ্ঠে আমি বললাম, তুমি সাহারা মরুভূমির কথা বলছো? ভারি চমৎকার জায়গা। তা, দাঁড়িয়ে কেন? বসো না।

ক্-ক-কী ব্-বললে, গেছো হনুমান?—রবার্ট তোতলাতে শুরু করে ঃ তুৎ-তুমি ওখানে গেছো কখনও?

আমার মুখে ক্ষণিক করুণার হাসি ফুটে ওঠে। নিরীহ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি,—তুমি গেছো?

ব্যস, বোমা ফাটলো। একে আমার ওই করুণার হাসি রবার্টের চক্ষের বিষ, তার ওপর কিনা ওই প্রশ্ন। মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটলো।

দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা! বাপীকে বলে ওই নরকে যাবার সাধ তোমার মেটাচ্ছি! —বলতে-বলতে আবার সেই ঝড়ের বেগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রবার্ট।

আর আমি। ঠায় বসে থাকি অফিসে নিজের কামরায়। একলা নিঃসঙ্গ। মন উত্তাল হয়ে উঠেছে...

মেলস্যাম সাহেব ও রবার্টের, বিশেষ করে রবার্টের ভালোবাসা আমায় যে কিভাবে বেঁধেছে তা বলে বোঝানো যাবে না। মহাবিত্তশালী পরিবারের একমাত্র সন্তান, আদরের দুলাল সে। তাই বিপদআপদের সম্ভাবনা যেখানে গুরুতর, সেখানে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। রবার্টের মনও গড়ে উঠেছে সেইভাবে। সে চায় আমাকেও সেইভাবে আগলে রাখতে।

কিন্তু তা হয় কি করে?

রবার্টের সঙ্গে আমার জীবনের মিল কোথায়? একটাই মাত্র মিল। তা হলো, রবার্টের মতো আমিও মা-বাবার একমাত্র সন্তান। কিন্তু তার পর?

যে জন্মঅভাগা বাল্যেই মা-বাবাকে হারায়, সচ্ছল জীবন থেকে মুহূর্তে পিছলে গিয়ে পড়ে চরম অভাব-অনটনের মধ্যে, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যে কেটেছে যার বাল্য ও কৈশোর, যার শিক্ষাজীবন নির্ভর করেছে অন্যের মমতা ও করুণার ওপর এবং সর্বোপরি বিধাতা যার ললাটে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন অশান্ত অনিশ্চিত মুসাফিরের বা ভবঘুরের জীবন, রবার্টের মতো শান্ত নিশ্চিন্ত গৃহকোণের অবকাশ কোথায় তার?

তবু একটা কথা আমি কখনই ভুলতে পারি নে। দেশে দেশে ঘোরার, দুর্গম বন্ধুর পথ-পরিক্রমার যে স্বপ্নসাধ অর্থাৎ ভবঘুরে জীবনের যে দুর্নিবার আর্কষণ আমায় কখনই স্থির থাকতে দেয় নি, তা কতটুকু পূরণ হতো বলা কঠিন, যদি মেলস্যাম সাহেব ও রবার্টের সঙ্গে হঠাৎ পরিচয় না ঘটতো।

পেছন দিকে জীবনের সেই অতীত অধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে ভাবতেও আজ অবাক লাগে। যেমন অদ্ভুত, তেমনি আকস্মিক সে যোগাযোগ। আমি তখন কলকাতার কলেজে পড়ি, বি.এস-সি ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। ওঁরা দুজন—বাবা ও ছেলে—ব্যবসা উপলক্ষে ভারত ভ্রমণ করতে-করতে কলকাতায় এসেছেন। ঘটনাচক্রে তখন সুন্দরবন অঞ্চলে ওঁদের সঙ্গে ঘটে পরিচয়। আমার মধ্যে ওঁরা কী দেখেছিলেন, ওঁরাই জানেন। পরিচয় ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় পরিণত হতে বেশি দিন লাগে নি। নিবিড় বন্ধুত্ব জন্মাল রবার্টের সঙ্গে, আন্তরিক ভালোবাসা পেলাম মেলস্যাম সাহেবের কাছে থেকে। তারপর তাঁদেরই আগ্রহাতিশয্যে, চেষ্টা ও ব্যবস্থাপনায় গোপনে একদিন আমি দেশ ত্যাগ করলাম, পাড়ি জমালাম কানাডার উদ্দেশ্যে। বি.এস-সি পরীক্ষাটা অবিশ্যি দিয়েই এসেছিলাম।

তারপর দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের পর দেশে চিঠি লিখলাম কুনালের কাছে।

কুনাল!

স্মৃতির সুমদ্র মুহূর্তে উত্তাল হয়ে ওঠে। বেদনামধুর অতীত আমাকে যেন অস্থির করে তুললো...

কুনাল! কতকাল দেখিনি কুনালকে। তার কথা মনে হলে কী এক অব্যক্ত তীব্র ব্যথায় বুক আজো মোচড় দিয়ে ওঠে। অভিন্নহৃদয় প্রাণের বন্ধু বলো আর সহোদরই বলো, কুনালই ছিল আমার সব।

দূরের এক জেলা থেকে এসে কুনালদের ইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে আমি ভর্তি হই। ওখানেই আমার মামাবাড়ি। মা-বাবার আমি ছিলাম একমাত্র সন্তান —আদরের দুলাল, নয়নের মণি। হঠাৎ কয়েক দিনের ব্যবধানে মা-বাবাকে হারালাম কালান্তক রোগে। বাবা ছিলেন লম্বাচওড়া জোয়ান ও নামকরা শিকারী। দেশে তাঁর জমিজমা প্রভাবপ্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। কিন্তু তাঁরা চোখ বুজতেই আলেয়ার মতো কোথায় উবে গেল সবকিছু। অনাথ বালকটি এসে দুঃস্থ মামার ঘাড়ে চাপলো। নিদারুণ অভাব-অনটনের সংসারে সে হয়ে দাঁড়াল এক অবাঞ্ছিত বোঝা। মামির গঞ্জনা ছিল তার জীবনের নিত্য সঙ্গী। সংসারের যাবতীয় ফাইফরমাশ, চার মামাতো ছোট ভাইবোনের তদ্বির-তদারক ইত্যাদি সেরে তবেই তার পড়ার অবসর জুটতো। ইস্কুলে সে পেয়েছিল হাফ-ফ্রিশিপ।

মামাবাড়ি এসে পঞ্চম শ্রেণীতেই পরিচয় হয় আমার কুনালের সঙ্গে। অল্পদিনের মধ্যে সে পরিচয় ঘনিষ্ঠতার এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছোয় যে, সবাই জানতো, যেখানে কুনাল

সেখানেই রঞ্জন অথবা যেখানে রঞ্জন, সেখানেই কুনাল। দেশ ত্যাগের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই ছিল অবস্থা।

কিন্তু শুধুই কি কুনাল? কুনালের বাবা-মা অর্থাৎ কাকাবাবু-কাকিমা? এতদিন তাঁদের ছিল এক ছেলে এক মেয়ে—কুনাল ও মঞ্জু। আমি হয়ে দাঁড়ালাম আর এক ছেলে। অনেক দিন পরে আমার কাঙাল মন আবার পেলো মা-বাবার স্নেহের আস্বাদ, পেলো ভাইবোনের ভালোবাসা।

হ্যাঁ, মঞ্জু! মঞ্জুর আমি ছিলাম আর এক দাদা—সোনাদা। আঃ, মঞ্জু আজ কত বড় হলো? প্রতিদিন সকালে বিকেলে আমায় না দেখলে তার সে কি অভিমান! কুনাল ও আমি একই বয়সী—হয়তো দু-এক মাসের ছোট-বড় হবো। যখন দেশ ত্যাগ করি, মঞ্জু তখন তেরো বছরের কিশোরী। এখন প্রায় অষ্টাদশী। কলেজে পড়ে। আমার স্মৃতি তার মনে ফিকে হয়ে যাবার কথা। কিন্তু পরে সে ভুল আমার ভেঙেছে।

কিন্তু শুধুই কি কুনাল, মঞ্জু আর কাকাবাবু-কাকিমা? আমার জন্য রবার্টের দুশ্চিন্তা ও মর্মবেদনায় মন আজ হঠাৎ অশান্ত উদ্বেল হয়ে উঠেছে। জীবনের পাতাগুলো খুলে যাচ্ছে পেছন দিকে একের পর এক...

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সৌম্য শান্ত সেই আত্মভোলা মানুষটিকে। আমাদের ইস্কুলের তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডস্যার। অমনি ঋষিপ্রতিম শিক্ষাগুরু পাওয়া জীবনের এক দুর্লভ সৌভাগ্য। অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার পর সামান্য এক ঘটনায় হঠাৎ তাঁর নজর পড়ে আমার ওপর। শুরু হয় তাঁর নিঃস্বার্থ শিক্ষাদান—আমার জীবনকে নতুন ভাবে গড়ে তোলার নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। তার ফলে ইস্কুলের নবম দশম শ্রেণীর বার্ষিক ও টেস্ট পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর পেয়ে আমি প্রথম হলাম। তারপর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফল বেরোলে, শুধু ইস্কুলে নয় সারা এলাকায় তুমুল সাড়া পড়ে গেল। কারণ ও এলাকায় তো দূরের কথা, সে জেলায় সেই প্রথম ওই ইস্কুলের একজন ছাত্র রঞ্জনকুমার চৌধুরী অর্থাৎ আমি প্রথম দশজনের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছি। এ সবই তো ওই পরমারাধ্য দরিদ্র শিক্ষাগুরুর অবদান। জ্ঞানস্পৃহা ও মনুষ্যত্বের যে পাঠ সেদিন তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম, আমার জীবনে তা অক্ষয় হয়ে আছে।

এর পর কলেজ-জীবন। শুধু স্কলারশিপের টাকায় কলকাতায় থেকে পড়াশুনো সম্ভব নয়। পিতৃপ্রতিম কাকাবাবু এবার দায়িত্ব নিলেন। কুনাল ও আমি কলকাতায় মেসে থেকে কলেজে ভর্তি হলাম।

কুনালের সঙ্গে যে বন্ধন, তা আত্মার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন—চিরকালের আর মঞ্জুর সঙ্গে?...

আর কাকাবাবু, কাকিমা ও অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডস্যার—আমার মনের আকাশে ওঁরা চিরভাস্বর তিনটি নিষ্কম্প ধ্রুবতারা যেন।

বেচারা রবার্ট! কী করে সে জানবে, শুধু একমাত্র পথের টানে কী অপার্থিব সম্পদ, কী স্বর্গীয় স্নেহ-ভালোবাসা পেছনে ফেলে আমি চলে এসেছি!

তাই তো গোপনে আমাকে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছিল। তবু সে বন্ধন কি বললেই ছেঁড়া যায়! বিমানে প্রায় সারা পথ আমায় চোখে রুমাল চেপে কাটাতে হয়েছিল। তার পরেও বা কি অবস্থা! নতুন দেশ, কত কাজ, কত সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু কোথায় স্বস্তি? দিনরাত মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি পেছনে যাদের ফেলে এসেছি। আর কাঁদছি। চিঠি লিখতে পারতাম না। চোখের জলে সব ভেসে যেত।

শেষ পর্যন্ত মন শক্ত করে ডুব দিই একসময় কাজের মধ্যে। সেই সঙ্গে মনপ্রাণ ঢেলে দিই চিরপ্রণম্য শিক্ষাগুরুর আদর্শকে অনির্বাণ রাখার কাজে। এ দেশে পড়াশুনো ও গবেষণার এত সুযোগ যে, আমাদের পক্ষে তা কল্পনারও অতীত।

ইতিমধ্যে দূর-দূর সমুদ্রে ও দেশ-দেশান্তরে যাবার সুযোগ পেলেই আমি ছাড়ছি না। পৃথিবীর সর্বোত্তরে, তার একেবারে মাথায় হিমশীতল যে উত্তর মেরু বা সুমেরু রাজ্য, সেখানে বছর খানেকের জন্যে অভিযানে পাঠানোর পরিকল্পনা নেয় কোম্পানি। খবর পেয়েই আমি সামনের সারিতে গিয়ে দাঁড়াই। তখন কিন্তু রবার্ট আজকের মতো এভাবে বাধা দেয়নি। কারণ বোধহয়—নিজে সে শীতের দেশের মানুষ, তার ওপর সুমেরু এলাকা সম্বন্ধে জানতোও কিছু কিছু। তাই বিশেষ দুশ্চিন্তা বোধ করেননি।

সত্যি, বিশ্বপ্রকৃতির এবং সেইসঙ্গে বিজ্ঞানেরও এক মহাবিস্ময়কর মহাবিশাল কামারশালা ওই সুমেরুরাজ্য। সেখানে যে অভিজ্ঞতা লাভ করি, তা এক কথায় অনির্বচনীয়—যেমন বিচিত্র ভয়াল, তেমনি মধুর সুন্দর। সে অভিযানে আমার কার্যকলাপ পরবর্তীকালে বিরাট আশীর্বাদ হয়ে এসেছে আমার কর্মজীবনে।

এমনি করে কেটে যায় বহুদিন। তত দিনে স্বভাবতই কালের স্পর্শে অনেকটা সয়ে এসেছে বিচ্ছেদের বেদনা। প্রলেপ পড়েছে ক্ষতের ওপর। শেষে পত্র লিখলাম কুনালকে। লিখলাম রবার্টদের কথা, গোপনে দেশ ত্যাগের ঘটনা, চিঠি না দেবার কারণ এবং সংক্ষেপে আমার বর্তমান জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা।

দ্রুত জবাব এল কুনালের কাছ থেকে। সে কী চিঠি—আগাগোড়া যেন জমাটবাঁধা কান্না! অনেক দিন পরে আমাকেও আবার কাঁদতে হলো।

জানলাম, আমাকে হারিয়ে কুনাল আর পড়েনি, বি.এ পাস করে চাকরি করছে। আমার আকস্মিক বিচ্ছেদব্যথায় সবচেয়ে বিপর্যস্ত হয়েছিল সে আর মঞ্জু। কাকিমা-কাকাবাবু নীরবে সয়েছেন সে ব্যথা। আড়ালে কাকাবাবু চোখের জল মুছতেন।

আর অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডস্যার। কুনালরা সেই প্রথম জানালো, তিনি আমায় ভালোবেসেছিলেন নিজের ছেলের মতো। তাঁর ছেলে নেই, তিন মেয়ে। শিক্ষকতা থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন। বয়স্কা তিন অনূঢ়া মেয়ে নিয়ে পাঁচজনের সংসার-রথ তাঁর একেবারেই অচল। সে দৈন্য চোখে দেখা যায় না। আর মামার সংসারে অভাব-অনটন তো আছেই।

কুনালের ওই পত্রেই জানতে পারি, বি.এস-সি অনার্স পরীক্ষায় আমি ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড হয়েছিলাম। তার গুরুত্ব অবিশ্যি বর্তমানে আমার জীবনে আর নেই।

আজ আমার যে মাসিক রোজগার, ভারতের সবচেয়ে উচ্চপদস্থ ও সবচেয়ে বেশি রোজগেরে চাকুরের কাছেও তা স্বপ্নের অতীত। একা মানুষ আমি। তাই প্রায় সব টাকাই ব্যাঙ্কে জমা পড়ে।

কুনালের চিঠি পেয়েই কর্তব্য স্থির করতে দেরি হলো না। কাকাবাবু-কাকিমা এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডস্যারের ঋণ কখনই শোধ করার নয়। তবু আর্থিক দিক থেকে কিছুটা স্বস্তি যদি তাঁদের দিতে পারি, সেটাই হবে আমার সবচেয়ে বড় লাভ আর আনন্দ। শিক্ষাগুরুর তিন মেয়ে তো আমারও ভগিনীস্থানীয়া, তাদের যাতে খুব ভালো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয় তার যাবতীয় আর্থিক দায়দায়িত্ব আমিই নেবো, সেইসঙ্গে স্থির করলাম, এখন থেকে নিয়মিত বহন করবো স্যারের সাংসারিক ব্যয়ভারও।

সেইমতো চিঠি লিখলাম কুনালকে। কিন্তু চাওয়ামাত্রই কি সব হয়ে যায়! বরেণ্য

বৃদ্ধ মানুষটির আত্মসম্মানবোধ কী তীব্র, তা আবার নতুন করে জানলাম। আমার এ প্রস্তাবে তিনি রাজি হলেন না। কুনাল, কাকাবাবু ও অন্যান্যদের সবরকমের অনুরোধ-উপরোধই ব্যর্থ হলো। শেষ পর্যন্ত আমিই সরাসরি পত্র লিখলাম তাঁর কাছে। মোক্ষম পত্র। কুনালের পত্রে জেনেছি, আমার চিঠিখানা সামনে রেখে স্যার হেঁটমাথায় বসে ছিলেন বহুক্ষণ। পরে দেখা গেছে, জলে ভিজে সেখানা প্রায় অপাঠ্য দুর্বোধ্য হয়ে গেছে।

যাই হোক, স্যারের তিন মেয়ের খুব ভালো ঘরে বিয়ে হয়ে গেছে, এবং শেষ জীবনে তিনি যে কিছুটা স্বস্তি বোধ করছেন, এর চেয়ে বড় আনন্দ আমার আর নেই। মামার সংসারেও এসেছে সচ্ছলতা। কিন্তু কাকাবাবুর ব্যাপারটা কী? কুনাল লিখেছিল, তিনি বলেছেন, ছেলের রোজগারের টাকা নিতে আপত্তি কোথায়? দরকার হোক, তখন নেওয়া যাবে। তবু আমি টাকা পাঠাই। সে টাকার কী গতি হয়? কুনাল লিখেছিল দেশে গেলে নাকি জানতে পারবো। কে জানে, কি ব্যাপার।

আর এক বিচিত্র খবর। কুনালের কাছে এক চিঠিতে মঞ্জুর খবর জানতে চেয়েছিলাম। উত্তরে সে এক অদ্ভুত কথা লিখেছিল। সোনাদা অর্থাৎ আমি নাকি মঞ্জুর জীবনের আদর্শ। আমারই মতো পড়াশুনো ছাড়াও নাকি সে নিয়মিত শরীরচর্চা করে, লাঠিখেলা ছোরাখেলা ইত্যাদি শেখে। তা ছাড়া পড়ে দেশবিদেশ সংক্রান্ত বই, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি। অপ্রত্যাশিত এ সংবাদ আমাকে বোবা করে দিয়েছিল...

স্মৃতির সমুদ্রে আমি সাঁতার কেটে চলেছি এমনিভাবে। একাগ্র তন্ময়। ঘুরছি অতীত জীবনে... কত মুখ কত ঘটনা, কত কথা—সব জীবন্ত।

হঠাৎ গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং ঘণ্টাধ্বনি কানে যেতেই চমকে উঠলাম, ধরমড় করে উঠে বসলাম। হাতঘড়ির দিকে নজর পড়তেই লাফিয়ে উঠে পড়লাম চেয়ার ছেড়ে। অফিস নিস্তব্ধ। নিজের চেম্বারে আমি একা। বাইরে আর্দালির গলা-খাকানি কানে এল। ইহ, বেচারি!

॥ তিন ॥

অফিসে কাজে ব্যস্ত। বিভিন্ন বিভাগীয় ফাইলের পাহাড় প্রায় কাবার করে এনেছি। হঠাৎ মেলস্যাম সাহেবের কাছ থেকে ডাক এল। তলবটা একটু জরুরি। অতএব উঠতে হয় তখুনি।

সাহেবের চেম্বারে ঢুকতেই ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ আঁচ করা গেল। তার সামনের চেয়ারে রবার্ট বসে আছে।

সাহেবের ইঙ্গিতে চেয়ার টেনে রবার্টের পাশেই বসে পড়ি।

কাজকর্মের দু-চারটে মামুলি কথাবার্তার পর মেলস্যাম সাহেব আসল কথায় এলেন। জিজ্ঞেস করলেন,—রবার্টের কাছে শুনলাম তুমি নাকি সাহারা অভিযানে যোগ দেবার জন্যে নির্বাচন কমিটির কাছে নাম পাঠিয়েছ?

একটু মাথা হেঁট করে সবিনয়ে বললাম,—হ্যাঁ।

—কিন্তু সাহারা সম্বন্ধে কি জানো কিছু, নাকি শুধু হুজুগে ও উত্তেজনার বশে নাম দিয়েছ? সাহারা কিন্তু সুমেরুরাজ্য নয়, ঠিক তার বিপরীত। ধু ধু-করা সীমাহীন বালি ও পাথরের এক মহাসমুদ্র বলা যায়। প্রচণ্ড গরম—নিষ্প্রাণ—সাংঘাতিক শুকনো—জলের অভাব নিদারুণ। তা ছাড়া অন্যান্য বিপদআপদও খুব। এসব জান?

হ্যাঁ। —আবার ঘাড় কাত করে জানাই।

সে কী!—মেলস্যাম সাহেবের বিস্মিত প্রশ্ন, কি করে কোথা থেকে জানলে?

—সাহারা সমেত পৃথিবীর মরুভূমিগুলো সম্বন্ধে ইতিমধ্যে খানকয়েক নির্ভরযোগ্য বই পড়ে ফেলেছি। এখনও পড়ছি। কোথাও কোনও অভিযানে যেতে হলে, সে সম্পর্কে যতদূর সম্ভব ভালোভাবে না জেনে এবং তৈরি না হয়ে যাওয়া অনুচিত বলে আমার ধারণা।

সাহেবের মুখে কথা নেই। চোখে সপ্রশংস দৃষ্টি। আমি চোখ নামিয়ে নি। পরে তিনি সস্নেহে বললেন, অনেকটা স্বগতোক্তির মতো,—অদ্ভুত! এর মধ্যেই পড়ে ফেলেছ? এখনও পড়ছো? কলকাতায় পরিচয় হবার পরই মনে হয়েছিল আলাদা বিশেষ ধাতুতে গড়া। চিনতে মোটেই ভুল হয়নি।

বলতে-বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে আসে, ক্ষণেক থেমে জিজ্ঞেস করেন,—আচ্ছা বাবা, সাহারা কী মহাভয়ংকর, কড় সাংঘাতিক জায়গা, কতরকমের বিপদআপদ সেখানে, সে-সব তুমি নিশ্চয়ই পড়েছ? সে-সব জেনেও সেখানে যাবার তোমার কেন এত আগ্রহ?

কয়েক মুহূর্ত আমাকে চুপ করে থাকতে হয়। তারপর সংযত কণ্ঠে বলি,—দেশ দেখার নেশা কি দুর্নিবার আমার মধ্যে, সে সম্বন্ধে আপনারা বোধহয় কিছু কিছু শুনেছেন আমার কাছ থেকে। যে জায়গা যত বেশি দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল, সেখানে যাবার আগ্রহ তত বেশি অদম্য হয়ে ওঠে আমার মধ্যে। শিরায় শিরায় রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে থাকে। তাই বলে আমি নির্বোধ গোঁয়ার বা মাথাপাগলা কিনা, সেটা অবিশ্যি আপনারাই বিচার করবেন।

না না, তুমি কক্ষনও তা নও। —মুগ্ধ কণ্ঠে বলেন মেলস্যাম সাহেব ঃ সব জেনেশুনে তুমি যখন স্বেচ্ছায়—

রবার্ট এবার বাধা দিলে। করুণ কণ্ঠে বললে,—বাপী, আমার একান্ত অনুরোধ, রঞ্জুকে ও নরকে যেতে দিও না। ও বড় সাংঘাতিক জায়গা।

কয়েক লহমা কী যেন ভাবেন মেলস্যাম সাহেব। তারপর ধীরকণ্ঠে বললেন,—বন্ধুর বিপদের আশঙ্কায় তোমার মানসিক উদ্বেগ বুঝতে পারছি, বাবা। কিন্তু বিপদ কোথায় নেই, বলো তো? রাস্তায় চলতে গিয়েও তো কত গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটছে। জীবনে আমিও তো কম বিপদআপদ পার হই নি। সবচেয়ে বড় কথা হলো সবসময় সতর্ক থাকা, হুঁশিয়ার থাকা। কারণ সাবধানের মার নেই। সাহারা খুব দুর্গম ভয়ংকর, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে একেবারে জনশূন্যও তো নয়। উপরন্তু আমার স্বভাব তো জানো? কারও ইচ্ছা বা আগ্রহ যদি ন্যায় সঙ্গত এবং বাস্তব-বিচার-বুদ্ধিসম্মত হয়, আমি তাতে বাধা দিতে পারি নে।

সঙ্গে-সঙ্গে রবার্ট হঠাৎ দুম করে বলে বসলো,—আচ্ছা, যদি যেতে চাই, তুমি সম্মতি দেবে?

আমি জোর চমকে উঠলাম,—এ কী! এঁড়ে ছাগলটা বলে কী? ও যাবে সাহারায়! মরেছে!

সেইসঙ্গে সন্ত্রস্তও ঃ শেষে কি আমাকে নিয়ে বাবা-ছেলের বিরোধ ঘটবে? তা হলে যত কষ্টই হোক, এখানকার পাট চুকিয়ে আমাকে পালাতে হবে।

না, সেসব কিছুই ঘটলো না। এই হলেন মিঃ মেলস্যাম, সুধার বুদ্ধির মালিক। পরিস্থিতি যত ঘোরালোই হোক, তা সামাল দেবার এবং লোকচরিত্র বোঝার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ।

নীরবে কিছুক্ষণ তিনি সোজা তাকিয়ে থাকেন ছেলের মুখের দিকে। শেষে হেসে বললেন,—তুমি সাবালক, রঞ্জুর মতো পড়াশুনো করে, বাস্তব বুদ্ধিতে সবদিক ঠিকমতো যাচাই করে যদি ওখানে যাবার সিদ্ধান্ত করো, তা হলে বাধা দেবার প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়াও কথা আছে। শুধু পড়াশুনো, কাণ্ডজ্ঞান থাকলেই এসব দুরূহ অভিযানে যাওয়া যায় না। দরকার হলে প্রচণ্ড দৈহিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করার মতো মনের জোর আছে কিনা, সেটাও অন্যতম বিচার্য বিষয়। সে জাতীয় মানসিকতা ও সহ্যশক্তি তোমার আছে কিনা, নির্বাচন কমিটি তা ভালোভাবে বিচার করে দেখবে।

রবার্ট নির্বাক। কী ভাবছে হতভাগাটা, কে জানে! নত মস্তকে আমি বসে আছি।

আবার শোনা গেল মেলস্যাম সাহেবের গম্ভীর কণ্ঠ,—সে বিচারের পদ্ধতিটাও শুনে রাখো। এ অভিযানে যাবার জন্যে কেউ নাম লেখালেই যে, তাতে নির্বাচিত হবে, তা মোটেও নয়। তার আগে তাকে বেশ কয়েকটা গুরুতর পরীক্ষার গণ্ডি পেরোতে হবে। এজন্য আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের দুটি মরুভূমি নির্বাচন করা হয়েছে। যারা নাম লিখিয়েছে, তাদের সবাইকে সেখানে পাঠানো হবে। সেখানে নানা ধরনের কঠিন পরীক্ষায় যারা সবচেয়ে ভালোভাবে উতরোবে, সাহারা অভিযানে তারাই পাবে অগ্রাধিকার।

গলার নেকটাইটা রবার্ট ইতিমধ্যে বেশ একটু আলগা করে ফেলেছে। বুঝলাম, ওষুধ ধরেছে। কিন্তু ওর যা স্বভাব—ভাঙে তো, সহজে মচকায় না।

একটু কেশে শুকনো গলায় সে জিজ্ঞেস করলে,—যুক্তরাষ্ট্রে মরুভূমি আছে নাকি? জানতাম না তো! কোন-কোন মরুভূমি নির্বাচন করা হয়েছে?

চূড়ান্তভাবে এখনও তা ঠিক হয়নি। —নিরুত্তাপ কণ্ঠ মেলস্যাম সাহেবের, তবে যে দুটো মরুভূমির কথা মোটামুটি ভাবা হয়েছে, তারা হলো সনোর‍্যান মরুভূমি এবং ডেথ ভ্যালি।

আড়চোখে আমি রবার্টের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। অভিযানে যাবার ইচ্ছেটা মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়ায় কতখানি মনস্তাপে সে ভুগছে, তা বোঝার চেষ্টা করছি। শেষের মরুভূমিটার নাম কানে যেতেই সে যেন ধাক্কা খেলো, পলকে মুখের রঙ তার পানসে হয়ে যায়। রক্তের চাপও হয়তো অনেকখানি নেমে গেছে।

এক হ্যাঁচকায় গলার টাইটা প্রায় খুলে ফেলে রবার্ট কোঁ-কোঁ করে উঠলো,—কী বললে? ডে-থ—ভ্যা-লি—! ইহ, কী বিশ্রী নাম! আর নাম পেলে না!

একটু দম নিয়ে পরক্ষণে সে ফিরলো আমার দিকে, যেন ভেংচে উঠলো,—কী, কিছু বুঝতে পারছো হনুমান? ওখানে গেলে আর আস্ত ফিরতে হবে না, সাহারা তো দূরস্থান। ইহ, ডেথ ভ্যালি—কী সাংঘাতিক জায়গা।

পরীক্ষার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের মরুভূমিতে যাওয়ার সুযোগ মিলবে শোনার পর থেকে, মন আমার সাহিত্যিক ভাষায় যাকে বলে—আনন্দে তা থৈ নৃত্য শুরু করেছে। সাহারা নির্ঘাত ভারি পয়মন্ত জায়গা। তার দৌলতেই তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মরুভূমি-ভ্রমণটাও জুটে গেল।

রবার্টের অবস্থা মেলস্যাম সাহেবেরও বুঝতে দেরি হয়নি। তাঁর মুখের ওপর দিয়ে ক্ষণেকের জন্যে অতি ক্ষীণ এক হাসির ঝিলিক খেলে গেল। সহজকণ্ঠে বললেন,—নামে কি কিছু বোঝা যায়, বাবা? বাস্তব অবস্থাটাই তো আসল।

কথাটা সার্থক। কিন্তু রবার্টের তখন যা অবস্থা, বাবার এই কথা শুনেই বুদ্ধির বাকিটুকুও তার আমসি হয়ে গেল।

দ্বি তী য় অ ধ্যা য়

॥ এক ॥

যা শুনেছি, তাতে গালে মাছি যাবার যোগাড়। আমার মতো গরিব দেশের মানুষ তা ভাবতেও পারে কখনও?

সে এক এলাহি ব্যাপার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মরুভূমিতে পাঠানো হচ্ছে নাকি বিরাট এক দল। তার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ্, ডাক্তার প্রভৃতি যেমন আছেন, তেমনি আছেন সামরিক বিভাগের লোকজনও।

সাহারা অভিযানে স্থান পাবার জন্যে যে বহুজনই উদ্‌গ্রীব, সে কথা গোড়া থেকেই কানে আসছিল। কিন্তু এরকম ব্যয়বহুল কষ্টসাধ্য দুর্গম অভিযানে শুধু দল ভারী করার জন্য যে অপ্রয়োজনীয় লোক নেওয়া চলতে পারে না, তা বুঝতে বিশেষ বুদ্ধির দরকার হয় না।

কথাটা যত ভাবছি, নিজের আতঙ্ক ততই বাড়ছে ঃ শেষ পর্যন্ত আমাকেও ওই অপ্রয়োজনীয় দলে ফেলবে না তো?

আশঙ্কাটাও দিনরাত খচ্‌খচ করে বিঁধছে—বিশেষ করে বিঁধছে রবার্টটার ভাবভঙ্গি দেখে। গাড়োলটা আমার সাহারা অভিযানে যাওয়ার কিরকম বিরোধী, তা তো আর জানতে বাকি নেই। মেলস্যাম সাহেবের সঙ্গে সেই মোলাকাতের পর থেকে ও যেরকম গম্ভীর হয়ে গেছে, তা কহতব্য নয়। আমাকে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে। যত স্বাভাবিকভাবেই আমি কথা বলি না কেন, সে কিন্তু নিজের কোট ঠিকই বজায় রেখে চলেছে। প্রয়োজনের বাইরে বাক্যব্যয় করাটা—বিশেষত আমার সঙ্গে—তার কুষ্ঠি থেকে যেন বেআইনি হয়ে গেছে।

তাই তো আতঙ্কে ভুগছি। নচ্ছারটা কোনও ধাস্টামো করছে না তো? লিস্ট থেকে আমার নামটা খারিজ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে নাকি?

অতএব নির্বাচিতদের তালিকা বেরিয়েছে শুনেই উর্ধশ্বাসে দৌড়োলাম—অবিশ্যি পায়দলে নয়, গাড়িতে চেপে। পাগলের মতো নামগুলোর ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছি। তার পরেই—আঃ! আছে আছে! একাদশ স্থানে রয়েছে আর. কে. চৌধুরী অর্থাৎ রঞ্জনকুমার চোধুরী। অর্থাৎ আমার নাম।

এত দিনের দারুণ টেনশন বা উৎকণ্ঠার পর সে যে কী স্বস্তি! ইচ্ছে হলো দু-হাত তুলে একটু গৌরাঙ্গ নৃত্য করে নিই।

কিন্তু একি কাণ্ড! ১৫০ জনের লম্বা ফিরিস্তি? দেখে তো চোখ আমার ছানাবড়া। এত বড় দল অভিযানে যাবে নাকি?

নামের বড় একটা অংশই আমার কাছে অপরিচিত। গোপনে খবর নিয়ে জানলাম, তাদের অনেকেই সামরিক বিভাগের লোক।

মিলিটারি! খবরটায় ঘাবড়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কি? প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের খোঁজে কিনা সমর-বিভাগের লোক! আমরা দেশ জয় করতে যাচ্ছি নাকি?

মরুক গে—আদার ব্যাপারির জাহাজের খবরে কি কাজ!

যাই হোক, শেষে যাত্রার দিন এল। শুভদিন কিনা বলতে পারবো না। এরা অ্যালম্যান্যাক-ফ্যালম্যান্যাক বা পুঞ্জিকে-টঞ্জিকে দেখে দিনক্ষণ স্থির করে কিনা কিংবা সিদ্ধিদাতা গণেশের নামটাম নেয় কিনা, এখনও তা জানতে পারিনি।

আয়োজনের বিশালত্ব ও ব্যাপকতা দেখে আমার ট্যারা হবার মতো অবস্থা, বাক্‌স্ফূর্তি প্রায় লুপ্ত। তবে মনের ফূর্তি ঠিক আছে—দিনে-দিনে তা বাড়তির দিকে।

১৫০ জনের বিরাট দলই শুধু নয়, তার সঙ্গে যাচ্ছে যোগ্যতানির্ধারণ, পরিচালনা ও তদারকির জন্যে আর একটা বড় দল। সেইসঙ্গে তাঁবু-খাবারদাবারাদি থেকে শুরু করে কত রকমের জিনিস যে যাচ্ছে, তার হিসেব কে করবে—আদার ব্যাপারি তো নয়ই! পুরাকালের ভারতীয় রাজসূয় যজ্ঞ বোধহয় এর কাছে একদম বাচ্চা।

॥ দুই ॥

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজনা রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তীর্ণ সনোর‍্যান মরুভূমি। তার সবচেয়ে গরম, দুর্গম ও নিরিবিলি জায়গায় আমাদের তাঁবু পড়েছে।

আসার সময় রবার্ট বিমানবন্দরে এসেছিল বিদায় জানাতে। বিরস বদনে গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিল,—যাচ্ছো, যাও। অসুস্থ আধমরা হয়ে ফিরবে জানি। তার জন্যে সব কিছু নিয়ে আমি তৈরি হয়ে থাকবো।

রবার্টকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম,—ইস, কি আমার হিতৈষী বন্ধু রে!

তার পরেই তার গালে হঠাৎ এক চুমু খেয়ে আমি দৌড় দিলাম বিমানের দিকে। বিমানের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে দেখলাম, রবার্ট চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

সনোর‍্যানের ভূ-প্রকৃতি সর্বত্র একরকম নয়। কোথাও শুধু বালি, কোথাও বালি-কাঁকর মেশানো, কোথাও বা পাথুরে, কোথাও আবার ছোট-ছোট টিলা-ঢিবি-পাহাড়, পাথরের চাই, নুড়ি ইত্যাদি সমাকীর্ণ।

সমস্ত এলাকাটাই নির্জন। নিষ্প্রাণও বলা যায়। বর্হিদৃশ্যও তেমনি যৎপরোনাস্তি নিরানন্দময় কেমন যেন ফ্যাকাসে হলদে-পাংশুটে। সবুজ শ্যামলিমায় অভ্যস্ত চোখ হায়-হায় করতে থাকে। আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক, প্রচণ্ড গরমও তেমনি। নির্মেঘ আকাশ থেকে মার্তণ্ডদেবের নিষ্করুণ তাপে ঝলসে যাচ্ছে সবকিছু।

পৌঁছানোর দ্বিতীয় দিনেই বুঝলাম, ভীষণ কঠিন পাল্লায় পড়েছি আমরা, সম্ভাব্য সাহারা অভিযাত্রীরা। শারীরিক ও মানসিক সহ্যশক্তি পরীক্ষার যে ব্যবস্থা হয়েছে, তা এক কথায় সাংঘাতিক।

প্রথমেই আসে পানীয় জলের কথা। খুশিমতো জল খাওয়া একদম বন্ধ। জলের জোগান ভীষণভাবে নিয়ন্ত্রিত, দারুণ কড়াকড়ি সেখানে। প্রত্যেকের জন্যে দিনে রাতে জলের বরাদ্দ বাঁধা—বলা যায় ন্যূনতম। তারপর তেষ্টায় ছাতি ফেটে চৌচির হলেও, শত মাথা কোটো, এক ফোঁটা জল মিলবে না।

খাদ্যসরবরাহেও কড়াকড়ি কম নয়, তবে জলের মতো অত্যন্ত নির্মম নয়। অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্যই দেওয়া হয়, যদিও পরিমাণে বেশ কম।

ভোরে উঠে প্রথমেই হাজিরা দিতে হয় ক্যাম্প-অফিসের সামনে। রোল-কল বা নাম-ডাকা হয় সেখানে। প্রত্যেকের নামের পাশে সই-ঢেরা ইত্যাদি সারতে-সারতে সূর্য উঠে যায়। তারপর প্রাতরাশ সেরে নির্দিষ্ট পোশাক-টোশাক পরে, মাথায় চওড়া বেড় বা কানওলা ফেল্‌ট-টুপি চাপিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয় রুটিনবাঁধা কাজে। প্রচণ্ড রোদে দুঃসহ গরমে সিদ্ধ হতে হতে ঘুরতে হয় বিভিন্ন এলাকায়। মাটিপাথরাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রভৃতি-পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির কাজ চলে বেলা দুপুর পর্যন্ত। তারপর খাওয়া ও সামান্য বিশ্রাম। আবার শুরু হয় রুটিনমাফিক কাজ।

বিভিন্ন দিনে কাজের ধারা ও চরিত্র বদলায়। তবে সবই করতে হয় ওই খোলা

প্রান্তরে রোদে-ঝলসানো নিষ্করুণ ধোঁয়াটে আকাশের নিচে। সেইসঙ্গে নোটবইয়ে টুকতে হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা-পর্যবেক্ষণাদির ফলাফল এবং তার একটা কপি নিয়মিত দাখিল করতে হয় ক্যাম্প-অফিসে।

কানাডায় থাকতে এখানকার জীবনের কঠোরতা কল্পনায় আন্দাজ করার চেষ্টা করতাম যতদূর পারা যায়। জলপান ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তাই তৈরিও হচ্ছিলাম সাধ্যমতো।

কিন্তু কল্পনায় ও বাস্তবে ফারাক কী নিদারুণ, তা শীতের দেশ ছেড়ে এখানে আসার পর থেকে হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি বললেও বুঝি কম বলা হবে। সময়-সময় জলের পিপাসা অসহ্য হয়ে ওঠে। সে কী পিপাসা! মনে হয়, গলা-বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, মহাসাগরের জলও বুঝি একচুমুকে শুষে নিতে পারি। ভয় হয়, সর্দিগর্মিতে এবার নির্ঘাত মারা পড়বো।

কিন্তু তার পরেই মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে মহামরু সাহারা। মন শক্ত করি। নিজেকে বলি ঃ এই দুর্বল আয়েশি মন ও সহ্যশক্তি নিয়ে তুমি দুর্গম গিরি-কান্তার-মরুর পথে চলতে চাও, ঘুরতে চাও দুস্তর পারাবারে? ছিঃ!

এমনি করেই প্রথম দিকে আমায় লড়াই করতে হয়েছে ক্লান্তি ও অবসাদের বিরুদ্ধে। তারপর ধীরে-ধীরে সয়ে এসেছে সবকিছু। কথায় বলে, 'শরীরের নাম মহাশয়, যা সয়াবে তাই সয়'। কথাটার নায্যতা আমি নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি।

তবে এখানে দিনের বেলার অবস্থা যা বললাম, রাতে কিন্তু তা নয়। রাত সে তুলনায় যথেষ্ট আরামপ্রদ। দিন শেষ হতেই তাপমাত্রা তাড়াতাড়ি কমতে শুরু করে। দিনের বেলায় তাপমাত্রা যদি ১১৫-১৬ ডিগ্রি ফ্যারেনহাইট পর্যন্ত ওঠে, রাতে তা ৬০ ডিগ্রি পর্যন্ত কমে যেতে পারে। কাজেই ঘুমের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না।

এখানে তাঁবুতেই যে বাস, তা বোধহয় বলার দরকার করে না। প্রতি তাঁবুতে দুজনের আস্তানা। আমার যিনি তাঁবুসঙ্গী, প্রথম দিনই তাঁর পরিচয় জেনে ঘাবড়ে গেলাম। তিনি একজন জবরদস্ত সামরিক অফিসার—ব্রিগেইডিয়ার মিঃ ই. গর্ডন। সমর-বিভাগের ব্রিগেইডিয়ার পদটা খুবই উচ্চস্থানীয়—সর্বোচ্চ থেকে পঞ্চম। ভদ্রলোকের বয়েস, যতদূর মনে হয়, বছর চল্লিশেকের মতো হবে।

কাজেই সবদিক থেকে বিবেচনায় মুষড়ে না পড়ার সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। একে তীব্র জলকষ্ট, তায় প্রচণ্ড গরম, সেইসঙ্গে তপনদেবের নির্মম চোখরাঙানি, তার ওপর ঘরেও যদি পড়তে হয় রসকষহীন খটখটে জঙ্গী মেজাজের পাল্লায়, তা হলে অবস্থাটা কী দাঁড়ায়—জান কয়লা হতে কি আর কিছু বাকি থাকে?

অতএব মনস্তাপ ছাড়া গতি নেই। হুঁ, আগে থেকে যত তৈরিই হও না কেন, শেষ পর্যন্ত ওই কপাল! তাই আমারও, দেখছি, শেষকতক ওই ভাগ্যের খোঁয়াড়ে না ঢুকে উপায় নেই—তাবিচ-কবচ-মাদুলির শরণ নিতে হবে। তা নইলে, বদনসিব না হলে, এরকম দুর্ঘটনা, এমন কাটখোট্টা সঙ্গী জোটে কখনও?

কাজেই প্রথম থেকেই হুঁশিয়ার হলাম। কি জানি বাবা, মিলিটারি মেজাজ বলে কথা —কখন কেমন থাকে, কে জানে!

সেদিন সকালে ক্যান্টিনে চলেছি প্রাতরাশ সারতে। হঠাৎ পেছন থেকে ঘাড়ের ওপর পড়লো মস্ত এক থাবা আর সেইসঙ্গে ভরাট গলার 'হ্যালো মিঃ চৌধরী—'।

চমকে ফিরে দেখি ব্রিগেইডিয়ার মিঃ গর্ডন। সহাস্যে বলছেন,—তোমার ব্যাপারটা কি, বলো তো? তুমি কি মুখচোরা লাজুক? নাকি গোমড়ামুখো, বাতচিৎ একদম পছন্দ করো না?

বেশ একটু অবাক হয়ে আমতা-আমতা করে বললাম,—না, তা ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, বিগ্রেইড্—

সহাস্যে ধমকে উঠলেন ব্রিগেডিয়ার,—খবরদার, ব্রিগেইডিয়ার-ব্রিগেইডিয়ার করবে না! সেরেফ মিঃ গর্ডন, এমন কি শুধু গর্ডন বললেও আপত্তি নেই। আমরা এখানে বন্ধু, একসঙ্গে পরীক্ষা দিতে এসেছি। আমি কি তাহলে তোমাকে ডক্টর চৌধরী বলবো? তার সঙ্গে যোগ করবো ইঞ্জিনিয়ার, ভূবিজ্ঞানী, খনিজবিজ্ঞানী ইত্যাদি লেজুরগুলো? যত্তো সব! ওসব ছাড়ো।

মুহূর্তে মন চাঙ্গা হয়ে উঠলো। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতেও সময় লাগে না। দেখা গেল, ভারি মিশুকে মিষ্টি স্বভাবের লোক মিঃ গর্ডন। সত্যিই আকর্ষণীয় তাঁর ব্যক্তিত্ব। আমার মতো না হলেও, তাঁর মধ্যে আজও জেগে আছে এক মুসাফির অভিযাত্রী। দেশ দেখার নেশা একাধিকবার তাঁকে ঘরছাড়া করেছে। সব দিক দিয়ে তৈরি হয়েই তিনি এসেছেন এখানে। সাহারা, গোবি ইত্যাদি সমেত দুনিয়ার উত্তপ্ত ও শীতল সমস্ত মরুভূমিসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের পুঁথিগত জ্ঞান তাঁর কোনও অংশেই কম নয় আমার চেয়ে। এ ছাড়া শিল্প, সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও ঝোঁক তুচ্ছ করার মতো নয়।

সত্যি কথা বলতে কি, মিঃ গর্ডনের মতো সঙ্গী পেয়ে মরুজীবনের কঠোরতা আমার অনেকখানি হালকা হয়ে গেল।

একদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন,—একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ, চৌধুরী?

জিজ্ঞাসু চোখে আমি তাকাই।

—সাহারা-অভিযানে যোগদানেচ্ছু পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা দিনে-দিনে কিভাবে কমে আসছে, রোল-কলের সময় খেয়াল করেছো?

হ্যাঁ,—বোকা-বোকা চোখে আমি বলি, কিন্তু কেন বলুন তো?

হাঁটতে-হাঁটতে আমার পিঠে এক থাপ্পড় কষিয়ে মিঃ গর্ডন বললেন—তুমি একটা আস্ত বিচ্ছু, বুঝলে! এ কয়দিনে তোমাকে চিনতে পারিনি, এত বোকা মনে করো আমাকে? নিজে বোকা সেজে আমার কাণ্ডজ্ঞান যাচাই করতে চাও, তাই না? কি জানি বাবা, তোমার মতো কত বিচ্ছু ভারতে আছে, কে জানে?

একটু থেমে আবার তিনি বলেন,—যারা আজ এখান থেকে নিজেরা সটকাচ্ছে বা যাদের নাম খারিজ হয়ে যাচ্ছে, তারা কারা জানো? তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, সাহারা-অভিযান থেকে ভালোভাবে ফিরতে পারলে বিশেষ পদোন্নতির সম্ভাবনা যেমন প্রবল, তেমনি অভিযান চলাকালে আর্থিক সুযোগ সুবিধাও তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট। একমাত্র এই দুই লোভ ও আকাঙ্খার বশবর্তী হয়েই ওদের অধিকাংশ এই অভিযানে নাম লিখিয়েছে। তা, এ লোভ বা আকাঙ্খা থাকুক, কিন্তু তা পূরণের জন্যে নিজেদের তৈরি করবি তো! তার বালাই নেই। তাই এখানকার সমস্ত কিছুই তাদের কাছে অজানা থেকে গেছে। তার ফলে এই শারীরিক ধকল ও মানসিক চাপ সহ্য করতে না পারায় তাদের এই হাল। সস্তায় কিস্তিমাত করতে গেলে যা হয়, তাই হচ্ছে। আরও অনেকে পালাবে বা খারিজ হবে। বুঝলে চৌধুরী, বড় কোনও আকাঙ্খা বা কাজ, তার কোনটাই ফাঁকি দ্বারা সাধিত

হতে পারে না। যত্তো সব রাবিশ! হতভাগারা এটুকুও জানে না যে, সাধ থাকলেই হয় না, তদনুযায়ী সাধ্যও অর্জন করতে হয়।

রিচার্ড, ফার্গুসন, সামুয়েল, কনর‍্যাড, হ্যারিংটন, কোহেন প্রভৃতি অনেকের সঙ্গেই এখানে পরিচয় ঘটলো। আগে থেকে তারাও মোটামুটি তৈরি হয়ে এসেছে। তাই হঠাৎ অথৈ জলে পড়ে নি, সামাল দিয়ে চলেছে।

সেদিন হঠাৎ দেখা হলো মার্টিন ও ব্রাইটের সঙ্গে। সুমেরু রাজ্যের অভিযানে ওরাও ছিল সঙ্গে। অনেক কাল পরে দেখা। মন খুশিতে ভরে উঠলো। হই-হই করে দুজনকে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর কত কথা—অতীত অভিযান নিয়ে কত স্মৃতির মন্থন।

কিন্তু মার্টিনকে সারাক্ষণ মনে হলো কেমন যেন বিমর্ষ, মনমরা। চোখে মুখে ক্লান্তি ও অবসাদের ছাপ।

পাশে চলতে-চলতে একসময় আমাকে একটু আলাদা পেয়ে হঠাৎ বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করলো,—মরু আর মেরুতে বড্ড তফাত, তাই না চৌধুরী?

তফাত মানে আকাশপাতাল তফাত! —কথাটা বলে ফেলেই সামলে নিলাম। ততক্ষণে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে মার্টিনের যন্ত্রণাটা। সান্ত্বনার সুরে বললাম,—আরে ঘাবড়াও মৎ! আবহাওয়া আর জলের ব্যাপারেই যা একটু তফাত। ও দুটোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নাও মনের দিক থেকে, ল্যাঠা চুকে যাবে।

মার্টিন কিন্তু বেজার মুখে তেমনি বিড়বিড় করতে থাকে,—হুঁ, তফাতটা বড্ড সাংঘাতিক... যেমন নিদারুণ জলকষ্ট, তেমনি প্রচণ্ড গরম... অসহ্য... হুঁ, মেরুর ঠিক উলটো...

কয়েকদিন পরে মার্টিনকে আর দেখা গেল না ।বুঝলাম সবই। হয় সে সরে পড়েছে, নয়তো লিস্ট থেকে বাদ পড়েছে। ব্রাইট অবিশ্যি তখনও প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে আপ্রাণ যুঝে চলেছে।

মরু-এলাকা যে একেবারেই নিষ্প্রাণ নির্জলা, তা কিন্তু নয়। তবে জল যে জীবন, এখানে এলে তা হাড়ে হাড়ে মালুম হয়—যেমন নিজের দিক থেকে, তেমনি এখানকার বাসিন্দাদের পরিচয় মেলে। উদ্ভিদ হোক আর প্রাণী হোক, সামান্য যে জীবজগতের দর্শন মেলে, জলের ব্যাপারে তারা ভারি সচেতন, জলখরচে যারপরনাই মিতব্যয়ী—টিপে টিপে হিসেব করে খরচ করে।

উদ্ভিদ যা নজরে পড়ছে তা পত্রপল্লবহীন। মাটির নিচের ভাঁড়ারে জলের সংস্থান তাদের অতি সামান্য। শেকড়ের সাহায্যে তা টেনে নিয়ে কোনরকমে দিন গুজরানের ব্যবস্থা। পাতা থাকলেই তো তা থেকে বাতাসে জল উবে যাবে। টিকে থাকাই যেখানে একমাত্র প্রশ্ন, সেখানে ওজাতীয় অপব্যয়ের প্রশ্নই ওঠে না। এখানকার উদ্ভিদ জীবন থেকে তাই পত্রপল্লবের বিলাসিতা একদম বাদ।

এখানে ওখানে নজরে পড়ে সরু লাঠির মতো কাঁটার ঝাড়, পাতার বালাই নেই। কিন্তু রঙ সবুজ। হ্যাঁ, এই সবুজ পদার্থটাই হচ্ছে আসল জিনিস, এইসব উদ্ভিদের ক্লর‍্যাফিল বা পত্রহরিৎ—যার সাহায্যে সূর্যালোককে জ্বালানি হিসেবে কাজে লাগিয়ে নিজেদের দেহাভ্যন্তরে তারা খাদ্য তৈরি করে।

এদিককার মরু-অঞ্চলে, সনোর‍্যান মরুভূমিতেও দেখার মতো উল্লেখযোগ্য জীব আছে কয়েকটা। এখানে আসার পর থেকে মাথায় ঘুরছে তাদের খোঁজ করার চিন্তাটা।

মিঃ গর্ডনকে সেদিন কথাটা বলতেই তিনি যেন লুফে নিলেন। বললেন,—এই দ্যাখ

চৌধুরী, এই জন্যেই তো তোমাকে আমার এত পছন্দ। দুজনের ভাবনাচিন্তার খুব মিল। ও মতলব তো আমারও।

তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললো,—তবে মুশকিল কি জানো? প্রাণীগুলোর দেখা পাওয়া খুবই শক্ত। প্রচণ্ড গরম ও রোদের খরতাপ এড়ানোর জন্যে দিনের বেলাটা তারা মাটির তলায় ঠাণ্ডা গর্তে শুয়ে বসে কাটায়। বলতে গেলে ওরা নিশাচর। খাওয়া-দাওয়ার জন্যে গর্ত থেকে বেরোয় সন্ধ্যার পর। তবে ক্যাকট্যাস যেহেতু উদ্ভিদ, গরম থেকে তাদের পালানোর উপায় নেই। ঘোরাঘুরি করলেই তাদের খোঁজ পাওয়া যাবে।

পরদিনই বেরিয়ে পড়ি ক্যাকট্যাস-দর্শনপ্রার্থী আমরা দুই মক্কেল। খবর ছড়িয়ে পড়তে সঙ্গে এসে জুটলো ফার্গুসন, রিচার্ড, কনর‍্যাড, হ্যারিংটন এবং আরও কয়েকজন।

এদিককার মরুভূমি-এলাকার একটা বিশিষ্ট উদ্ভিদ হলো এই ক্যাকট্যাস যা পৃথিবীর অপর পিঠের সাহারা, গোবি, ভারতের থর, আরবের মরুভূমি ইত্যাদি অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবে জন্মায় না, তাই দেখাও মেলে না।

চলতে চলতে পথে নানা জাতের ক্যাকট্যাসের দর্শন পাওয়া গেল। কোনওটা ছোট, কোনওটা বড়। চেহারা তাদের নানারকম। কোনওটা চ্যাপ্টা পুরু অনেকগুলো পাতার সমষ্টি যেন, গায়ে মোমের মতো আবরণ, একটা পাতার সঙ্গে অন্যটা জোড়া, সর্বাঙ্গ কন্টকাকীর্ণ। কেউ দেখতে লম্বাটে কুমড়োর মতো, সারা গায়ে যেন খাঁজকাটা। বিচিত্রদর্শন সব উদ্ভিদ, কিন্তু সম্পূর্ণ নিষ্পত্র।

অনেকটা নিজের মনে মিঃ গর্ডন একসময় বলেন,—কিন্তু স্যাগুয়ারো কোথায়?

চলুন, আরও এগোনো যাক।—আমি টিপ্পনি কাটি, ক্যাকট্যাস জগতের উনি কেষ্টবিষ্টু তো, তাই আরো একটু কষ্ট না করলে হুজুরের দর্শন মিলবে না।

কথাটা মন্দ বলো নি। —উৎফুল্ল কণ্ঠে মন্তব্য করেন মিঃ গর্ডন।

শেষ পর্যন্ত হুজুরের দেখা মিললো। দূরে দেখা যায়, পত্রপল্লবহীন বিদঘুটে গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছে একাধিক স্যাগুয়ারো ক্যাকট্যাস। বিভিন্ন জাতের ক্যাকট্যাস পরিবারে স্যাগুয়ারোই সবচেয়ে বিশিষ্ট, সবচেয়ে লম্বা ও বিশালাকায়।

কাছে গিয়ে দেখি, তাদের গোলাকার মূল দণ্ড বা কাণ্ডটা যথেষ্ট মোটা এবং সোজা ওপরে উঠে গেছে—২১-২২ ফুট উঁচু হবে মনে হয়। কাণ্ড বা গুঁড়ি থেকে একাধিক মোটা ডালও বেরিয়েছে, সেগুলোও সাধারণত ঊর্ধ্বমুখী। কিন্তু সারা গাছে পাতাপল্লবের চিহ্ন নেই কোথাও।

স্যাগুয়ারো বিপুলপরিমাণ জল সঞ্চয় করে রাখে তাদের দেহে-কাণ্ডে ও ডালে। তাই তো ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ—খরা ও অনাবৃষ্টির ধাক্কা সামলেও তারা বেঁচে থাকতে পারে এমন কি দুশ বছর পর্যন্ত।

মিঃ গর্ডনকে মনে হচ্ছে সন্তুষ্ট নন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দূরে বিভিন্ন দিকে তাকাচ্ছেন তিনি। শেষে বললেন,—শোনো চৌধুরী, এ স্যাগুয়ারোগুলো মোটেই বড় জাতের নয়। তাই মন ভরছে না। তারা নির্ঘাত আছে কোথাও।

বেশ তো, খুঁজে দেখতে দোষ কি! —আমি বলি।

—হ্যাঁ, তাই করতে হবে। আজ আর সময় নেই। কাল সকালে বেরোবো।

পরদিন। দল আজ আরো ভারী। অন্যান্য ক্যাকট্যাসের সঙ্গে স্যাগুয়ারোও নজরে পড়ছে মাঝে-মাঝে। কিন্তু মিঃ গর্ডন দাঁড়াচ্ছেন না।

এমনি করে চলতে চলতে হঠাৎ একসময় সবাই হই-হই করে উঠলো। দূরে দেখা যাচ্ছে এক অদ্ভুত দৃশ্য—ন্যাড়া গাছের এক জঙ্গল।

ছুটতে ছুটতে সবাই গিয়ে হাজির হলাম সেখানে—স্যাগুয়ারোর বনে। আরেব্বাস! সবার চক্ষুস্থির ঃ কী পেল্লায় সব গাছ! কোনও-কোনওটা মনে হচ্ছে ৪০-৫০ ফুট পর্যন্ত উঁচু। গুঁড়িও তেমনি মোটা। আর কত ডালপালা! অবিশ্যি ছোট ও মাঝারি আকারের স্যাগুয়ারোও সেখানে আছে বিস্তর।

দলের একজন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে,—আচ্ছা, এদের ফুলফল হয় না? তা না হ'লে বংশবৃদ্ধি ঘটে কিভাবে?

মিঃ গর্ডন তাকান আমার দিকে,—জবাবটা তুমিই দাও, চৌধুরী।

আবার আমাকে কেন? —আমি আপত্তি জানাই ঃ আপনিই উপযুক্ত ব্যক্তি।

—উঁহু, মোটেই নয়। ওটা তোমার কাজ।

কী আর করি! বললাম,—হ্যাঁ, হয়। স্যাগুয়ারোর ফুল হয়, ফলও হয়। বসন্তকালে তার গুঁড়ি ও ডালের একেবারে মাথায় বা আগায় সাদা সাদা ফুল ফোটে। ফুলগুলোর গায়ে মাখানো থাকে মোমের মতো প্রলেপ। ফুল থেকে যে ফল হয়, তা দেখতে হয় ডিম্বাকার এবং অনেকটা শসার মতো। ফলের ভেতরটা টকটকে লাল, কালো বিচিতে ভরা। শুনেছি, খেতে নাকি খুব সুস্বাদু।

চমৎকার!—মিঃ গর্ডন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

কী 'চমৎকার'? —নিরীহ কণ্ঠে কনর‍্যাড শুধায় ঃ ফলটার স্বাদ? খেয়েছেন আপনি?

হেসে ফেলে অনেকেই।

আর থতমত খেয়ে যান মিঃ গর্ডন। কনর‍্যাডের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হাসতে হাসতে শেষে বললেন,—বাঃ বাঃ! চৌধুরীরও এককাঠি ওপরে মনে হচ্ছে। সত্যিই বড় ভালো লাগলো। ঠোক্করটা যথাস্থানেই পড়েছে। এ থেকে বুঝতে পারছি, একটু চেষ্টা করলে তুমিই পারবে এ ফলের স্বাদটা পরখ করতে। এবং ফলাফলটা জানতে পারলে বুঝতে পারবো, শোনা কথার সঙ্গে বাস্তবের মিল কতটুকু। করবে একটু চেষ্টা?

ছোট্ট এই ঘটনার পর থেকে কনর‍্যাডের সঙ্গে মিঃ গর্ডনের আলাপ সত্যিই জমে উঠেছিল।

স্যাগুয়ারো ছাড়াও আরও একজাতের বিচিত্র ক্যাকট্যাস দেখা গেল সনোর‍্যান মরুতে। অনেকগুলো মোটা ডাঁটা বা দণ্ডের সমবায়ে এক-একটা গাছ গঠিত। দণ্ডগুলো সবই মাটি থেকে সোজা ওপরে উঠে গেছে পাইপের মতো। নাম তাই অর্গ্যান-পাইপ ক্যাকট্যাস। মূল দণ্ড থেকে আবার ডালও বেরিয়েছে। কিন্তু সবই ন্যাড়া, পত্রপল্লবের বালাই নেই কোথাও।

ক্যাকট্যাস তো হলো, এবার প্রাণীগুলো নিয়ে সমস্যা। কি করে তাদের দর্শন পাওয়া যায়? রাতের বেলায় না ঘুমিয়ে কোথায় তাদের খুঁজবো? মিঃ গর্ডন আর আমি তো ভেবে ভেবে সারা, বলতে গেলে হাড়-মাস কালি হবার জোগাড়। কিন্তু কোনও পন্থাই মাথায় এল না।

বিশেষ করে দুটো প্রাণীর দেখা পেলে আমরা বর্তে যাই। একটা হলো 'স্পেইডফুট টোড' বা কোদাল-পা ব্যাঙ অন্যটা 'ক্যাঙারু র‍্যাট' বা ক্যাঙারু ইঁদুর। জল-খরচের ব্যাপারে দুটো প্রাণীই ভীষণ মিতব্যয়ী, যাকে বলে একেবারে হাড়-কিপটে। এ ব্যাপারে তাদের এমনকি অনেকটা স্বাবলম্বী বললেও বোধহয় ভুল হয় না।

সেদিন আমাদের এই সমস্যার কথা শুনে কোহেন আর রিচার্ড তো হেসেই সারা ঃ তারা ভেবেছিল, কি জানি কী জানোয়ার! হয়তো ভালুক, জাগুয়ার বা বাইসন-টাইসন হবে। তা না, দুটো পুঁচকে প্রাণী—একটা ব্যাঙ, আরেকটা ইঁদুর!

ওরা ফ্যাকফ্যাক করে হাসে আর কেবলই বলে,—মস্ত দুই জানোয়ার বুঝলে! একটি হলেন শ্রীমান ব্যাঙ, অন্যটি শ্রীমান ইঁদুর। হি-হি-হি-হি—

মিঃ গর্ডন নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে। আমি মুখ ফিরিয়ে আছি অন্য দিকে।

হাসিটা ছোঁয়াচে। স্যামুয়েলও ফিক্‌ফিক্‌ করে উঠতে, হ্যারিংটন এবার ধমকে উঠলো,—এই হচ্ছেটা কি! না জেনে শেয়ালের মতো ফ্যাকফ্যাক করছো কেন? ষণ্ড মার্কা বুদ্ধি তো, আর কত আর হবে! প্রাণী দুটো সম্বন্ধে জানো কিছু? শুনেছি ওদের জুড়ি নেই, সবকিছুই অত্যদ্ভুত।

তাকে জোর করে সমর্থন জানালো কনর‍্যাড।

ধমক খেয়ে রিচার্ড আর কোহেন বেশ একটু দমে যায়। আর বেকুব চোখে স্যামুয়েল প্যাটপ্যাট করে তাকায় হ্যারিংটনের দিকে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই মিহি গলায় সে চিঁচি করে উঠলো,—তাই নাকি? অত্যদ্ভুত? কি রকম শুনি।

বেশ বুঝতে পারছি, হ্যারিংটন বেশ অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছে। বিপন্ন চোখে একবার সে তাকাচ্ছে কনর‍্যাডের দিকে, আরেকবার আমার দিকে। শেষে যেন ডুকরে উঠলো,—দোহাই মিঃ গর্ডন, বাছাদের অপরাধ নেবেন না। অজ্ঞান ওরা জানে না, ওরা কী পাপ করছে! প্রাণী দুটো সম্বন্ধে ওদের একটু বুঝিয়ে বলুন।

মৃদু হেসে মিঃ গর্ডন বললেন,—কেন, ও কাজটা তো তুমিও করতে পারো। অসুবিধে কোথায়?

হ্যারিংটন একটু ঢোক গিললে, আমতা-আমতা করলে, শেষে সলজ্জ কণ্ঠে বলেই ফেললে,—আসলে ব্যাপারটা কি জানেন! বিভিন্ন সূত্রে প্রাণী দুটো সম্বন্ধে শুনেছি কিছু-কিছু, কিন্তু অন্যদের কাছে বলার মতো বিস্তারিত কিছু জানি নে। শুনেছি, তাদের চালচলন জীবনযাত্রা সবই নাকি তাক লাগার মতো।

হুঁ, বুঝলাম। —প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন মিঃ গর্ডন, তবু তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি নাবালক বাছাদের হাসি-মস্করার বারোটা বাজানোর জন্যে।

সূর্য পাটে নামছে। পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে তারই রঙের খেলা দেখছে কনর‍্যাড—বেশ অভিনিবেশ সহকারেই। তাকে উদ্দেশ্য করে মিঃ গর্ডন এবার বললেন,—বুঝলে কনর‍্যাড ভায়া, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণী দুটো সম্বন্ধে আমাদের তুমি নিশ্চয়ই বিশদ কিছু জানাতে পারবে। কি বলো?

কনর‍্যাড যেন তৈরি হয়েই ছিল। মিঃ গর্ডনের দিকে ফিরে মুচকি হেসে জবাব দিল, —বুঝেছি। আমাদের জ্ঞানের বহর পরখ করার বাসনা আপনার মনে বলবতী হয়ে উঠেছে। স্রেফ মাস্টারি আর কি! তবু আপনার মতো গণ্যমান্য ব্যক্তির অনুরোধ আমি উপেক্ষা করবো না, কিন্তু দুটো শর্তে। এক, শুধুমাত্র কোদাল-পা ব্যাঙটা সম্বন্ধেই আমি বলবো, অন্যটা নয়। দুই, আমার বক্তব্যে কিছু বাদ গেলে খোশমেজাজে তা সংশোধন করে দেবেন।

—তথাস্তু। অতি উত্তম প্রস্তাব।

আমার ধারণা,—কনর‍্যাড শুরু করে, সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রাণী হলো ওই কোদাল-পা ব্যাঙ। মরুভূমিতে ব্যাঙ—কল্পনা করা যায়? ব্যাঙ তো অনেকটা জলেরই প্রাণী। জলেই

তাদের জন্ম এবং ব্যাঙাচির জীবনের প্রথম অংশটা অর্থাৎ বেশ কয়েকটা মাস তাদের জলেই কাটে। এসময় তাদের কানকো বা ফুলকো ফুসফুসে রূপান্তরিত হয়, লেজ খসে পড়ে, পা জন্মায় এবং পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ শেষে ডাঙায় উঠে আসে তার পরেও জলের কাছাকাছি এলাকায়, জলীয় বা আর্দ্র আবহাওয়ায় জীবন কাটাতে চায় তারা।

বাঃ বাঃ, কনর‍্যাড!—আমি সোচ্চার হয়ে উঠি, আরম্ভটা বড় সুন্দর হয়েছে।

ধন্যবাদ!—মাথা নেড়ে কনর‍্যাড বলে চলে, সেই ব্যাঙ কিনা মরুভূমিতে! শুধু তাই নয়, কোদাল-পা ব্যাঙ সনোর‍্যান মরুর সবচেয়ে শুকনো নীরস অঞ্চলে বহালে তবিয়তে বাস করে। এ অঞ্চলের তারা অন্যতম স্থায়ী আদিবাসী। 'কোদালে-পা' নাম হওয়ার কারণটাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের পেছনের পা দুটোর প্রত্যেকটায় আছে কোদালের মতো ধারালো শক্ত নখর। তা দিয়ে তারা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বাসা তৈরি করে বসবাসের জন্যে।

আকারে তারা বিশেষ বড় হয় না। —মিঃ গর্ডন যোগ করলেন, লম্বা হয় বড়জোর ৩-৪ ইঞ্চি। চমৎকার হচ্ছে কিন্তু কথিকাটা। 'কোদাল-পা'র উপযুক্ত চরিতকারই বটে।

মুচকি হাসে কনর‍্যাড। বর্ণনা তার চলতে থাকে,—এ জাতীয় ব্যাঙদের যা স্বভাব, 'কোদাল-পা' ব্যাঙও লাফিয়ে লাফিয়ে চলে না, বুক ঘষটে গুটিগুটি পা ফেলে হাঁটে। নিশাচর না হয়ে তাদের উপায় নেই। দিনের বেলায় অসহ্য গরম। তাই মাটির তলার ঠাণ্ডা গর্তে সে-সময় তারা পড়ে থাকে আচ্ছন্নের মতো। বেরোয় রাতে আর খায় পোকামাকড়। কিন্তু জল পাবে কোথায়? মরুতে তো প্রশ্নই ওঠে না। বছরে বড়জোর এক-আধবার তাদের ভাগ্যে জোটে স্বাভাবিক জলের স্বাদ। কাজেই পোকামাকড় থেকে যে জলীয় অংশটুকু জোটে, তা দিয়েই তাদের কাজ চালিয়ে নিতে হয়।

অ্যাঁক্! —হাঁকপাক করে উঠলো রিচার্ড, কী সর্বনাশ! মরুভূমির এই গরমে বিনা জলে! ওরে বাবারে, আর আমরা কিনা—নাঃ, 'কোদাল-পা'কে হেনস্তা করা খুবই অন্যায় হয়ে গেছে, দেখছি। ইঁদুরটাও বুঝতে পারছি সমান বাহাদুর, হয়তো আরও এক ধাপ ওপরেই হবেন। আমরা অনুতপ্ত, বিগ্রেইডিয়ার সাহেব। প্রাণভরে শুভেচ্ছা জানাই এই মরু-বাহাদুরদের 'সহস্রায়ু হও, বাপ! কী কাণ্—'

আরে থামো তো, ঘেঁচু! শুনতে দাও। —স্যামুয়েল আবার চিঁ-চিঁ করে উঠলো, বলো কনর‍্যাড, তারপর?

কনর‍্যাড আবার শুরু করে,—বিশেষজ্ঞরা বলেন, 'কোদাল-পা' নাকি অনেক সময় মাসের পর মাস অসাড়ে পড়ে থাকে মাটির তলার আস্তানায়। নড়নচড়ন একদম বন্ধ। জীবনের পাঁচভাগের চারভাগ সময় তারা বোধহয় এমনিভাবে কাটিয়ে দেয়—এইভাবেই হয়তো, সামাল দেয় জলের অভাব।

কোহেন টিপ্পনি কাটে,—এই রিচার্ড, আমরাও তো এভাবে সামাল দিতে পারি।

ধ্যুস! —রিচার্ড ফোঁস করে উঠলো, তোর ঘাড়ের ওপরকার ওই নিরেট গোলকটাকে মারবো এক ঘুষি। তাহলে ঘোরাঘুরির কাজটা করবে কে?

কনর‍্যাড ততক্ষণে বলতে শুরু করেছে,—এসব মরু এলাকায় বৃষ্টিপাত একেবারে হয় না, তা নয়। তবে খুবই কম, বছরে বড়জোর দু-এক পশলা। তেমন জোরালো এক পশলা বৃষ্টি হলে, মরুর নিচু জমিতে খানাখন্দে জল জমে। 'কোদাল-পা' ব্যাঙদের তখন ভারি ফুর্তি। রাত হতেই তারা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের ডাকাডাকিতে মুখরিত হয়ে ওঠে নিস্তব্ধ মরুরাত্রির আকাশ।

বাঃ বাঃ! —উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন মিঃ গর্ডন, ভারি চমৎকার হচ্ছে, একেবারে কাব্যিক যাকে বলে।

মাথা নাড়তে-নাড়তে কনর‍্যাড বলে চলে,—স্ত্রী ব্যাঙেরা এই জলে ডিম পাড়ে। তার পরেই অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকে এক চমকপ্রদ ঘটনা। দুদিনের মধ্যে ডিম ফুটে ব্যাঙাচি বেরোয়। ব্যাঙাচিতে ভরে যায় জলটা। তাদের শরীরে ঘটতে থাকে দ্রুত রূপান্তর। কয়েক দিনের মধ্যেই পরিপূর্ণ ব্যাঙে পরিণত হয় তারা, অবিশ্যি জল যদি ততদিনে না শুকিয়ে যায়।

কনর‍্যাডের কথিকা শেষ হতে, হ্যারিংটনের দীর্ঘশ্বাস পড়ে,—সত্যি প্রকৃতির রাজ্যে জীবনের কি মহাবিচিত্র লীলাখেলা!

আমাকে উদ্দেশ্য করে মিঃ গর্ডন বললেন,—কি হে চৌধুরী, ক্যাঙারু ইঁদুরের জীবনটা এবার তুমিই বলো।

আমি মাথা নাড়ি,—আমাকে আবার কেন? আপনিই বলুন।

বেশ, তাই হোক। —মিঃ গর্ডন বলেন, ক্যাঙারু ইঁদুরও কম আশ্চর্যজনক প্রাণী নয়। নামে ক্যাঙারু ইঁদুর হলেও, তারা কিন্তু ক্যাঙারু নয়, ইঁদুরও নয়, তীক্ষ্ণদন্ত প্রাণীবর্গের একটা ভিন্নজাতের প্রাণী—যদিও দেখতে অনেকটা ইঁদুরেরই মতো। মাথা-শরীর মিলিয়ে লম্বা হয় তারা চার থেকে আট ইঞ্চি। লেজটা কিন্তু হয় তার চেয়েও লম্বা এবং তার ডগায় থাকে একগোছা সাদা পশমি লোম। গায়ের রঙ হয় বাদামি।

হ্যাঁ, বাদামি হয় বটে,—আমি যোগ করি, তবে ফিকে থেকে গাঢ় যে কোনও মাত্রায় বাদামি হতে পারে।

ধন্যবাদ। ঠিকই বলেছো। —মাথা নাড়তে নাড়তে মিঃ গর্ডন বলে চলেন, তাদের নামের সঙ্গে 'ক্যাঙারু' কথাটা যুক্ত হওয়ার সঙ্গত কারণ আছে। পেছনের পা দুটো তাদের অস্বাভাবিক লম্বা। তাতে ভর দিয়ে খুদে ক্যাঙারুর মতোই তারা লাফিয়ে লাফিয়ে মরুভূমিতে চলাফেরা করে। সামনের ছোট্ট পা দুটো তখন গুটিয়ে রাখে গলার কাছে। এক-এক লাফে তারা ফুট দশেক পথ পার হয় এবং দরকার হলে শূন্য পথেই গতি পরিবর্তন করতে পারে। এ কাজে লেজ ও তার ডগার পশমি লোমের গোছাটা তখন চমৎকার হালের কাজ করে। পেঁচা, সাপ ও অন্যান্য কিছু বড় জাতের শিকারী মরু-প্রাণীর বড় লোভ তাদের মাংসের দিকে। এইসব শত্রুর কবল থেকে বাঁচার জন্যে তাই সময়-সময় শূন্যপথে গতি-পরিবর্তন ক্যাঙারু ইঁদুরের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

অদ্ভুত সাবলীল বর্ণনা মিঃ গর্ডনের। তেমনি বলার ভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বরও।

মিঃ গর্ডন তখন বলে চলেছেন,—দিনের বেলায় প্রচণ্ড গরমে ক্যাঙারু ইঁদুর তার মাটির নিচের আস্তানায় থাকে। অদ্ভুত সে আস্তানা—বিচিত্র এক গোলকধাঁধা যেন। তারা নিশাচর তো বটেই, কিন্তু চাঁদনি রাতেও বাইরে বেরোয় না। আবহওয়া আর্দ্র বা ভিজে থাকলেও বাইরে বেরোনো স্থগিত রাখে।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো,—একটু যেন দম নিয়ে মিঃ গর্ডন বলেন, একফোঁটা জল না খেয়েও ক্যাঙারু ইঁদুর দীর্ঘকাল স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। রসালো লতাগুল্ম, পাতা, ফল, বিচি ইত্যাদি থেকে যে জল তারা পায়, তাতেই চলে যায়। এমনকি শুকনো খাদ্য খেয়েও তারা সুস্থ দেহে কাটাতে পারে। কারণ তাদের দেহের ভেতরেই রয়েছে প্রয়োজনমাফিক জল-তৈরির ব্যবস্থা।

অ্যাঁ! সে কি! —রিচার্ড আর কোহেন প্রায় সমস্বরে কলরব করে উঠলো ঃ শরীরের ভেতর জল-তৈরির ব্যবস্থা? এমন বিষম তাজ্জব প্রাণীও তা হলে আছে? আশ্চর্য!

মিঃ গর্ডন বলতে থাকেন,—আস্তানার বাইরে এসে যে খাদ্য তারা পায়, তা কিন্তু প্রথমেই গিলে ফেলে না। তাদের গালের মধ্যে থলি আছে। খাদ্য তারা প্রথমে সেই থলিতে জড়ো করে এবং বাসায় এনে জমায়। তারপর দরকার মতো খায়। এই সঞ্চয়ী স্বভাবের জন্যে, অবস্থা যত প্রতিকূলই হোক, ক্যাঙারু ইঁদুরের খাদ্যাভাব ঘটে না।

সবাই নিশ্চুপ, বুঝতে পারছি—মুগ্ধও বটে। সন্ধ্যা নামছে।

মিঃ গর্ডনের বর্ণনা থেমে নেই। তিনি বলছেন,—ক্যাঙারু ইঁদুর চলাফেরায় অত্যন্ত হুঁশিয়ার। তাদের শ্রবণশক্তি এত তীক্ষ্ণ যে, দূর থেকে ক্ষীণতম শব্দও স্পষ্ট শুনতে পায়। মহাশক্তিশালী এই শ্রবণেন্দ্রিয়ই তাদের আত্মরক্ষার সবচেয়ে বড় অস্ত্র। শিকারী জন্তুদের পক্ষে তাই তাদের নাগাল পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।

এই হলো আমাদের ক্যাঙারু ইঁদুরের মোটামুটি পরিচয়। —বলে বর্ণনা শেষ করলেন মিঃ গর্ডন।

অপূর্ব! অপূর্ব! —সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলো কনর্যাড, যেমন বর্ণনা, তেমনি বলার ভঙ্গি, গলার স্বরও তেমনি। হিংসে হয়, ব্রিগেইডিয়ার সাহেব।

দু-দিন পরে, সেদিনও যথারীতি টইলে বেরিয়েছি। হঠাৎ দূর থেকে কানে এল কনর্যাড ও রিচার্ডের আর্ত চিৎকার,—সাপ! সাপ!

ছুটে গিয়ে দেখি, মরণযন্ত্রণায় মোচড় খাচ্ছে একটা সাপ, আকারে বেশ বড়সড়। ডঃ নিকল্‌সন্ ইতিমধ্যে এসে গেছেন। দেখে বললেন,—সাপটা সাইডওয়াইন্ডার। এদিককার মরু-এলাকায় দেখা যায়, তবে এখন প্রায় লুপ্ত বলা যায়। এরা বিষাক্ত।

ইহ! —কনর্যাড যেন আঁতকে উঠলো, আর একটু হলেই হয়েছিল আর কী! দুজনে কথা বলতে বলতে হাঁটছি। পায়ের দিকে নজর নেই। ওটার লেজে বোধহয় পা পড়েছিল। হঠাৎ ভয়ানক 'ফোঁস' শুনেই দশহাত দূরে ছিটকে পড়লাম। ওর সে কী রাগ! দুজনে পাথর মেরে শেষ করলাম।

এখানকার খেলা প্রায় সাঙ্গ হয়ে এল। আর মাত্র দু-দিন। তার পরেই সনোর‍্যানের পাট চুকিয়ে রওনা হতে হবে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের 'ডেথ ভ্যালি' বা মৃত্যু উপত্যকার উদ্দেশ্যে।

গভীর মনস্তাপে ভুগছি আমরা দুজন—আমি আর মিঃ গর্ডন। প্রাণী দুটোর দেখা পাওয়া গেল না কোনভাবেই। কি আর করা যাবে!

এখান থেকে বিদায় নেবার আগের রাত। হঠাৎ গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ঝমাঝম বৃষ্টির শব্দ আর মুহুর্মুহু মেঘগর্জন, দুইয়ে মিলে সে এক তুলকালাম কাণ্ড! মন আনন্দে নেচে উঠলো। তড়াং করে বিছানায় উঠে বসলাম, কী ভাগ্যি! এই তো সুবর্ণ সুযোগ।

উঠে গিয়ে টর্চ জ্বেলে ঠেলা দিলাম মিঃ গর্ডনকে। নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে তাঁর জবাব এল,—কি?

বললাম,—ওই শুনুন, বাইরে কি তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। কোদাল—

কথা শেষ হবার আগেই লাফিয়ে উঠে বসেছেন মিঃ গর্ডন,—ঠিক, ঠিক। 'কোদাল-পা'দের উপযুক্ত রাতই বটে। এ সুযোগ কখনই ছাড়া যায় না।

ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় ধরে বৃষ্টি চললো। ইতিমধ্যে আমরা তৈরি হয়ে নিয়েছি। দুজনের হাতে জোরালো টর্চ। সঙ্গে অস্ত্রও নিয়েছি। এখানে আশঙ্কার কিছু না থাকলেও, সাবধান হতে দোষ কি!

আমরা তাঁবুর বাইরে এলাম। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে কান খাড়া করে আছি।

হঠাৎ সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন মিঃ গর্ডন,—ওই শোনো।

হ্যাঁ, দু-চারটে ব্যাঙের ডাক কানে আসছে। কিন্তু তার পরেই বড়জোর দু-তিন মিনিটের মধ্যে চারদিকে শুরু হলো এক ধুন্দুমার কাণ্ড—গান আর গান, নির্ভেজাল মণ্ডুকসংগীত। সারা মরুভূমি যেন জেগে উঠছে 'কোদাল-পা'দের সোল্লাস ঐকতানে। আওয়াজটা বেশি আসছে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে।

ঘের থেকে বেরোতে যাবো, গেটে সান্ত্রীর বাধা।

উদ্দেশ্যটা খুলে বলায় এবং বক্তা স্বয়ং ব্রিগেডিয়ার সাহেব হওয়ায়, শশব্যস্তে গেট খুলে গেল।

দ্রুতপায়ে এগোচ্ছি। হঠাৎ পেছন থেকে তীব্র টর্চের আলো পড়লো। সেইসঙ্গে হুংকার,—*কৌন্ হ্যায়?*

কী জ্বালা! —বিরক্তিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওঠেন মিঃ গর্ডন।

ততক্ষণে পেছনের দুজন এসে হাজির—অধ্যাপক ডঃ স্মিথ এবং কনর‍্যাড, একই তাঁবুর বাসিন্দা।

ডাক অনুসরণ করে কিছুদূর এগোতেই দেখা গেল, বৃষ্টির জলে বেশ নিচু একটা পাথুরে জমি বড়সড় এক ডোবায় পরিণত হয়েছে। অগুনতি 'কোদাল-পা' ব্যাঙ তার মধ্যে। মহাফুর্তিতে তারা লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, ডুবোডুবি করছে আর ডাকছে। গায়ে টর্চের আলো পড়তে একটু হকচকিয়ে যাচ্ছে বটে, ডুবও দিচ্ছে হয়তো, কিন্তু তারপরেই যে কে সেই। *আনন্দে ওরা পাগল, আত্মহারা হয়ে গেছে।*

হবেই তো। —নিজের মনে বললাম, জীবনে এটা ওদের সবচেয়ে বড় মাহেন্দ্রক্ষণ।

ইতিমধ্যে আরও অনেকে এসে গেছেন—মায় ডঃ নিকলসন পর্যন্ত।

ঘণ্টাদেড়েক ধরে মরুরাজ্যের বিচিত্র জীব 'কোদাল-পা' ব্যাঙদের জলকেলি পর্যবেক্ষণ করে তৃপ্ত মন নিয়ে আমরা তাঁবুতে ফিরলাম। বাদ থেকে গেল ক্যাঙারু ইঁদুরটা। আমাদের চর্মচক্ষে সে ধরা দিল না কিছুতেই।

॥ তিন ॥

ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে ডেথ ভ্যালি বা মৃত্যু উপত্যকায় আমাদের তাঁবু পড়েছে।

সনোর‍্যান মরু থেকে রওনা হবার আগে যে শেষ নাম ডাকা হয়, তাতে দেখা যায়, অভিযাত্রীদের সংখ্যায় ধস নেমেছে বিরাট। সংখ্যাটা এসে দাঁড়িয়েছে ১০২ জনে। তার মানে ৪৮ জন গরহাজির—হয় কেটে পড়েছে, নয়তো খারিজ হয়ে গেছে তালিকা থেকে।

মিঃ গর্ডন বললেন,—বাছাদের চিরতরে ঘুচে গেছে সাহারা যাবার বাসনা। আরো অনেকের ঘুচবে ডেথ ভ্যালিতে গিয়ে।

—কেন?

হুংকার দিয়ে ওঠেন মিঃ গর্ডন,—আবার মর্কটপানা হচ্ছে? বারবার তোমাকে হুঁশিয়ার করে চলেছি চৌধুরী, ভালো হবে না কিন্তু। ডেথ ভ্যালি কি চিজ, তুমি জানো না?

মুখ কাঁচুমাচু করে আমি নীরবে হাত জোড় করি। মিঃ গর্ডন হেসে ফেলেন।

হ্যাঁ, ডেথ ভ্যালি গরমই বটে। সনোর্যান মরু তার কাছে একেবারে শিশু না হোক, টেনেটুনে বড়জোর তরুণ হতে পারে।

যতদূর দৃষ্টি যায়, চোখে পড়ে শুধু বালি আর বালি। দিনের বেলায় রোদের তাপে তা তেতে যেন আগুন হয়ে ওঠে।

সমস্ত মার্কিন মুলুকের মধ্যে সবচেয়ে নিচু জায়গা হলো এই ডেথ ভ্যালি—সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নিচু ২৭০ ফুট। আর আমাদের তাঁবু যেখানে পড়েছে, তা আরও নিচু, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ২৮২ ফুট। কাজেই সে অনুপাতে গরমটা যে তার কী পরিমাণ প্রচণ্ড, বোধহয় বলার দরকার করে না, আর করলেও তা বলে বোঝানো যাবে না।

পৃথিবীর সবচেয়ে গরম জায়গাগুলোর অন্যতম হলো এই ডেথ ভ্যালি মরুভূমি। গ্রীষ্মকালে এ এলাকার স্বাভাবিক তাপমাত্রা ১২৩ থেকে ১২৭ ডিগ্রি ফ্যারেন্‌হাইটের মধ্যে ওঠা-নামা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৩৪ ডিগ্রি ফ্যারেন্‌হাইট এখানেই উঠেছিল। অতএব বাইরে থেকে অবস্থার গুরত্ব আঁচ করতে হলে দুরন্ত কল্পনাশক্তির দরকার।

অঞ্চলটা এত উষর নীরস ও শুষ্ক বালিময় যে, জলের অস্তিত্ব এখানে অকল্পনীয়, আর সেজন্য নিষ্প্রাণও বটে। কিন্তু তাই বলে এখানে এলে সত্যিই কি মৃত্যু ঘটে? বিজ্ঞানের বর্তমান জয়যাত্রার যুগে তা মনে করা অজ্ঞতা বা মূর্খতারই নামান্তর।

'ডেথ ভ্যালি' নামকরণের পেছনে রয়েছে অন্য কারণ। আজ থেকে একশো-সওয়াশো বছর আগেকার সে কাহিনী। এ অঞ্চল তখনো কার্যতঃ অনাবিষ্কৃত। পশ্চিমে ক্যালিফোর্নিয়ায় যাবার উদ্দেশ্যে অজানা এই মরুভূমি অতিক্রম করতে গিয়ে দীর্ঘ পথপরিক্রমায় দলে-দলে পর্যটকরা তখন প্রাণ হারান। শব্দহীন জলহীন এই নিষ্প্রাণ মরুতে পথ হারিয়ে শ্রান্তি ও *পিপাসায় মারা যান তাঁরা। তা থেকেই এ অঞ্চলটার ওই ভয়ংকর বুককাঁপানো নামকরণ* হয়েছে। আজ এর ভেতর দিয়ে চলে গেছে পাকা সড়ক।

একে তো গরমের এই প্রচণ্ডতা, তার ওপর জলের নিয়ন্ত্রণ হয়েছে আরও কড়া, বরাদ্দ আরও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তার ফলে প্রতিক্রিয়া হলো মারাত্মক। প্রতিদিনই দ্রুত কমতে লাগলো সম্ভাব্য সাহারা অভিযাত্রীদের সংখ্যা। দলে দলে তারা সরে পড়ছে।

এখানে আমার তাঁবু-সঙ্গী অন্য একজন—প্রযুক্তিবিদ্। নাম হফম্যান। তৃতীয় দিনেই তার অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠলো। গরমে আর তেষ্টায় বেদম কাহিল নিজের কোটা থেকে জলের ভাগ দিয়ে এবং নানাভাবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে চাঙা রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু সবই পণ্ডশ্রম। পঞ্চম দিনে তল্পিতল্পা গুটিয়ে সে সরে পড়লো।

মিঃ গর্ডনের সঙ্গে দেখা হতে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন,—কেমন বুঝছো, চৌধুরী?

নিপাট গোবেচারার মতো বললাম,—কিসের?

গর্ডন সাহেব খেঁকিয়ে উঠলেন,—আবার ইয়ার্কি হচ্ছে! খবরদার বলছি, তোমাকে না চেনার মতো হাবা যদি আমাকে ফের মনে করো তো ঘুষিয়ে তোমার নাক থেঁতলে দেব, বুঝলে? কী জিজ্ঞেস করছি, বুঝতে পারছো না, না?

অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে ভাবিত কণ্ঠে বললাম,—দু-চারজন ছাড়া সাহারায় যাবার মতো কেউ থাকবে তো? আমার তাঁবু-সঙ্গী তো হাওয়া হয়ে গেছে।

তাই নাকি? আরে ঘাবড়াও মাৎ! —পাশে চলতে-চলতে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন মিঃ গর্ডন, থাকবে, থাকবে। যা থাকবে, সেটুকু হলো ক্ষীর। হুঁ; সাহারা কি চালাকির জায়গা? ফুঃ, এ জায়গার নাম নাকি ডেথ ভ্যালি! তা হলে সাহারার নাম কি হওয়া উচিত, বলতে পারো? ওই যে ক্ষীরের কথা বললাম, তা থেকেও এর পর বাছাই হবে, বুঝলে। থাকবে শুধু একেবারে আসল ইস্পাতটুকু। প্রত্যেকের সম্বন্ধে তার অতীত ও বর্তমান ক্রিয়াকলাপ, চালচলন, কথা-বার্তা, হাবভাব ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য রাখা হচ্ছে। সেসব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হবে বাছাইয়ের সময়।

এসব খবর জানা ছিল না। বুকটা ছ্যাং করে উঠলো। মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম,—কি জানি বাবা, শেষমেশ আমি না বাদ পড়ি।

কী বললে? —মিঃ গর্ডন ঘুরে দাঁড়ালেন, শোনো চৌধুরী, তোমার সঙ্গে একদিন আমার নির্ঘাত একহাত হয়ে যাবে, কেউ রুখতে পারবে না। তুমি বাদ পড়বে? তা হলে সাহারায় যাবেটা কে, শুনি? শুধু ওখানকার ভাড়া-করা উটগুলো নাকি? আশ্চর্য!

আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। গর্ডন সাহেবের সঙ্গে উচ্ছল আনন্দে করমর্দন করতে-করতে বললাম,—আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

অ্যাঁ!—গর্ডন সাহেবের চোখে হাসি, ও দুটো বস্তু তো শুনেছি, হিন্দুধর্মের খুবই পবিত্র জিনিস, পুজোয় লাগে। বাঃ!

সনোর‍্যান মরুভূমির মতো অত দিনের প্রোগ্রাম বা কর্মসূচি ডেথ ভ্যালিতে নেওয়া হয় নি। তল্পিতল্পা গোটানোর দিন এসে গেল।

মিঃ গর্ডনের সঙ্গে দেখা হতে বললেন,—দলে এখন কতজন এসে দাঁড়িয়েছে, সর্বশেষ সংখ্যাটি জানো?

—নাতো। কত?

আমার চোখের দিকে বারেক তাকিয়ে তিনি বললেন,—চুয়াল্লিশ।

—মাত্তর! তা হলে?

—তা হলে কি? তুমি কি মনে করো, চুয়াল্লিশজনের এক পেল্লায় বাহিনী পাঠানো হবে সাহারায়? বড়জোর—

বলতে-বলতে থেমে যান মিঃ গর্ডন। তাঁর মুখে ফুটে ওঠে এক বিচিত্র হাসি। ঝাঁঝালো গলায় বললেন তিনি,—তোমার সঙ্গে কথা বলতে যাওয়া এক ঝকমারি, বুঝলে?

সেকি? —আমি ব্যস্ত হয়ে উঠি, কী দোষ করলাম, জানি নে তো!

দোষ! দোষ মানে ওটা তোমার মোক্ষম স্বভাব-দোষ। —হেসে ফেলেন মিঃ গর্ডন, তুমি কতটুকু জানো আর কি জানো না, তা বুঝতেই জিব বেরিয়ে যায়। ওভাবে বোকা বনাটা আমি একদম পছন্দ করি নে। ভারি বিস্বাদের ব্যাপার বুঝলে।

আমিও হেসে ফেলি। বলি,—কি কাণ্ড! আপনার এতবড় গুরু সমস্যার কথা তো জানা ছিল না। বিশ্বাস করুন মিঃ গর্ডন, এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি নে। জানার চেষ্টাও করি নি। যা আমার এখতিয়ারের বাইরে তা জানার চেষ্টা করাটা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। ভাবি, সময় হলে সবই জানতে পারবো। আর না-ই যদি জানতে পারি, তাতে বা কি?

বুঝেছি, বুঝেছি। —আমার পিঠ চাপড়ে অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বললেন, মিঃ গর্ডন ঃ শোনো, কোম্পানি যে দল পাঠাবে, তাতে বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞ সমেত মোট লোক থাকবে খুব বেশি হলে তিরিশজন। তার মধ্যে সামরিক বিভাগের লোকও অবিশ্যি থাকবে কিছু। আচ্ছা,

প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের ব্যাপারে মিলিটারি কী জন্যে, তা নিয়ে তোমার মনে কখনও প্রশ্ন ওঠে নি?

—ওঠে নি বললে, মিথ্যা বলা হবে। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাই নি। ভেবেছি, অভিযানে যদি স্থান পাই তো কার্যক্ষেত্রে নিশ্চয়ই জানতে পারবো।

বাঃ! স্বভাবটা সত্যিই তোমার ভারি সুন্দর। —বললেন মিঃ গর্ডন, এবার শোনো কারণটা। সদ্য-স্বাধীন আলজিরিয়ার আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি এখনও খুব স্বাভাবিক নয়, বিশেষত দূরবর্তী সাহারা-অঞ্চলে তো নয়ই। সেখানে দলবদ্ধ যাযাবরদের হামলা, ডাকাতি, লুটপাট, রাহাজানি, খুনজখম ইত্যাদি বেড়ে গেছে। অ্যালজিরিয়ায় সরকার বর্তমানে ঘর গোছাতে এত ব্যস্ত যে দূরবর্তী এলাকায় ওই খুনে লুঠেরাদের দমন করার মতো ফুরসুত পাচ্ছে না। তাই তাদের জ্ঞাতসারেই অভিযানের নিরাপত্তার কারণে নিজেদের সামরিক বিভাগের লোক থাকবে জনা দশ-বারো। তা ছাড়া তেমন প্রয়োজন হলে তোমরা তো আছোই। রাইফেল, স্টেনগান, মেসিনগান চালাতে পারে অনেকেই। লোক-বাছাইয়ের সময় এদিকটাও বিবেচনা করা হবে। উপরন্তু অ্যালজিরীয় সরকারও সম্ভবত সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা করবে কিছুটা।

এত দিন পরে খোলসা হলো সমস্ত ব্যাপারাটা।

তৃ তী য় অ ধ্যা য়

॥ এক ॥

সাহারা অভিযানের উদ্দেশ্যে সদলবলে আমরা অ্যালজিরিয়ায় পৌঁছেছি।

আফ্রিকা মহাদেশের সর্বোত্তরে অ্যালজিরিয়া। তার পশ্চিমে মরক্কো, পূবে টিউনিসিয়া ও লিবিয়া। সব কটি দেশেরই উত্তর তটভূমি এসে শেষ হয়েছে ভূমধ্যসাগরে।

দুই মহাদেশ আফ্রিকা ও ইউরোপ। তাদের মাঝখানে ভূমধ্যসাগর মহাদেশ দুটিকে আলাদা করে রেখেছে। তার দক্ষিণে আফ্রিকা, উত্তরে ইউরোপ।

ভূমধ্যসাগরকে সমুদ্র বলা হয় বটে, কিন্তু সুবিশাল এক হ্রদ বললে বাস্তবে খুব একটা ভুল হয় কি? পশ্চিমে তার অতি-সরু একফালি জিব্রালটার প্রণালী। তারই মাধ্যমে অতলান্তিক মহাসাগরের সঙ্গে সে বজায় রেখে চলেছে কিছু যোগাযোগ। তা ছাড়া বাইরের আর কোনও মহাবারিধির সঙ্গে কোন প্রাকৃতিক যোগসূত্র তার নেই।

অ্যালজিরিয়ার রাজধানী অ্যালজীর্জের। এক প্রথম শ্রেণীর হোটেলে স্থান হয়েছে আমাদের। ভূমধ্যসাগরের তীরে অ্যালজীর্জ শুধু রাজধানীই নয়, দেশের সবচেয়ে বড় শহর এবং বড় নৌবন্দরও বটে। শান্ত সুনীল ভূমধ্যসাগরের ছোট ছোট ফেনিল ঢেউ তার উপকূলে এসে খেলা করছে অবিরাম।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মিঃ গর্ডনের কথাই পুরোপুরি ঠিক। অভিযাত্রী দলে স্থান পেয়েছে মোট তিরিশ জন। তার মধ্যে দশজন মিলিটারির লোক বাদে বাকি কুড়িজন বিশেষজ্ঞ—বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, প্রযুক্তিবিদ্ প্রভৃতি। আসবার আগে বেসামরিক অভিযাত্রীদের প্রত্যেককে নতুন করে আবার ভালোভাবে মিলিটারি ও নার্সিং সংক্রান্ত ট্রেনিং নিতে হয়েছে।

আমার কৃতিত্বে রবার্টের মানসিক প্রতিক্রিয়া কিন্তু মস্ত এক হেঁয়ালি হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার কাছে। যখন সে শুনলো, অভিযাত্রী দলের প্রথম সারিতে প্রথমেই যে ক'জন মনোনীত

হয়েছে, আমি তাদের একজন, তখন তার চোখমুখের যে মেঘাচ্ছন্ন চেহারা দেখেছিলাম, তা আমাকে চমকে দিয়েছিল। আমার কাছে তা ছিল অপ্রত্যাশিত। অথচ এ খবরে অন্য সবার মতো মেলস্যাম সাহেবের কাছ থেকেও পেয়েছিলাম স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা। রবার্টের মনের গতিপ্রকৃতি দিনে দিনে কেন এমন অস্পষ্ট ও পেঁচালো হয়ে উঠছে, এটা আমার কাছে এক রহস্য। কথাটা মনে পড়লে বুকের ভেতর কেমন যেন টনটন করে ওঠে। যাক্ গে—

অ্যালজীরজে পৌঁছানোর পরদিন দুপুর রোদের ঝাঁজ একটু কমতেই পথে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে ফার্গুসন, রিচার্ড এবং কনর্যাড।

অ্যালজীরজ-উপসাগরের পশ্চিম উপকূলে রাজধানী অ্যালজীরজ এক আধুনিক শহর। যতদূর মনে হয়, উপকূল বরাবর তার বিস্তার মাইল দশেক। উপকূলের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল রেখায় দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের সারি। আঙুর, কমলা ও অন্যান্য লেবু ইত্যাদির ফলের বাগান এবং খেজুর ও নানাজাতের গাছগাছালির ঘন সবুজে ঢাকা তাদের মাথা থেকে তলা পর্যন্ত। তারই মাঝে মাঝে ওপর থেকে ধাপে ধাপে নেমে এসেছে সুদৃশ্য সব প্রাসাদ-অট্টালিকা। শ্যামসবুজের মাঝে ধবধবে সাদা ভবনগুলিকে দেখাচ্ছে চমৎকার।

নীল উপসাগরের এখানে-ওখানে অলস মন্থর গতিতে ভেসে বেড়াচ্ছে উঁচু পালতোলা সব জেলে নৌকা। কর্মব্যস্ত প্রশস্ত বন্দরটি।

উপকূল থেকে আঁকাবাকা পাহাড়ি পথ ঘুরে-ঘুরে উঠে গেছে ওপরে। তরুবীথিশোভিত বুলেভার বা প্রশস্ত রাজপথের দু-ধারে রঙ-বেরঙের বই এবং সৌখিন দ্রব্যসামগ্রীর সুসজ্জিত দোকানপাট আর ফরাসি ভাস্কর্যের নানা নির্দশন ও ফরাসি ধাঁচের সব সৌধ-অট্টালিকা। সব মিলিয়ে অ্যালজীরজের সৌন্দর্য মনোমুগ্ধকর।

কাফেগুলিও সুন্দর সাজানো-গোছানো। তাদের সামনে প্রশস্ত ফুটপাথের একাংশ জুড়ে ছোট-ছোট টেবিল-চেয়ার পাতা। মার্বেল পাথরের টেবিলও আছে বিভিন্ন কাফের সামনে।

ঘুরতে-ঘুরতে একটা কাফের সামনে এসে চেয়ার টেনে বসে পড়লাম আমরা। চা বা কফি, যা হোক একটা দরকার।

ফার্গুসন হঠাৎ জিজ্ঞেস করে,—প্যারিসে গেছো তোমরা?

কনর্যাড ও রিচার্ড যায় নি।

ফার্গুসনের প্রশ্নটা শুনে কেমন যেন সন্দেহ হলো। বললাম,—হ্যাঁ, গেছি। কেন বলো তো?

প্যারিসের এক ছোট্ট সংস্করণ বলা যায় এ শহরটাকে। —মাতব্বরির ভঙ্গিতে বললে ফার্গুসন। তার কথায় সূক্ষ্ম তাচ্ছিল্যের সুর, বিশেষ করে শহরের এদিকটা তো প্যারিসেরই পুরো অনুকরণ, অবিশ্যি অত সুন্দর নয়।

মনের বিরক্তি চেপে চাপা কণ্ঠে বললাম,—ভুলে যেও না ফার্গুসন, ফরাসিরা এদেশে রাজত্ব করে গেছে সওয়াশো বছরের ওপর। তারাই নিজেদের পছন্দমতো তৈরি করেছে এ শহর। কাজেই আসল-নকলের প্রশ্ন ওঠে না।

ইতিমধ্যে আমাদের ঠিক পাশের টেবিলে একটা চেয়ার দখল করে বসেছেন এক ভদ্রলোক—মনে হলো, আমাদের পেছন-পেছনই এসেছেন। তিনিও কফির অর্ডার দিলেন আমাদের মতো।

আমার জবাবে ফার্গুসন থতমত খেয়ে যায়। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! একটু আমতা-

আমতা করে সে বললে,—হ্যাঁ, তা, ঠিকই বলেছ বটে, কিন্তু শহরটার দীনহীন চেহারা বড় চোখে লাগে। রাস্তাঘাট কেমন নোংরা, ভাঙাচোরা, দেখেছো। রাস্তার ধারে, বিভিন্ন খোলা জায়গাগুলোতে সব ঝুপড়ি—গরিবদের আস্তানা। বড়-বড় বাড়িগুলোর মেরামত-চুনকাম হয়নি, মনে হয় অনেককাল।

বেশ বুঝতে পারছি, পাশের ভদ্রলোকটি কান খাড়া করে আছেন। আমার সঙ্গীদের কিন্তু সেদিকে নজর নেই। ফার্গুসনের তো নেই-ই। হাঁদাটাকে কিভাবে এ আলোচনা থেকে নিরস্ত করবো, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে।

কিন্তু ভদ্রলোকটি কে? সুবেশ, সুদর্শন যুবক, আমাদের বয়সি হবেন, মনে হয়। আমাদের মতো বিদেশি নাকি, না এদেশি? দক্ষিণ ইউরোপের লোক হওয়াও বিচিত্র নয়। উত্তর ইউরোপীয়দের তুলনায় দক্ষিণ ইউরোপের অনেক বাসিন্দারই গায়ের রঙ বেশ ময়লা। কে উনি—আমাদের কথা শোনার জন্যে এত উৎকর্ণ কেন?

ফার্গুসনের কথায় মনের বিরক্তি আর পুরো চেপে রাখা গেল না। একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বেরিয়ে এল জবাবটা, যদিও যথেষ্ট চাপা গলায়,—এদেশের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস কিছু জানো তুমি? জানো না। জানার চেষ্টাও করো নি। অথচ হাবা গঙ্গারামের মতো বকরবকর করতে আটকাচ্ছে না। আমি ভারতীয়, ভারত আমার জন্মভূমি, জানো তো? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের পদানত করে রেখেছিল প্রায় দুশো বছর। তাই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও অত্যাচার যে কি বস্তু, তা আমরা হাড়ে হাড়ে জানি। তোমরা তা কল্পনাতেও আনতে পারবে না। এদেশও তেমন ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের খপ্পরে পড়ে রক্তশূন্য হয়ে গেছে। সদ্য-স্বাধীন দেশ—নির্বিচার শোষণের সে ধাক্কা আজো সামলে উঠতে পারে নি। সময় লাগবে। এসব জানলে, দরদ ও সহানুভূতির সঙ্গে সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করতে পারতে। যাই হোক, আমার মনে হয়, এসব আলোচনায় যাওয়া আমাদের ঠিক হবে না।

কনর‍্যাড ও রিচার্ড আমার কথায় জোরালো সমর্থন জানালো।

কথা বলতে বলতে গোপনে নজর রাখছি ভদ্রলোকের ওপর। আমার জবাব কতটুকু তাঁর কর্ণগোচর হয়েছে, বোঝা মুশকিল। কিন্তু দেখি, শুনতে-শুনতে চোখমুখ তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আর তার পরেই, চেয়ার টেনে তিনি সরে এলেন আমার পাশে। উৎফুল্ল কণ্ঠে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বললেন,—কিছু মনে করবেন না, আপনাদের কথার মাঝখানে এভাবে নাক গলাচ্ছি বলে মাফ চাইছি। আপনার কথায় জানলাম, ভারত আপনার দেশ, আপনি ভারতীয়। তাই আগ্রহটা আর চেপে রাখতে পারছি নে। সাহারা অভিযানের সঙ্গে কি আপনি জড়িত?

সর্বনাশ! ভদ্রলোক দেখছি, আমাদের খবর মোটামুটি সবই রাখেন। শেষকালে গোয়েন্দার পাল্লায় পড়লাম নাকি?

ফার্গুসনের অবস্থা শোচনীয়। সে ঘামছে। ঘাবড়ে তো গেছেই, সন্ত্রস্তও হয়ে উঠছে পুরোদস্তুর। তৎক্ষণে কর্তব্য আমার স্থির হয়ে গেছে, ফার্গুসনকে বাঁচাতে হবে যেভাবে হোক।

ফার্গুসনের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক হেসে ফেললেন,—আপনি, মনে হচ্ছে, বেশ উদ্বিগ্ন বোধ করছেন? ভাবছেন, আমি হয়তো গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত। মোটেই তা নয়। আমার পরিচয় পেলে ও সব শুনলে, বুঝতে পারবেন, আশঙ্কার বিন্দুমাত্র কারণ নেই।

বলতে-বলতে ভদ্রলোক থেমে যান। তারপর কুণ্ঠিত স্বরে বললেন,—মাফ করবেন, আপনারা কি ফরাসি ভাষা জানেন? ইংরেজি আমি বুঝি, কিন্তু কথা বলতে অসুবিধে হয়। অনভ্যাসের ফল আর কি।

অবস্থা ঠিকমতো সামাল দেবার জন্যে সঙ্গীদের কথা বলতে দেওয়া আমার ইচ্ছে নয়। তাই ফরাসিতে আমিই জবাব দিলাম,—আপনি স্বচ্ছন্দে ফরাসিতে বলতে পারেন। আমরা কানাডার লোক। ইংরেজি ও ফরাসি, দুটো ভাষাই আমাদের রপ্ত করতে হয়। কিছু মনে করবেন না, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। আমরা যে সাহারা অভিযানে এসেছি, আপনি তা কি করে জানলেন?

হ্যাঁ, আমিও সে কথাটা সবার আগে বলতে চাই। —চমৎকার ফরাসিতে বললেন ভদ্রলোক, আপনারা আমাদের সম্মানিত অতিথি। এমন কোনওকিছু আমাদের কখনই কাম্য হতে পারে না, যাতে আপনারা সন্দেহ বা অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। সাহারা অভিযানে অ্যালিজিরিয়ার পক্ষ থেকে যারা আপনাদের সঙ্গে থাকবে, আমি তাদের একজন। আপনাদের দেখাশোনার দিকে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব আমার ওপর। আজ সকালে আপনাদের হোটেলে গেছিলাম। এ অভিযানের অধিনায়ক ডঃ নিকল্‌সনের সঙ্গে কথা বলেছি। ডঃ স্মিথ, ডঃ রাসেল এবং বিগ্রেইডিয়ার গর্ডনের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে।

তারপর আমার সঙ্গী তিনজনকে দেখিয়ে তিনি বললেন,—ওদের সে-সময় হোটেলে দেখেছিলাম। কিন্তু আপনাকে দেখিনি। তা, আপনাদের নাম ও পরিচয় যদি জানতে পারি তো খুবই আনন্দিত হবো। আপনি ভারতীয় হয়ে কিভাবে এ অভিযানের সঙ্গে জড়িত হলেন সেটাও দয়া করে বলবেন।

সঙ্গী তিনজনের পরিচয় দিয়ে আমি নিজের নাম বলতেই, ভদ্রলোক হই-হই করে উঠলেন,—অ্যাঁ আপনি? আরে মশাই, আপনিই ডঃ চৌধুরী? অভিযানের নেতা ডঃ নিকল্‌সন ও মিঃ গর্ডন কথাপ্রসঙ্গে বারবার আপনার নাম বলছিলেন। আচ্ছা, আচ্ছা, আপনার মতো গুণী ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়ে—

অনেকটা ধমকের সুরে তাঁকে থামিয়ে দিলাম,—ওসব ছাড়ুন তো। যারা নিজেরা সত্যিকার জ্ঞানীগুণী, তাঁদের মুখে অন্যের প্রশংসা শুনলে তাতে সবসময় গুরুত্ব দিতে নেই। তাঁদের কাছে থেকে ওটাই প্রত্যাশিত। তাঁরা দুনিয়াকে দেখেন নিজের মতো করে।

এর পর সংক্ষেপে জানালাম, এ অভিযানে কি করে আমার যোগদান সম্ভব হলো। শুনতে শুনতে ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। আমার ডান হাতটা নিজের হাতে চেপে ধরে বললেন,—বাধা দেবেন না ডঃ চৌধুরী, আজ আমি নিজেকে বিশেষ ভাগ্যবান মনে করছি। সুবিশাল দেশ ভারত সম্বন্ধে অনেক শুনেছি, পড়েছিও কিছু-কিছু। সুপ্রাচীন এক মহান সভ্যতার সে অধিকারী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার গৌরবময় স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী আমাদের সবসময় প্রেরণা যুগিয়েছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি এবং পরবর্তী কালে স্বাধীন অ্যালজিরিয়ার প্রতি স্বাধীন ভারতের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সাহায্যও আমাদের এক চিরস্মরণীয় সম্পদ। আজ সেই মহান দেশের এক সুযোগ্য সন্তানের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে নিজেকে যে কতখানি ধন্য মনে করছি, তা বলে বোঝাতে পারবো না। আমাদের—

আবার থামাতে হলো ভদ্রলোককে। বললাম,—কে আপনাকে বলেছে, বোঝানোর জন্যে এভাবে সময়ের অপব্যয় ও পণ্ডশ্রম করতে! দয়া করে ওসব ছাড়ুন। আপনি কিন্তু এখনও নিজের পরিচয় দেন নি। ওটা জানতে পারলে খুব বাধিত হবো।

ভদ্রলোক এবার সে পরিচয়টা দিলেন। তাঁর নাম এস. বিতাত। ইঞ্জিনিয়ার সরকারের শক্তি, পেট্রোলিয়াম ও খনিজ মন্ত্রকের জয়েন্ট সেক্রেটারি। উপরন্তু সরকারি দলের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য পরিচালক হিসেবে তিনি থাকছেন এই অভিযানে।

মিঃ বিতাত একটু বেশি ভাবপ্রবণ বলে মনে হয়। তাঁর খোলামেলা ব্যবহার ও কথাবার্তায় মন আমার খুশি হয়ে উঠেছে। হয়তো বা ভারত এবং নিজের সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসবাণী শোনাও এর অন্যতম কারণ হতে পারে। তা হলেও, ব্যাপারটা তেমন দূষণীয় বলে মনে করা মুশকিল। আমাদের পুরাণশাস্ত্রমতে স্তবে অর্থাৎ তোয়াজে দেবতারা পর্যন্ত যেখানে অসংখ্যবার দিশেহারা হয়েছেন, নিদারুণ ঘায়েলও হয়ে গেছেন, সেখানে আমি আর. কে. চৌধুরী কোন্ ছার! তবে এই বিদেশবিভুঁইয়ে ওরকম আত্মহারা দিশেহারা হওয়া কখনই যুক্তিযুক্ত হবে না।

তাই যথাসাধ্য সংযত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম,—তা, আপনি আমাদের পেছনে লেগেছেন কেন, বলুন তো? কখন থেকেই বা লেগেছেন?

কী সর্বনাশ! —ব্যস্তকণ্ঠে বললেন মিঃ বিতাত ঃ কখ্খনও না। আমি কখনই আপনাদের পেছু নিই নি। কেন নিতে যাবো? আপনাদের হোটেলে যাবার জন্যে পায়দলে বেরিয়েছিলাম। দূর থেকে হঠাৎ আপনাদের চারজনকে দেখে আলাপ করতে ইচ্ছে হলো। আমি কাছে আসতে না আসতেই আপনারা এই কাফেতে এসে বসলেন। এই তো ঘটনা।

যাক, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের যে বাষ্প আমাদের মনের ওপর এতক্ষণ চাপ সৃষ্টি করেছিল, তা নিঃশেষে উবে গেল।

মিঃ বিতাত এদিকে ফার্গুসনকে লক্ষ্য করে তখন বলছেন,—দয়া করে মন থেকে সমস্ত অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলে দিন, মিঃ ফার্গুসন। বিব্রত বোধ করার কোনও কারণ নেই। অ্যালজীর্‌জের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আপনার মন্তব্যে কোনও মিথ্যা নেই। তেমনি ডঃ চৌধুরী যা বলেছেন, তাও খুব উপভোগ্য এবং বড় সত্য। আপনার কথা মনে হয়েছে, অ্যালিজিরিয়া সম্বন্ধে জানার সময় বা সুযোগ আপনার হয় নি। আমার এ ধারণা অবশ্য ভুল হতে পারে।

না, না,—সলজ্জ কণ্ঠে বলে ফার্গুসন, আমাকে আর লজ্জা দেবেন না, মিঃ বিতাত। মনেপ্রাণে স্বীকার করছি, সময় ও সুযোগের প্রশ্ন এক্ষেত্রে অবান্তর। আসল কথা হলো মন। অ্যালজিরিয়া সম্বন্ধে যে জানা প্রয়োজন, মনের সে তাগিদই কোনওদিন বোধ করি নি। আজ মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি, এটা আদৌ সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ নয়। আপনার কাছে বিশেষ অনুরোধ, অ্যালজিরিয়ার সঠিক ইতিহাস পেতে পারি, এমন একখানা বইয়ের নাম বলুন, যা এখানে সহজলভ্য।

আমি বাধা দিলাম,—ধেৎ বাজে কথা! সে বইয়ের পাতা ওলটানোর সময় কোথা থেকে পাবে, শুনি? আগামী পরশুই তো এখানকার পাট চুকিয়ে বিস্‌ক্রায় রওনা দিতে হবে। সেখানে চলবে সাহারায় ঢোকার প্রস্তুতি—তুলকালাম ব্যাপার। তার মধ্যে পারবে সে বই স্পর্শ করতে?

তার চেয়ে,—মিঃ বিতাতের দিকে আমি তাকাই, আমার একটা প্রস্তাব আছে। এখন আপনার যদি কোন জরুরি কাজ বা ব্যস্ততা না থাকে, তা হলে আমার অনুরোধ, আপনিই বলুন অ্যালজিরিয়ার ইতিহাস এবং তার স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী। সংক্ষেপে হলেও, আপনার মুখ থেকে শোনা সে ইতিবৃত্ত আমাদের কাছে হবে অনেক বেশি আকর্ষণীয় এবং শিক্ষাপ্রদ।

ফার্গুসন, রির্চাড এবং কনর‍্যাড একবাক্যে আমার কথায় সায় দেয়, অনুরোধ জানায় মিঃ বিতাতকে।

কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবেন মিঃ বিতাত। শেষে বললেন,—বেশ। আপনাদের কথাই শিরোধার্য। তবে বলবো অত্যন্ত সংক্ষেপে। প্রাচীন বা মধ্য যুগের ইতিহাস খুবই অল্প কথায় সেরে যাবো। কিন্তু তার আগে কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করা যাক। সেই ফাঁকে আমিও মনে-মনে বিষয়টা গুছিয়ে নেবার সময় পাবো।

জলযোগের ব্যাপারে কনর‍্যাড আপত্তি করতে যেতেই মিঃ বিতাত বাধা দিলেন,—এ ব্যাপারে আপনাদের বিব্রত হবার কোনও কারণই থাকতে পারে না। দয়া করে ভুলে যাবেন না, আপনারা সম্মানিয় অতিথি। অতিথিসংকার করা সবচেয়ে বড় কর্তব্য, এটা আশা করি স্বীকার করবেন।

মিঃ বিতাতের সঙ্গে যে একজন আর্দালি রয়েছে, এতক্ষণ তা লক্ষ্য করিনি। তাকে ডেকে তিনি অপ্যায়নের যে ব্যবস্থা করলেন, তা মোটেই ছোটখাট ব্যাপার নয়। দেখে ভালো লাগলো যে, সে ব্যবস্থা থেকে আর্দালিটিও বাদ গেল না।

এবার শুরু করা যাব। —মিঃ বিতাত বললেন, অ্যালজিরিয়ার ইতিহাস বলতে এখনও পর্যন্ত মোটামুটি তিন হাজার বছরের ইতিহাস জানা গেছে। তার আগের ইতিহাস আজও অজ্ঞাত। অথচ মানুষের উদ্ভবের কাল থেকেই এ অঞ্চলটা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। তাই অনেক প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিশেষজ্ঞের দৃঢ় বিশ্বাস, এটা মানবসভ্যতার অন্যতম পীঠস্থানও হওয়া সম্ভব। সেই সুদূর অতীতকে জানা আজ আমাদের অবশ্য-করণীয় কাজের একটি। যাই হোক, তিন হাজার বছর পেছনে তাকালে মনে হয়, এ এলাকায় প্রথম দিকে নিগ্রো জাতির বাস ছিল। তারপর দলে দলে এসেছিল যাযাবর বারব্যার জাতির লোক। এ দেশকে তারা আপন করে নেয়। অ্যালজিরিয়ার বর্তমান জনসংখ্যার তারা খুব বড় একটা অংশ। ইউরোপের ইতিহাস-নৃতত্ত্ববিদ্‌দের অনেকের ধারণা, বারব্যাররা এসেছিল ইউরোপীয় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল থেকে। এ নিয়ে অবিশ্যি যথেষ্ট মতভেদ আছে।

ইতিমধ্যে কাফের পরিচারকরা এসে চারখানা টেবিল একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে গেছে। তার ওপর থরে থরে মজুত হচ্ছে ভোজ্যবস্তু।

মিঃ বিতাতের কাহিনী এগিয়ে চলেছে,—এ দেশে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটেছে বারেবারে, সেই প্রাচীন কাল থেকে। এ দেশে উপনিবেশ-স্থাপনে, যতদূর জানা যায়, প্রথম পথিকৃৎ ছিল ফিনিশীয়রা। সমুদ্রপথে তারা এসেছিল ১১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তার পর থেকে একের পর এক স্রোতের মতো এসেছে বহিরাগত হানারদারদের দল। তাদের মধ্যে যারা প্রধান এখানে শুধু তাদেরই কয়েকটির নামোল্লেখ করবো। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সাগরপারের রোমানরা এসে এদেশ দখল করে। বিতাড়িত হয় ফিনিশীয়রা।

পঞ্চম খ্রিস্টাব্দের প্রথমার্ধে এল ভ্যানডলরা। রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হলো। শতবর্ষ পরে বাইজ্যানটাইন সাম্রাজ্যের রোমানরা এসে অধিকার করলো এ এলাকা। পর্যুদস্ত হলো ভ্যানডলরা।

ইতিমধ্যে আমাদের সামনে টেবিলের ওপর সদ্‌গতির প্রতীক্ষায় এসে হাজির হয়েছে উপাদেয় বস্তুগুলি। তাদের সুগন্ধে সকলের, বিশেষ করে রির্চাডের নাকে যে যথেষ্ট সুড়সুড়ি লাগছে, তা হলপ করে বলা যায়। অচিরে মিঃ বিতাতের অনুরোধে ও পরিচালনায় বস্তুগুলোর সেবার কাজে নেমে পড়লো সবাই।

মিঃ বিতাতের কথিকা কিন্তু থেমে নেই ঃ তিনি বলছেন,—এর পর সপ্তম খ্রিস্টাব্দ থেকে শুর হলো আরবদের আগমন। এদেশকে তারা শুধু জয়ই করলো না, নিজের দেশ বলে গ্রহণ করলো। বিভিন্ন সময়ে বিরাট বিরাট দলে তারা এসেছে একাধিকবার। অ্যালজিরিয়াকে তারা দিয়েছে আরবি ভাষা ও ইসলামি ধর্ম। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, সমাজে ও সভ্যতায় তাদের অবদানের সীমা নেই। আজকের অ্যালজিরিয় জনসমাজে তারা অধিকার করে আছে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ স্থান। এর পর আসে তুর্কিরা। ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় গোড়া থেকে ফরাসি আক্রমণের সময় পর্যন্ত অ্যালজিরিয়া থাকে তুরস্কের অট্যম্যান সাম্রাজ্যের শাসনে। মাঝে বেশ কিছুকালের জন্যে স্প্যানিশ বা স্পেনীয়দেরও দখলে ছিল তার প্রধান-প্রধান সব বন্দর।

মিঃ বিতাতের কাহিনী যেমন এগিয়ে চলেছে, তেমনি আমাদের হাত, মুখ ও কানও নিষ্ক্রিয় বসে নেই। একযোগে চলেছে সব ক'টি অঙ্গের কর্মোদ্দীপনা।

মিঃ বিতাত তখন বলছেন,—ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের কথায় আসবার আগে পেছনের দিকে তাকালে ইতিহাসের কয়েকটা শিক্ষা আমাদের কাছে ভাস্বর হয়ে ওঠে। প্রথমত এই যে বারবার এসেছে বহিঃশত্রুর দল, এ দেশের মানুষ কিন্তু বিনা প্রতিরোধে মেনে নেয়নি তাদের অধীনতা-দাসত্ব। অ্যালজিরিয়া তখন নানা অংশে খণ্ডবিচ্ছিন্ন। জাতীয়তাবাদ বা জাতীয় ঐক্যের উন্মেষ আশা করা যায় না। তবু তারা বাধা দিয়েছে প্রাণপণে। দ্বিতীয়ত, শুধু ধ্বংসে আগুন, অত্যাচার ও লুটপাটের তরবারি হাতে এসেছিল যেসব হানাদারের দল, শুধু অশ্রু, রক্ত ও নিপীড়নের বন্যা বইয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদীরা, তারা টিকতে পারে নি, কালস্রোতে কোথায় বিলীন হয়ে গেছে। হয় দেশের জনসমাজে লুপ্ত হয়ে গেছে, নয়তো সমূলে উৎখাত হয়েছে—কোনও চিহ্নই রেখে যায় নি পেছনে। তৃতীয়ত, কিন্তু তাদের মধ্যে যারা বিজিত দেশকে নিজের বলে গ্রহণ করেছিল, ভালোবেসেছিল এদেশকে, তারা কিন্তু টিকে আছে, সগৌরবে রয়ে গেছে বারব্যার এবং আরবদের মতোই।

শুনতে-শুনতে আমার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। সুদূর আফ্রিকা মহাদেশের সর্বোত্তরে এক প্রান্তে বসে মনের মাঝে কেবলই গুঞ্জরিত হচ্ছে কবিগুরুর 'ভারততীর্থ'-এর কয়েকটি পঙক্তি ঃ

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।

... ...

রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদকলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর—
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।

বললাম,—মিঃ বিতাত, অধিকাংশ দেশেরই, বিশেষ করে প্রাচ্যের দেশগুলির বোধহয় এই একই ভাগ্য, একই ইতিহাস। ভারতবর্ষের ইতিহাসও ঠিক এইরকম।

আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়েন মিঃ বিতাত,—ঠিকই বলেছেন। এবার আমি বলবো ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের দখলদারির কথা। ১৮৩০ সাল থেকে শুরু হয় তাদের

আক্রমণ। অ্যালজিরিয়রা তীব্র প্রতিরোধ চালাছে থাকে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই গোটা অ্যালজিরিয়া ফ্রান্সের কুক্ষিগত হয়।

সূর্য বেশ কিছুটা নেমে পড়েছে অস্তাচলের দিকে। সৌধ-অট্টালিকা ও গাছপালার ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে ক্রমেই। মনোরম অপরাহ্ন। তার মধ্যে টেবিল ক্রমেই সাফ হয়ে আসছে।

মিঃ বিতাত বলছেন,—এবার অ্যালজিরিয়া হাড়ে হাড়ে টের পেতে থাকে একচেটিয়া পুঁজিবাদের চরম রূপ ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ কী বস্তু। অতীতের বিদেশি দখলদারির সঙ্গে কারও কোনও মিলই নেই, দুইয়ের মধ্যে আকাশপাতাল চরিত্রগত পার্থক্য। অতীতে বিদেশি দখলদাররা লুটপাট অত্যাচার করেছে বটে, কিন্তু দেশের মূল সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোটা ভাঙেনি বা ভাঙতে পারে নি। কিন্তু ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ তথা একচেটিয়া পুঁজিবাদ নিজেদের শোষণের স্বার্থেই কৃষিনির্ভর অ্যালজিরিয়ার ভূমিব্যবস্থা, শিল্প কারিগরি-ব্যবস্থা, গ্রামকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা সব কিছুই ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দেয়। জমি থেকে উৎখাত হয় লক্ষ-লক্ষ চাষী, সবচেয়ে উর্বর সরেস অধিকাংশ জমি দখল করে বসে ফরাসি জমিদাররা যাদের বলা হতো 'কল্যন'।

সঙ্গীদের দিকে আমার নজর পড়ে। চোখ তাদের, বলতে গেলে, বিস্ফারিত। খাওয়া ভুলে তিনজনই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে মিঃ বিতাতের দিকে। এ ভয়ঙ্কর কাহিনী যে তাদের কাছে অকল্পনীয়, তা বুঝতে অসুবিধা হল না।

মিঃ বিতাত বলে চলেছেন,—দেশি কুটিরশিল্পকে ধ্বংস করে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীরা অ্যালজিরিয়াকে ধাপে-ধাপে পরিণত করলো নিজেদের শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী বিক্রির একচেটিয়া বাজারে। তার ফলে অসংখ্য শিল্প-কারিগর বেকার হলো। এ দেশের কাঁচামাল ফ্রান্সের যন্ত্রশিল্পের জন্য সস্তায় চালান যাবারও ব্যবস্থা করলো তারা। এ দেশে কলকারখানা তারা যা গড়েছে, সবই নিজেদের স্বার্থের তাগিদে। নিজেদের শাসন ও শোষণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততটুকু রেলপথ ও রাস্তাঘাট তারা তৈরি করে। অতি-সীমিত যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-ব্যবস্থা তারা চালু করেছিল, তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের শাসন ও শোষণের যন্ত্র চালু রাখার জন্যে একদল স্তাবক ও চাকুরে তৈরি করা। সংক্ষেপে বলতে গেলে, অ্যালজিরিয়ায় তখন দুই চরম অবস্থা বিদ্যমান। একদিকে ক্ষমতামদমত্ত শাসক ও শোষক শ্রেণীর আকাশচুম্বী ঐশ্বর্য ও স্পর্ধার চোখ ধাঁধানো রূপ, অন্য দিকে রুজিরোজগারহীন অধিকাংশ মানুষের অসহায় দারিদ্র্য এবং অশিক্ষা ও কুসংস্কারের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

আমি আর চুপ করে থাকতে না পেরে বললাম,—মাফ করবেন মিঃ বিতাত, আপনার মুখে আমি যেন শুনছি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদানত শোষিত-নিপীড়িত ভারতবর্ষেরই মর্মবেদনার কাহিনী। একচেটিয়া পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণের রূপ ও চরিত্র উপনিবেশগুলির সর্বত্রই হয় একইরকম।

সোৎসাহে সায় দেন মিঃ বিতাত,—খাঁটি কথাই বলেছেন। এই সর্বব্যাপক ধ্বংসের ফলও কিন্তু ভারতবর্ষের মতো এখানেও হলো সুদূরপ্রসারী । ইতিহাসের গতি কখনও থেমে থাকে না। শাসক-শোষকদের অলক্ষ্যে ধীরে-ধীরে শুরু হয় সৃষ্টির বেদনা, শুরু হয় গঠনের আলোড়ন। আধুনিক শিক্ষার ফলে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের মধ্যে জন্ম নেয় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ। রেলপথ ও রাস্তাঘাট স্থাপনের ফলে যোগাযোগের ব্যবস্থা সুগম হওয়ায় পরস্পরের অনেক কাছাকাছি আসে অ্যালজিরিয়রা। তাদের মধ্যে জাগতে থাকে জাতীয় ঐক্যবোধ।

বলতে-বলতে হঠাৎ থেমে যান মিঃ বিতাত। শশব্যস্তে বলেন,—এ কী, আপনারা হাত গুটিয়ে বসে আছেন যে? কী সর্বনাশ! অ্যালজিরিয়ার ইতিহাস বলতে গিয়েই অজ্ঞাতে অন্যায় কিছু বলে ফেলেছি কিনা বুঝতে পারছি না। নাকি বক্তব্যটা আপনাদের কাছে নীরস একঘেয়ে লাগছে?

জবাব দিল কনর‍্যাড। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,—কী বলছেন, মিঃ বিতাত? অন্যায়ের প্রশ্নই ওঠে না। আর নীরস একঘেয়ে? আপনি ধারণা করতে পারবেন না মিঃ বিতাত, এ ইতিহাস আমাদের কাছে শুধু অশ্রুতপূর্বই নয়, কতখানি ভয়ংকর ও সাংঘাতিক। আমাদের পড়া কোনও ইতিহাস বইতে এসবের উল্লেখও পাই নি। শুনতে-শুনতে এত তন্ময় হয়ে গেছিলাম যে, টেবিলের দিকে নজর ছিল না। আপনি বলুন, অ্যালজিরিয়ার জাগরণের কাহিনী শুনতে চাই।

আপনি ব্যস্ত হবেন না, মিঃ বিতাত। —মুচকি হেসে আমি যোগ করি, কনর‍্যাড খুব খাঁটি কথাই বলেছে। আমাদের অন্য দুই বন্ধু রিচার্ড এবং ফার্গুসনেরও আশা করি তার কথায় পূর্ণ সমর্থন আছে।

অবশ্যই, অবশ্যই। আমাদেরই মনের কথা বলেছে কনর‍্যাড।—দুজনেই প্রায় সমস্বরে গেঙিয়ে উঠলো।

ততক্ষণে সবারই আবার শুরু হয়েছে হাত ও মুখের কাজ।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মিঃ বিতাত আবার শুরু করেন,—বিধ্বস্ত গ্রামীণ ও কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে উৎখাত অসংখ্য চাষী-কারিগরদের একাংশ শোষকদের কলকারখানায়, রেল ও অন্যান্য যানবাহনে এবং কল্যনদের জমিদারিতে মজুরের কাজ পায়। জন্ম নেয় শ্রমিকশ্রেণী। অ্যালজিরিয় জনসাধারণের মনে এ চেতনা তখন ক্রমেই বাড়ছে যে, ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীরাই তাদের সবচেয়ে বড় মারাত্মক শত্রু। ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিকের জোট। একটু একটু করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে স্বাধীনতা আন্দোলন।

হ্যাঁ,—আমি বলি, এটাই হলো আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের ললাটলিখন বা নিয়তি। ইতিহাসের হাতে দূরদৃষ্টিহীন অজ্ঞ ক্রীড়নক বা অন্ধ যন্ত্র হিসেবেই তারা নিজেদের ভূমিকা পালন করে যায়। নিজেদের অন্ধ স্বার্থের তাড়নায় যে-সব কর্ম ও অপকর্ম তারা করে প্রাচ্যের উপনিবেশগুলিতে, সে-সবের ফল কালে কালে তাদের বিরুদ্ধেই যায়, তাদের পক্ষে হয়ে দাঁড়ায় প্রাণঘাতী। সর্বত্রই ঘটছে এটা।

কয়েক মুহূর্ত মিঃ বিতাত তাকিয়ে থাকেন আমার মুখের দিকে। তারপর মৃদু হেসে আবার বলতে শুরু করেন—প্রথমে অ্যালজিরিয়ার দাবি ছিল শুধু স্বায়ত্তশাসন এবং তা সীমাবদ্ধ ছিল আবেদন-নিবেদনের মধ্যে। কিন্তু সেটুকুও ফরাসি সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। শেষ পর্যন্ত অ্যালজিরিয়া দাবি করলো পূর্ণ স্বাধীনতা। এ দাবিতে একদিকে চলতে থাকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, অন্যদিকে ফরাসি সরকারের যথেচ্ছ নিপীড়ন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায়। ফ্রান্সের চরম বিপর্যয় ঘটে নাৎসি জার্মানির হাতে। খোদ ফ্রান্স এবং সেই সঙ্গে উত্তর আফ্রিকার অ্যালজিরিয়া প্রভৃতি তার উপনিবেশগুলিও চলে যায় জার্মানির খপ্পরে। এই সময়ে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী স্বাধীন ফরাসি সরকার অ্যালজিরিয়াকে প্রতিশ্রুতি দিলে যে, যুদ্ধে জয়লাভ করলে তারা তার দাবি মেনে নেবে।

টেবিল ততক্ষণে ফরসা হয়ে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে মিঃ বিতাত বললেন,—সামান্য আর কিছুর অর্ডার দিই, কী বলেন?

কখ্খনও না। —আমি রুখে উঠলাম, আপনি কি আমাদের রাক্ষস পেয়েছেন?

—আচ্ছা বেশ, তা হলে শুধু কফির অর্ডারই দেওয়া যাক।

সেই মতো ব্যবস্থা করে মিঃ বিতাত আবার শুরু করেন,—প্রবাসী সরকারের কথায় বিশ্বাস করে অ্যালজিরিয়া সেদিন সাধ্যমতো সাহায্য করেছিল মিত্রপক্ষকে। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি আপনারা জানেন। ইউরোপের রণাঙ্গনে চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে জার্মানির। কিন্তু তার অনেক আগেই ১৯৪২ সালে অ্যালজিরিয়া মুক্ত হয়েছিল জার্মানির কবল থেকে এবং প্রবাসী ফরাসি সরকারের সদর দপ্তর স্থাপিত হয়েছিল এখানেই।

ইতিমধ্যে কফি এসে গেছে। তাতে এক চুমুক দিয়ে মিঃ বিতাত বললেন,—ইউরোপে জয়লাভ করায় মিত্রপক্ষের তরফ থেকে ১৯৪৫ সালের ৮ই মে ধার্য হয় উৎসবের দিন। স্বাধীন ফরাসি সরকারকে তাদের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে সমগ্র অ্যালজিরিয়া সেদিন বুঝি পথে নেমেছিল, শান্তিপূর্ণ মিছিলে সামিল হয়েছিল লক্ষ-লক্ষ নিরস্ত্র নরনারী—আবালবৃদ্ধবণিতা। প্রতিদানে ফরাসি সরকারের কাছ থেকে তারা কি পেয়েছিল, জানেন? পেয়েছিল ফরাসি সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে নির্বিচার গুলি আর গুলি। সেই অমানুষিক নৃশংস গণহত্যাকাণ্ডে সেদিন কত লোক মারা পড়েছিল, ভাবতে পারেন? প্রায় পয়তাল্লিশ হাজারের মতো।

অ্যাঁ! কী বলছেন? অকারণে এ কী সাংঘাতিক মারণযজ্ঞ!—আমাদের গলা চিরে যা বেরিয়ে এল, তাকে আর্তনাদ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। ফার্গুসন তো সেইসঙ্গে বিষমও খেলো প্রচণ্ড।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মিঃ বিতাত বলেন,—হ্যাঁ। অপ্রত্যাশিত এই পৈশাচিক আঘাতে শোকার্ত অ্যালজিরিয়া সেদিন স্তম্ভিত—রুদ্ধবাক্। তার পরেই তার কণ্ঠে জাগলো সমুদ্রের গর্জন, আর নয় আপস-আলোচনা। আপসপন্থী সংগঠন থেকে সদলে বেরিয়ে এলেন জনগণের সমস্ত প্রকৃত নেতা। গঠিত হলো জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট। তারপর ১৯৫৪ সালের ১লা নভেম্বর থেকে আরম্ভ হলো পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম। মাঝের কয়েকটা বছর ছিল প্রস্তুতির কাল। দীর্ঘ সাত বছর ধরে চলেছিল এই মরণপণ লড়াই। কত মহান আত্মবলিদান, কত চরম ত্যাগস্বীকার, কত বীরের মৃত্যুতে আকীর্ণ হয়ে আছে সে কাল, তার হিসেব নেই। অজস্র বীরত্বগাথা ছড়িয়ে আছে সারা দেশে।

শুনতে-শুনতে আমার মনের পর্দায় বারবার ভেসে উঠছে ভারতের সেই মহান বীর সন্তানদের ছবি, ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান। ক্ষণেকের জন্যে বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

মিঃ বিতাত তখন বলছেন,—প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি আমাদের স্বীকার করতে হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ফরাসি শাসক ও শোষণ শ্রেণীকেও কম ক্ষতি স্বীকার করতে হয় নি। তাদের মধ্যে তখন দেখা দিয়েছে মৃত্যুর আতঙ্ক। শেষ পর্যন্ত তারা বুঝলো, বিপ্লবী অ্যালজিরিয়াকে বশে আনা তাদের সাধ্যের বাইরে। তারপর রক্ত ও অশ্রুর সমুদ্র পার হয়ে এল সেই দিন ১৯৬২ সালের ৩রা জুলাই, যেদিন ফরাসি সরকার বাধ্য হলো অ্যালজিরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে। অ্যালজিরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হলো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।

মিঃ বিতাতের কাহিনী শেষ হয়। কেটে যায় মিনিটের পর মিনিট। কিন্তু কারও মুখে কথা নেই। নিস্তব্ধ পরিবেশ। ধীরে-ধীরে সন্ধ্যা নামছে।

শেষে একসময় কথা জোগাল ফার্গুসনের মুখে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললে,—অনবদ্য

অবিস্মরণীয় এ কাহিনী। আপনাকে খুব কষ্ট দিলাম, মিঃ বিতাত। এজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু আপনার এই কষ্টের বিনিময়ে আমাদের, বিশেষ করে আমার যা লাভ হলো, তার পরিমাণ করা কঠিন।

ফার্গুসনের কথা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে রিচার্ড ও কনর্যাড। আমিও পিছিয়ে থাকি না।

এর পর স্বাভাবিকভাবে দু-চারটে সৌজন্যমূলক বাক্য বিনিময় হতে না হতেই, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিঃ বিতাত একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন,—আজকের বিকেলটা বড় চমৎকার কাটলো। আরো সময় দিতে পারলে অত্যন্ত খুশি হতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, সে সময় আমার হচ্ছে না। আমাকে এখুনি একবার আপনাদের হোটেলে যেতে হবে। তারপর কাল সকালেই রওনা হবো বিস্ক্রা। অভিযানের উদ্যোগ-আয়োজনের জন্যে আমাদের লোকজন আগেই সেখানে চলে গেছে। তাই এখুনি বিদায় নিতে হচ্ছে বলে আমি মাফ চাইছি আপনাদের কাছে। বিস্ক্রায় আবার দেখা হবে। তা ছাড়া অভিযানেও তো থাকছি।

মিঃ বিতাত চলে গেলেন।

পায়ে-পায়ে আমরা এগিয়ে চলি উপকূলের দিকে। ফার্গুসন খুব গম্ভীর। নির্ঘাত ভাবছে কিছু একটা। আজকের ঘটনা, বিশেষতঃ অ্যালজিরিয়ার ইতিহাস তাকে যে খুব নাড়া দিয়েছে, সে তো জানা কথা।

আলোয় ঝলমল করছে সারা শহর, ঝলমল করছে অ্যালজীর্জ-উপসাগর। সবুজে ঢাকা পাহাড়গুলি সর্বাঙ্গে মাঝে-মাঝে অজস্র আলোর ঝিলিমিলি। সবুজের মাঝে তাদের দেখাচ্ছে লম্বা গোল চৌকো নানা আকারের ঝকমকে হীরকখণ্ডের মতো।

সেদিকে তাকিয়ে চিন্তাচ্ছন্ন কণ্ঠে নিজের মনে বিড়বিড় করছে ফার্গুসন, —সত্যিই তো, কতটুকু জানি! অথচ সাহারা অভিযানে যাচ্ছি। চুলোয় যাক, সে তো পরের কথা। কিন্তু এদিকটার এত শ্যামসবুজের সমারোহ, এত আলো, অথচ তার পরেই শুরু হয়েছে দগ্ধ ভয়ংকর সাহারা। এতবড় বৈষম্য বা পার্থক্য কি করে সম্ভব? সাহারা এখান থেকে কতদূর, তাই বা কে জানে! দেশটা ভারি বিচিত্র অদ্ভুত।

আমি হেসে ফেলি। তার পিঠে আস্তে চাপড় মেরে বলি,—ঘাবড়াও মাৎ, বন্ধু। তোমার ফ্যাসাদটা মালুম করতে পারছি। চলো, জেটিতে গিয়ে বসি। অ্যালজিরিয়ার ভৌগোলিক সংস্থান যতটুকু আমি জানি, সংক্ষেপে বলছি। তাতেই, মনে হয় কাজ চলে যাবে।

কনর্যাড ও রিচার্ড কলরব করে উঠলো,—ও সমস্যাটা শুধু ফার্গুসনেরই নয় চৌধুরী, আমাদেরও। বুঝলে, আমাদের মতো বালখিল্যদের তুমি উপযুক্ত গুরুই বটে। চলো, চলো।

বালখিল্যদের উপযুক্ত গুরু!

যথাসম্ভব হাস্যমুখে কথাটা হজম করতে হয়।

জেটির এক নিরালা কোণে গিয়ে বসি চারজন। কনর্যাড বললে,—এবার শুরু হোক, গুরুজি।

ফার্গুসনের দিকে তাকিয়ে আমি বলি,—তুমি বলেছ, দেশটা ভারি অদ্ভুত বিচিত্র। সত্যিই তাই। প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক বৈচিত্র্য ও বৈষম্য তার প্রায় তুলনাহীন। তার উত্তরে সবুজে শ্যামলা বনভূমি, উর্বর খেতখামার ও ফলফুলের বাগানবাগিচা, আর দক্ষিণে ঠিক তার বিপরীত—জলহীন জনহীন ঊষর মহামরুপ্রান্তর ভয়ংকর সাহারা। অ্যাটল্যাস পর্বতশ্রেণীর

জন্যেই সম্ভব হয়েছে এটা। অ্যালজিরিয়ার ভেতর দিয়ে গেছে এই গিরিশ্রেণী, তাকে ভাগ করেছে দুটো বিপরীত অংশে। এ কোন অ্যাটল্যাস জানো?

তিনজনই আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। শেষে কনর‍্যাড জিজ্ঞেস করে,—কোন অ্যাটল্যাস মানে?

বলি, গ্রীক, পুরাণটা পড়া আছে? —আমি তেড়ে উঠি।

না, তা, হাঁ,—আমতা-আমতা করে তিনটিই।

—এটাই সেই অ্যাটল্যাস দৈত্য গ্রীক পুরাণ-মতে যে পৃথিবীকে ঘাড়ে করে দাঁড়িয়ে আছে। দেবরাজ জেভি একবার বিষম চটে যান তার ওপর এবং তাকে শাস্তি দেবার জন্যে পৃথিবীর বোঝা চাপিয়ে দেন তার ঘাড়ে।

কী কাণ্ড! —রিচার্ড যেন হায়-হায় করে ওঠে ঃ কোথায় গ্রীস আর কোথায় উত্তর আফ্রিকার অ্যাটল্যাস পর্বত, মাঝখানে বিরাট ভূমধ্যসাগর! কি করে এটা সম্ভব হলো?

অ্যাটল্যাস বুঝি খুব বড় পর্বত? —ফার্গুসন জিজ্ঞেস করে।

না। —আমি মাথা নাড়ি, দৈর্ঘে ও উচ্চতায় অ্যাটল্যাস যে খুব বড় পর্বত, তা নয়। বিশেষ করে দুনিয়ার প্রথম শ্রেণীর মহাপর্বতমালাগুলির মধ্যে তাকে ফেলা চলে না। কিন্তু সেকালে অন্যান্য দেশের মানুষের মতো গ্রীকদেরও বৃহত্তর পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমিত। গ্রীক নাবিকদের চোখে তাই অ্যাটল্যাস ছিল মহাদৈত্য যার মাথা গিয়ে ঠেকেছে আকাশে।

নাঃ! গ্রীক পুরাণটা দেখছি পড়া উচিত। —রিচার্ড ডুকরে ওঠে। তার পরেই শোনা যায় তার খেদোক্তি, ধুত্তোর ছাই! কোনটা উচিত আর কোন্‌টা অনুচিত, তা ঠিক করতেই তো জীবনটা পার হয়ে গেল। যাক গে, বলো গুরু। তোমাকে দিয়ে একটা বইয়ের ফর্দ করিয়ে নিতে হবে।

বেশ, তাই হবে, বৎস। এবার শোনো। —আমি বলি, পশ্চিমে মরক্কোর পশ্চিম প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে পূবে টিউনিসিয়া পর্যন্ত চলে গেছে এই পর্বত। অ্যাটল্যাস কিন্তু একটা নয়, দুটো পর্বত শ্রেণী। একটি শ্রেণীকে বলে 'টেল অ্যাটল্যাস'। অন্যটিকে সাহারান বা সাহারীয় অ্যাটল্যাস। সাহারীয় অ্যাটল্যাসই সবচেয়ে উঁচু। তার কোনও-কোনও শৃঙ্গ সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে। এই দুই পর্বতশ্রেণীর মাঝখানে মালভূমি। এর ফলে অ্যালজিরিয়া কার্যত তিনটে প্রাকৃতিক অংশে বিভক্ত—টেল, উঁচু মালভূমি এবং সাহারা। আরবি ভাষায় 'টেল' মানে পাহাড়। ভূমধ্যসাগরের প্রশস্ত উপকূল বরাবর চলে গেছে এই টেল পাহাড়শ্রেণী। এই অঞ্চলটাই দেশের সবচেয়ে উর্বর অংশ। বেশির ভাগ খেতখামার, বাগান-বাগিচা, অরণ্য রয়েছে এই অংশে। অ্যালজীর্‌জের মতো দেশের প্রধান শহরগুলিও প্রায় সব এই টেল অঞ্চলে অবস্থিত।

বুঝতে পারছো তো রাসভদ্বয়,—ফার্গুসন ও রিচার্ডকে লক্ষ্য করে গম্ভীরকণ্ঠে কনর‍্যাড বলে, আমরা যেখানে আছি, এটা টেল অঞ্চল। ড্যাবডেবে চোখ দিয়ে ওই যে পাহাড়গুলো দেখছো, ওরা টেল পাহাড়শ্রেণীর অন্তর্গত। নাও, আবার শুরু করো, গুরু। হুঁ, মগজ তো নয়, যত্ত রাবিশ।

মুচকি হেসে আমি বলি,—টেল এবং সাহারীয় অ্যাটল্যাসের মাঝে যে প্রশস্ত উঁচু মালভূমির কথা বলেছি, সেখানে বড় গাছপালা প্রায় জন্মায় না বললেই হয়। প্রচুর পরিমাণে জন্মায় 'এসপ্যার্‌টো' নামে একজাতীয় লম্বা ঘাস যা কাগজ তৈরিতে ও অন্য নানা কাজে

লাগে। এখানে-ওখানে দেখা যায় ছোট-বড় অগভীর সব নোনা জলের হ্রদ, আরবিতে যার নাম 'চট্' বা 'শট্'। বছরের বড় একটা সময় তাদের অধিকাংশই শুকিয়ে থাকে। এই মালভূমির পরে দক্ষিণে বিরাট উঁচু পাঁচিলের মতো দাঁড়িয়ে আছে সাহারান বা সাহারীয় অ্যাটল্যাস। এই অ্যাটল্যাসের পাদদেশ বা তলা থেকে প্রায়, বলা যায় দক্ষিণে শুরু হয়েছে সাহারা মরুভূমি।

আমি থামতেই ফার্গুসন যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো,—বা চমৎকার! এতক্ষণে অনেকখানি পরিষ্কার হলো ধারণাটা।

না, শুধু তাই নয়,—আমি যোগ করি, এ অঞ্চলে ভূমধ্যসাগরীয় আবহাওয়ার প্রভাবও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

॥ দুই ॥

ট্রেনে চেপে অ্যালজীর্জ থেকে বিস্ক্রা।

ট্রেন চলেছে কোথাও অনুচ্চ পাহাড়ের ওপর দিয়ে, কোথাও পাহাড় ভেদ করে, কোথাও বা সমতল উপত্যাকার মধ্য দিয়ে।

পথে আসতে ট্রেন থেকে যতটুকু দেখা যায়, নজরে পড়েছে শস্যশ্যামল ফসলের খেত, বাগান-বাগিচা, বনাঞ্চল, স্থানে স্থানে ন্যাড়া পাহাড়ি অঞ্চল আর গ্রামের পর গ্রাম। দেখেছি খেতে-বাগিচায় কর্মরত এদেশি মানুষদের। শহরও চোখে পড়েছে কয়েকটা। কিন্তু প্রাচ্যের শান্ত নিরুপদ্রব পল্লী জীবন ও স্নিগ্ধ প্রকৃতি মনকে নাড়া দিয়েছে সবচেয়ে বেশি। বারবার মনে জেগেছে নিজের দেশের স্মৃতি। যেটুকু দেখেছি, তা অবিশ্যি সত্যিকার কোনও দেখাই নয়—সবই ওপর-ওপর, দূর থেকে চকিতের দেখা।

সাহারা মরুভূমির একেবারে কিনারায়, শুষ্ক পাথুরে বালুময় প্রান্তসীমায় বিস্ক্রা আজ এক কর্মব্যস্ত আধুনিক শহর। অথচ ফরাসিরা যখন এ অঞ্চল অধিকার করে, তখন কয়েকটা নগণ্য মাটির বাড়ি নিয়ে বিস্ক্রা ছিল সামান্য একটা পাহাড়ি গ্রাম, কয়েক ঘর দুঃস্থ গরিব মানুষের বসতি। সম্পদ বলতে কয়েকটা খেজুর গাছ। সবচেয়ে বড় অভাব ছিল জলের।

তারপর ইঞ্জিনিয়ারদের চেষ্টায় মাটির তলায় পাওয়া গেল বিপুল জলভাণ্ডারের সন্ধান। আর তার ফলে আলাদিনের প্রদীপের ছোঁয়ায় যেন জেগে উঠলো বিস্ক্রা শহর।

আজ কী নেই এ শহরে? প্রাসাদতুল্য সব হোটেল, দোকানপাট, কাফে প্রমোদোদ্যান, ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, রেলজংসন ইত্যাদি নিয়ে আর প্রায় আড়াইলাখ সতেজ খেজুর বীথি ও কুঞ্জের ঘন সবুজ পত্রপল্লবের স্নিগ্ধ ছায়ায় বিস্ক্রা এখন জমজমাট—এক গর্বিতা রূপসী নগরী। সাহারা দর্শন, ভ্রমণ এবং অভিযানের দিক থেকেও সে আজ এক অতিগুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। তাই বিদেশি পর্যটকদের ভিড় প্রচুর।

বিস্ক্রার দক্ষিণ থেকেই শুরু হয়েছে সাহারার সীমাহীন বিস্তার। এখানে আমরা অভিযাত্রীরা এসেছি সাহারার জলবায়ুর সঙ্গে যেমন খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে, তেমনি অভিযানের প্রস্তুতির জন্যেও বটে।

ডঃ নিকল্সন্, ব্রিগেইডিয়ার গর্ডন এবং মিঃ বিতাতের কাছ থেকে যেটুকু জানা গেল, তাতে অ্যালজিরিয় সামরিক বাহিনীর পনেরোজন উষ্ট্রারোহী সৈনিক যাচ্ছে অভিযানের সঙ্গে। মিঃ বিতাতের তত্ত্বাবধানে জনাছয়েক অ্যালজিরিয় বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ্ ও ইঞ্জিনিয়ারদের একটি দলও থাকছে।

তা ছাড়া প্রধান গাইড, সহকারি গাইড, হেড বাবুর্চি, সহকারি বাবুর্চি, খানসামা, উটের খিদমতগার, সইস প্রভৃতির মস্ত এক বাহিনী তো আছেই।

সাংঘাতিক অবস্থা আর কাকে বলে!

দিনের পর দিন মরুভূমির জলবায়ু, খাওয়া-দাওয়া, সাজ-পোশাক ও চলাফেরার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার কাজে ব্যস্ত আমরা নবাগতরা।

উটে চড়ে চলাফেরা করা যে কী আরামের, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে আন্দাজ করা যাবে না। আমরা যারা এখানে নবাগত, তাদের প্রত্যেককেই কমবেশি গা হাত-পা'র ব্যথায় ভুগতে হয়েছে কিছু দিন।

ভাবতে অবাক লাগে, সওয়াশো বছরের ওপর রাজত্ব করে গেল ফরাসিরা! অথচ সাহারা পার হবার মতো, তার অভ্যন্তরে চলাচলের জন্য কোনও রেলপথ বা পাকা মোটরসড়ক তৈরি হয়নি। সাহারার ভেতরে কিছুটা দূরের দু-চারটে মরুদ্যান-ঘাঁটি পর্যন্তই গেছে শুধু কিছু পাকা রাস্তা। অর্থাৎ শাসন ও শোষণ বজায় রাখার স্বার্থে নিতান্ত যেটুকু দরকার, তার বাইরে একপা-ও এগোয়নি ফরাসিরা। পদানত জাতির সাধারণ মানুষের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে কিছু করা হবে, বিদেশিদের কাছ থেকে এটা আশা করা সত্যিই আকাশকুসুম কল্পনা। যেটুকু রাস্তা করা হয়েছে, কয়েক বছরের মেরামতির অভাবে তা-ও আজ আর নির্ভরযোগ্য নেই।

তা ছাড়া মোটরে বা জিপে ওইসব মরুদ্যান পর্যন্ত গিয়েই বা আমাদের লাভ কী? তারপর তো সেই উটই ভরসা। আর সে সবের অর্থাৎ উটের বাহিনীর এবং গাইড, বাবুর্চি, খানসামা প্রভৃতির ব্যবস্থা করার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র হলো এই বিস্ক্রা। সাহারার অভ্যন্তরে এজাতীয় সুযোগ-সুবিধা কোথায়ও নেই।

কাজেই নির্দ্বিধায় এটা বলা যায় যে, সাহারায় দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হলে, উট ছাড়া আজো গতি নেই। উট দেখেছি আমরা সবাই। কিন্তু সাহারার মতো মরু দেশে না এলে উটের উপকারিতা ও অপরিহার্যতা ঠিকমতো কল্পনা করাও দুষ্কর। সে শুধু অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুই নয়, মরুর দুঃসহ গরম সহ্য করে বিনা জলে সে চলতে পারে দিনের পর দিন। এ ক্ষমতা আর কোনও পশুর নেই। মহামরুর বালুসমুদ্রের বুকে তাই এখনও একমাত্র নির্ভরযোগ্য ভারবাহী পশু হলো আপাত-কদাকার এই নির্বিরোধী শান্তশিষ্ট জীবটি।

প্রতিদিন সকালে প্রাতরাশ সেরে আমরা বেরিয়ে পড়ি উটের পিঠে। সামনে ধু-ধু করছে সাহারা। এদিকটায় বালির প্রকোপ কম। জমি পাথুরে। তার ওপর পড়েছে বালির আস্তরণ।

কাছে পিঠেই চক্কর মারি আর তাকাই সামনের দিকে। বুক দুরুদুরু করে। যতদূর দৃষ্টি যায়, দূরবীন দিয়েও দেখি—মানুষজন, পশুপাখি, গাছপালা, জীবনের কোনও চিহ্নই চোখে পড়ে না। কোথায় কোন অসীমে গিয়ে ঠেকেছে নিষ্করুণ মহামরুর বিস্তার, কে জানে!

আমাদের পরনে সার্টপ্যান্ট ছাড়াও তার ওপর এদেশি মরুযাত্রীদের মতো, চেপেছে সারা দেহ ও মাথা ঢেকে সুতির লম্বা সাদা কাপড় ও ঢিলে আলখাল্লা। খোলা শুধু চোখমুখ। তদুপরি মাথায় চেপেছে বিরাট টুপি, যথেষ্ট চওড়া তার বেড় বা কিনারা।

এরকম পোশাক ছাড়া এদিকার মরুভূমিতে দীর্ঘ সফরে বেরোনোর কথা চিন্তা করা নিরেট পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। তাতে জীবনান্ত হবার সম্ভাবনা ষোলোআনা। কারণ নিদারুণ সূর্যতাপ আর মরুভূমির অসম্ভব রকমের শুষ্ক রুক্ষ আবহাওয়া শরীরের আর্দ্রতা বা জলীয়

অংশ শুষে বা টেনে বের করে নেবার চেষ্টা করে। এ প্রক্রিয়াটা যদি নির্বিবাদে চলতে থাকে, জীবদেহ তা হলে অচিরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে, যার ফল অবধারিত মৃত্যু। তাই সূর্যকিরণ ও আবহাওয়ার সরাসরি হামলা থেকে শরীরকে রক্ষা করার জন্যেই এই অভিনব পোশাকের ব্যবস্থা।

গোড়ার দিকে উটের পিঠে চাপা কোহেনের কাছে ছিল এক মারাত্মক ব্যাপার। যতক্ষণ তার পিঠে সে থাকতো, সারা সময়টা টলমল করতো আর 'গেলুমরে মলুমরে' করে কাটাতো।

সেদিনও টইলে বেরিয়েছি আর পেছনে শুনছি কোহেনের হাউমাউ আর অশ্রাব্য গালিগালাজ। হঠাৎ এক সময় সে গেঙিয়ে উঠলো,—ও চৌধুরী শুনছো, বলি এই অখাদ্য জ্যান্ত ঢিবিটার কোন নরকে জন্ম হয়েছিল, বলতে পারো?

বলতে-বলতে বোধহয় একটু ব্যালান্স হারিয়ে ফেলেছিল, মুহূর্তে শুরু হলো তার 'বাবারে মারে'। খানিক পরেই আবার সে খেঁকিয়ে উঠলো,—বলি ও চৌধুরী, মুখে কুলুপ এঁটে আছো কেন বাপ? বলতে পারো, কোন হারামজাদা এই অশ্লীল ভূতটাকে চড়ার কাজে লাগিয়েছিল? একটু দাঁড়াও না, বাপু। অত তড়বড় করে এগোচ্ছো কেন? আমার এই বাদশাজাদা বদমাশটাও হয়েছে তেমনি—এক পা এগোয় তো দু-পা হটে যায়! এই ছুঁচো, হট্-হট্...হাট্-হাট্...হিট্-হিট্...হুট্...হুট্...হেট্-হেট্...

আমি অপেক্ষা করি। কোহেন কাছে আসতেই বলি,—তোমার ব্যাপারটি কি বলো তো? এই উটে চড়েই যখন আমাদের সাহারার গভীরে ঢুকতে হবে, তখন চড়াটা রপ্ত করার চেষ্টা করবে, না সারাক্ষণ হাউমাউ খিস্তিখেউড় করে কাটাবে, কোন্‌টা করণীয় বলতে পারো? শান্ত মিষ্টি স্বভাবের এই জীবটিকে কোথায় ভালবাসবে, তা না অবিশ্রান্ত গালাগালি করে তার ভূত ছাড়াচ্ছো। এটা কি ঠিক? ভুলে যাও কেন যে, এ জীবটি ছাড়া এখানে গতি নেই।

ধমক খেয়ে কোহেন গুম্ হয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর ছোট্ট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে সহজ কণ্ঠে বললে,—বড্ড খাঁটি কথা বলেছো, চৌধুরী। ওটা শোনার আমার খুবই দরকার ছিল। হ্যাঁ, আমাকেই ভালোবাসতে হবে আমার এই বাহনটিকে। বুঝলে চৌধুরী, এইজন্যেই তোমাকে আমার এত ভালো লাগে। সত্যিকার বন্ধুর কাজই তুমি করো।

খানিকক্ষণ আবার সে চুপচাপ। আড়চোখে দেখি, হাত বাড়িয়ে উটটার পিঠে সাবধানে হাত বোলানোর চেষ্টা করছে। শেষে একসময় দাঁত বার করে ফ্যাকফ্যাক করতে করতে সে বললে,—গোসা করো না চৌধুরী, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। বলতে পারো, সৃষ্টিছাড়া এই জীবটা কি সৃষ্টির গোড়া থেকেই এ এলাকার মানুষকে এভাবে সেবা করে আসছে?

না। —আমি বলি, উট যে গোড়ায় বুনো ছিল, তা মোটা বুদ্ধিতে বোঝা যায়। তবে নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না, কবে কোথায় কিভাবে বুনো উটকে পোষ মানানো হয়েছিল। সম্ভবত তিন হাজার বছরেরও বেশি আগে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার মরু-এলাকায় ঘটেছিল ব্যাপারটা। সে যাই হোক, যবে বা যেখানেই ঘটে থাকুক এটা, তার ফলে মরুবাসী মানুষ যে কতভাবে উপকৃত হয়েছে, তা বলার কথা নয়। যুগ-যুগান্ত ধরে মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়েছে নানা কাজে সাহারার মতো মরুভূমিতে যাতায়াত করা।

উটে বসে চরতে বেরোলেই চোখে পড়ে উটের পিঠে মেষপালক বা পশুপালকদের। ছাগল, মেষ বা ভেড়ার বড়-বড় পাল চরাতে বেরিয়েছে তারা।

তাদের অনেকেই যাযাবর—পরিবারপরিজন নিয়ে সারাজীবন তাঁবুতেই কাটায়।

তাঁবুতেই রান্নাবান্না, ঘর-সংসার, সবকিছু। যখন যেখানে মেলে পশুর খাদ্য ও জল, সেখানে গিয়ে তারা তাঁবু খাটায়।

তাদের অনেকের হয়তো গ্রামাঞ্চলে কিছু চাষের জমি আছে। কারো হয়তো ডেরা আছে কোনও মরুদ্যানে। মরশুমের সময় সেখানে তারা চাষাবাস করে, ফসল ফলায়। কিন্তু সাধারণত সংবৎসরের খোরাক জোটে না। কাজেই আবার বেরিয়ে পড়ে উট, ছাগল ও ভেড়ার পাল নিয়ে। আবার শুরু হয় যাযাবর জীবন। সাহারায় সীমান্ত-অঞ্চলে শুধু নয়, যাযাবর পশুপালকদের দেখা যায় মহামরুর অভ্যন্তরেও। দল বেঁধে তারা বাস করে, চলাফেরা করে। কোন ঋতুতে কোথায় জন্মায় পশুখাদ্য ঘাসপাতা-ঝোপঝাড়, কোথায় মেলে জল, সে-সব তাদের নখদর্পণে। সে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে চলে আসছে বংশ পরম্পরায়।

অতীতে অনেক যাযাবর দল ছিল। তাদের প্রধান পেশা ছিল পশুপালন নয়—লুটপাট ডাকাতি। সুযোগ পেলেই তারা দলবদ্ধভাবে মরুদ্যানগুলোয় হামলা লুটপাট চালাত, চড়াও হতো মরুযাত্রী ব্যবসায়ী দলের ওপর। মাঝখানে তারা বেশ দমিত হয়েছিল। কিন্তু অ্যালজিরিয়ার বর্তমান পরিবর্তনের যুগে, শোনা যাচ্ছে, তারা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে সাহারার দূরবর্তী অঞ্চলে।

প্রায় রোজই দেখি পশুপালকদের ছাগল ভেড়ার পাল নিয়ে চরাতে যেতে। ইচ্ছে করে, তাদের সঙ্গে আলাপ করি, শুনি তাদের যাযাবর জীবনের টিকে থাকার বিচিত্র হাসিকান্নার ও সংগ্রামের কাহিনী। কিন্তু উপায় নেই। ভাষার ব্যবধান দুস্তর। এ এলাকার পশুপালকদের মাতৃভাষা আরবি, আর কোনও ভাষা জানে না। আর আরবি ভাষায় আমি তো একজন প্রথম শ্রেণীর মহামূর্খ। এখানে কোথায় পাবো এমন কাউকে, যে আমার জন্যে দোভাষীর কাজ করবে?

দুঃখ হয়, পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ প্রাচীন ভাষা আরবি, তা শেখার সময় বা সুযোগ আমার আজো হলো না।

চ তু র্থ অ ধ্যা য়

॥ এক ॥

তখনও ভোর হয়নি। আকাশ একটু-আধটু ফরসা হচ্ছে কেবল।

বিছানা ছেড়ে আমি লাফিয়ে উঠলাম। বিস্‌ক্রায় আজ আমাদের শেষরাত—শেষ হয়ে এলো।

মনের মাঝে অবিরাম গুঞ্জরণ উঠছে, বন্দরের কাল হলো শেষ। যাত্রা শুরু করো যাত্রীদল।

শিরায় শিরায় যেন রক্তের নাচন শুরু হয়েছে। শুনতে পাচ্ছি বৃহত্তমের আহ্বান—সাহারা ডাকছে।

বাইরে থেকে কানে আসছে বহুজনের কণ্ঠস্বর।

বাইরে এসেই চোখ আমার ছানাবড়া! বিরাট চত্বরটা আলোয় আলোময়! আরেব্বাস, কত উট! এদেশি লোকজনে গিজগিজ করছে সমস্ত চত্বরটা। মালপত্র বাঁধাছাঁদা চলছে।

আমাদের কেউ কি আছে ভিড়ের মধ্যে? এগিয়ে যাই।

সামনেই মিঃ বিতাত। অত্যন্ত ব্যস্ত। কাজকর্মের তদারকি করছেন। বিভিন্ন জনকে কাজের নির্দেশ দিচ্ছেন।

আমি শুভেচ্ছা-অভিবাদন জানাই,—সুপ্রভাত, মিঃ বিভাত।

আমাকে দেখেই শুভ্র হাসি ছড়িয়ে পড়ে তাঁর মুখে। আবেগের সঙ্গে করমর্দন করতে-করতে বলেন,—সুপ্রভাত ডঃ চৌধুরী, সুপ্রভাত।

একটু এগোতেই দেখা হয় ডঃ নিকল্‌সনের সঙ্গে। বিভিন্ন সব মূল্যবান যন্ত্রপাতি বাঁধাছাঁদার কাজ তদারক করছেন। তাঁকে শুভেচ্ছা-অভিবাদন জানিয়ে ধীরে-ধীরে এগিয়ে যাই।

জিনিসপত্র সবই প্রায় বাঁধা শেষ। অল্প কিছু বাকি বাঁধার অপেক্ষায়।

কিছুদূরে গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে আছেন মিঃ গর্ডন। আমাদের জড়ো-করা মালপত্রের দিকে তাঁর লক্ষ্য। আমাকে দেখেছেন মনে হলো।

এগিয়ে গিয়ে পাশ থেকে সহাস্যে আমি শুভেচ্ছা জানাই,—সুপ্রভাত, বিগ্রেইডিয়ার গর্ডন।

সঙ্গে সঙ্গে কটমট তাকানো ও কড়া গলার জবাব এল,—সুপ্রভাত, ডঃ চৌধুরী।

আমি থতমত খেয়ে গেলাম, এ আবার কী!

সামলে নিতে একটু সময় লাগে। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম,—এটা কী হলো?

সঙ্গে-সঙ্গে চড়া মেজাজের পালটা প্রশ্ন,—কোন্‌টা?

আমি আরও ঘাবড়ে যাই। সমস্ত ব্যাপারটাই অদ্ভুত রহস্যময় ঠেকছে। আড়ষ্ট গলায় বলি,—এই যে ডক্টর-ফক্টর?

মালপত্রের দিকে চোখ রেখে হুংকার ছাড়লেন মিঃ গর্ডন,—তেমনি অন্যেও বলতে পারে, এই যে ব্রিগেইডিয়ার-ফ্রিগেইডিয়ার।

এবার আমি হেসে ফেললাম। মন হালকা হয়ে গেছে। সহজ কণ্ঠে বললাম,—বাঃ! তখন তো আপনি ছিলেন তাঁবুসঙ্গী ও পরীক্ষার্থী। আর এখন পূর্ণ মর্যাদায় স্বপদে অধিষ্ঠিত। বাইরের লোকের সামনে সে সম্মান তো আপনাকে আমার অবশ্যই দেখানো উচিত।

হুঁ, অপর পক্ষও তো ঠিক একই যুক্তি দেখাতে পারে।—বলতে-বলতে ফেটে পড়লেন মিঃ গর্ডন, অতি ঘনিষ্ঠ আপনজন পরিবার-পরিজন যদি এই যুক্তি দেখিয়ে সর্বসমক্ষে ব্রিগেইডিয়ার ডক্টর ইত্যাদি ডাকতে থাকে তো খুব আনন্দ হবে, তাই না? যুক্তরাষ্ট্রের মরুভূমি দুটো থেকে ফেরার পরপরই তোমার ব্যবহারের এই আমূল পরিবর্তন আমার কাছে খুবই সুখকর ঠেকার কথা, কি বলো? শুধু পুথিগত পাণ্ডিত্য আর বৈজ্ঞানিক কাণ্ডজ্ঞান থাকলেই হয় না, মানবিক-ব্যবহারিক কাণ্ডজ্ঞানটাও দরকার, বুঝলে!

আমি ভাষা হারিয়ে ফেলি।

আবেগে উত্তাল ভেতরটা—জন্মভাগা আমি... দুনিয়ার পথে পথে যেখানেই গেছি, দূর হয়েছে নিকট-অতিনিকট, পর হয়েছে আপন—অতিআপন। অন্তর-উজার-করা স্নেহমমতা-ভালোবাসায় সবাই বাঁধতে চেয়েছে আমাকে। আজ আবার তারই পুনরাবৃত্তি।

স্তব্ধ নির্বাক আমি, নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকি। এলোমেলো ভেতরটাকে বাগে আনতে পারছি নে। কথাও বলতে পারছি নে।

শেষে একসময় মিঃ গর্ডনের ডান হাতটা দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম। আবেগে গলা কাঁপছে। কোনরকমে বললাম,—আমাকে ক্ষমা করুন। আমি বুঝতে পারি নি। আজ থেকে আপনি আমার বড়ভাই—দাদা।

সাহারার প্রান্তে তখন ভোর হচ্ছে। সেই আলো-হাসি ছড়িয়ে পড়ে মিঃ গর্ডনের মুখে। আমাকে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বিচিত্র সাজপোশাকে সজ্জিত হয়ে প্রাতরাশ সেরে প্রস্তুত হয়ে নিচেয় জড়ো হয়েছি সবাই। এবার যাত্রা হবে শুরু।

সামনের খোলা জায়গায় উষ্ট্রবাহিনীর বিরাট সমাবেশ। দুটো দলে দেখছি তাদের ভাগ করা। শুনলাম, উট দু-জাতের—মালটানা উট আর সওয়ারি উট। সওয়ারি উট শুধু সওয়ার বয়, মাল বয় না। এ দু-জাতের মধ্যে নাকি যথেষ্ট তফাত। সওয়ারি উট তুলনায় বেশি দ্রুতগামী ও চটপটে, বুদ্ধিও তাদের বেশি।

আমাদের চোখে অবিশ্যি কোনও পার্থক্যই ধরা পড়ে না। সব উটকে দেখছি সমান হৃষ্টপুষ্ট, প্রাণবন্ত ও চকচকে। প্রত্যেকটার পিঠের কুঁজও সমান পুরুষ্টু ও শক্ত।

সইস বা তদবিরকারকদের নির্দেশে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে মালটানা উটগুলো। বোঝা চাপানো হচ্ছে তাদের পিঠে।

আমাদের জানমাল সবকিছু—যন্ত্রপাতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, দানাপানি, তাঁবু-তৈজসপত্র এবং আনুষঙ্গিক যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী সবই ওই সমস্ত বোঝার মধ্যে। যন্ত্রপাতির একগাদা লটবহর ছাড়াও মানুষ ও উটের এই বিরাট বাহিনীর জন্যে যে আয়োজন, সে কি চাট্টিখানি কথা—সে এক সাংঘাতিক এলাহি ব্যাপার!

আমাদের চোখে সবই নতুন, সবটাই আজব। প্রতিটি উটের পাশে দুজন লোক—মালের বোঝাটা দু-দিকে ধরে আলগোছে বসিয়ে দিচ্ছে উটের পিঠে। শুনলাম, বোঝা তৈরিতেও রয়েছে কেরামতি। লম্বাটে আকারে হিসেব করে এমনভাবে সেগুলো বাঁধা হয়েছে যাতে তার দু-দিকে সমান ভারী হয়। বোঝা চাপালে উটের পিঠের দু-দিকে যাতে সমান ওজন পড়ে, তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। প্রতিটি বোঝার ওজন মোটামুটি ৩৫০ পাউন্ডের মতো। দূর মরুপথে সাধারণত এর বেশি ওজন চাপানো হয় না উটের পিঠে।

চটপট মাল উঠছে, দড়ি দিয়ে বাঁধাছাদাও চলছে চটপট।

এবার সওয়ারি উটের পালা। আমরা চেপে বসলাম—এক-একটার পিঠে এক-একজন করে।

পাশাপাশি তিনটে লাইনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় উটগুলোকে। প্রতিটি লাইনে ষাটটা করে উট। মাঝের লাইনটা, বলতে গেলে, মালবোঝাই উট দিয়েই তৈরি। তাদের বাকিগুলি পাশের দুই লাইনে রয়েছে। তাদের আগে-পিছে রয়েছে সওয়ারি উট।

অ্যালজিরিয়ার উষ্ট্রারোহী বা উটসওয়ার সৈনিকরা কিন্তু লাইনে নেই। বাইরে থেকে সবদিক পাহারা দেওয়াই তাদের কাজ।

উটসওয়ার এই সৈনিকদের বাহিনী অ্যালজিরিয়ায় সাধারণত 'সাহারা বাহিনী' নামে পরিচিত। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এরা, বিশেষভাবে পারদর্শী মরুযুদ্ধে। তাদের দাপটে সাহারায় একসময় হামলা-লুটপাট-ডাকাতি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছিল।

পনেরোজনের এই দলের অধিনায়ক মেজর এম. বেলকাসেম সামরিক বিভাগের একজন বিচক্ষণ অফিসার। মিঃ বিতাতের মাধ্যমে যেমন এ অভিযানের সঙ্গে যুক্ত অ্যালজিরীয় বিজ্ঞানী-ইঞ্জিনিয়ার-প্রযুক্তিবিদ্‌দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তেমনি পরিচিত হই মেজর বেলকাসেমের সঙ্গেও। বেশ আলাপী ভদ্রলোক—ফরাসি ভালোই জানেন। তাঁর কাছে শুনি সাহারার ডাকাতদের সঙ্গে মোকাবিলার রোমাঞ্চকর নানা অতীত কাহিনী।

॥ দুই ॥

সাহারা! তার গভীরে ঢুকছি আমরা। পাশাপাশি উটের তিন লম্বা লাইন চলেছে দুলে-দুলে। একটার পেছনে আর একটা—সার বেঁধে। ঘণ্টায় তাদের গতি বড় জোর আড়াই থেকে তিন মাইল।

লাইনের কুড়িটা করে উট রয়েছে এক-একজন সইস বা তদবিরকারকের জিম্মায়। এই কুড়িটে উটের প্রত্যেকটার নাকে আটকানো এক আংটার সঙ্গে দড়ি বাঁধা। সেই দড়ি আবার বাঁধা রয়েছে তার ঠিক সামনের উটটার জিনের সঙ্গে। এমনি করে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা কুড়িটা উট। একেবারে সামনেটার নাকের দড়ি ধরে তদবিরকারক চলছে আগে আগে। গলায় তার মিষ্টি গানের সুর। আর সেই গানের তালে-তালে পেছনে আসছে ওই কুড়িটা উট।

সুবিশাল সাহারার কোনও-কোনও এলাকায় এই গান গেয়ে উট চালানোর ধারা চলে আসছে সুদূর কোন অজানা কাল থেকে। কোনও-কোনও জায়গায় উটের গলায় ঘণ্টা বাঁধা থাকে। উটের চলার সময় সেই ঘণ্টা বাজতে থাকে টুং-টাং টুং-টাং, আর সেই মিঠে আওয়াজে চলে উটের সারি।

এই কুড়িটা উটের তদবির-তদারকির সব দায়িত্বই যে এ তদবিরকারক লোকটার ওপর, তা বোধহয় না বললেও চলে। উটগুলোকে ঠিকমতো দানাপানি দেওয়া, চলতে-চলতে কোনও উটের পায়ে খুরের তলা ছড়ে গেলে বা বোঝার ভারে কোনওটির গায়ে একটু ঘা হলে, সেখানে পট্টি দেওয়া ইত্যাদির দায়িত্বও এই লোকগুলোর। তা ছাড়া উটের পিঠে হিসেব করে বোঝা চাপানো, বিশ্রামের সময় সেসব আবার নামিয়ে নেওয়া, কাফেলা যখন বিশ্রাম করে, তখন নানা ফাইফরমাশ খাটা ইত্যাদি কাজও করতে হয় এদের। এরা খুবই গরিব সন্দেহ নেই। তবে আমাদের দেশের জনসংখ্যার যে প্রায়-অর্ধেক মানুষ আজো দারিদ্রসীমার নিচে রয়েছে, তাদের চেয়ে নিঃস্ব বুভুক্ষু কিনা, বলা দুষ্কর। ওটা তর্কের ব্যাপার।

আমরা চলেছি তো চলছিই। আর হাড়ে হাড়ে মালুম করছি, সাহারা কাকে বলে! পায়ের তলার জমি পাথুরে, তার ওপর বালির আস্তরণ—তেতে আগুন হয়ে আছে। প্রায় দুপুর। মাথার ওপর ধোঁয়াটে আকাশ থেকে মার্তণ্ডদেবের অগ্নিবর্ষণের সীমা নেই। সেইসঙ্গে চরম শুষ্ক রুক্ষ আবহাওয়া। মাঝে-মাঝে দম যেন আটকে আসে। সময়-সময় যখনই বাতাস বইছে, কষ্টটা বেড়ে যাচ্ছে কয়েকগুণ। বাতাস তো নয়, আগুনের হলকা যেন। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত কখনও-সখনও পাতাপল্লবহীন দু-চারটে কাঁটা গাছ নজরে পড়েছে। এখন আর তাও নেই। চারদিকে খাঁ-খাঁ করছে। এক প্রাণহীন নিঃসঙ্গ কবরস্থান যেন।

সাহারায় চলতে চলতে বারেবারে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছি, 'গাইড' কথাটার অর্থ কী? আমাদের যিনি গাইড, তাঁর নাম আহ্‌মেদ তালেব। ফরাসি জানেন কিছু কিছু। বয়সে বৃদ্ধ হলে কি হয়, দেহে তাঁর এখনও যৌবনের শক্তি! সাহারা যেন এই ভূয়োদর্শী অভিজ্ঞ মানুষটির নখদর্পণে! ভয়ংকর এ মহামরুকে তিনি ভালোবেসেছেন প্রাণ দিয়ে।

পথহীন মহাপ্রান্তরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া তাঁর সর্বপ্রধান কাজ হলেও, তালেব সায়েবের কাছে কিন্তু ওটাই একমাত্র কাজ নয়। তাঁর কথাবার্তা, কাজকর্ম দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, গন্তব্যস্থলে পৌঁছোনো পর্যন্ত এ সফরের নিরাপত্তাদি সবকিছুর নৈতিক দায়-দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত বলে তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। তাই সাহারায় তাঁর কথাই আইন, তাঁর

হঠাৎ আমি হেসে ফেলি। রিচার্ডকে বলি,—দেখছো। ওই দেখো কাণ্ডটা।

আমার নির্দেশ মতো সেদিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে রিচার্ড বলতে গেলে গেঙিয়েই উঠলো,—আরে তাইতো! কী তাজ্জব ব্যাপার! লোকগুলো করছে কি অ্যাঁ? বাসন-কোসন, 'ধুচ্ছে', গাত-হাত-পা 'সাফা' করছে জল দিয়ে নয়, বালি দিয়ে? কী, কাণ্ড রে বাবা!

বিচিত্র এই জলীয় ব্যাপার নিয়ে দুজনে কথা হচ্ছে, হঠাৎ দেখি, হন্তদন্ত হয়ে আসছে ফার্গুসন ও হ্যারিংটন। ফাগুর্সন হাঁক পাড়লে,—এই যে চৌধুরী, তোমার দেখা মিললো। খুঁজে-খুঁজে হয়রান। এই দঙ্গলের মধ্যে খুঁজে পাওয়াও এক সমস্যা।

কাছে এসে হ্যারিংটন বললে,—শোনো চৌধুরী, আমরা এক সমস্যায় পড়েছি। এতদিন যা জেনে এসেছি আর আজ সাহারায় এসে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তাতে কোনও মিলই নেই, দুইয়ের মধ্যে আশমান-জমিন ফারাক।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। —ফার্গুসন বাধা দেয়, উটগুলোকে জল খেতে দেওয়া হচ্ছে দেখে আমার তো গালে মাছি যাবার জোগাড়। হ্যারিংটনকে বললাম, দেখছো কাণ্ড, বিদ্ঘুটে জানোয়ারগুলোকে জল খেতে দেওয়া হচ্ছে! অথচ চিরকাল শুনে আসছি, ওরা নাকি পেটের ভেতরকার থলিতে জল জমিয়ে রাখে, মাসের পর মাস তাই বিনা জলে মরুভূমিতে চলতে পারে। এখন তো দেখছি জলের ভাঁড়ার ওরাই সাবাড় করবে। হ্যারিংটনের চোখেও—

উহুঁ, থামো। —হ্যারিংটন দাবড়ি মারে, বুঝলে চৌধুরী, ব্যাপারটায় আমি তাজ্জব বনে যাই। পেটের থলিতে নয়, আমি শুনেছি পিঠের ওই কুঁজে ওরা জল জমায়। কিন্তু সব ধারণাই তো ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে। একটু দূরেই ছিলেন ডঃ নিকল্‌সন্। খুব ব্যস্ত। সমস্যাটা একটু শুনেই বললেন, তোমরা ডঃ রাসেলের কাছে যাও, সব খোলসা হবে। দেখছো তো আমার অবস্থা। তা—

এবার ফার্গুসন থামালে হ্যারিংটনকে,—তারপর ডঃ রাসেলকে খুঁজছি, দেখা হলো ব্রিগেইডিয়ার গর্ডনের সঙ্গে। সব শুনে তিনি বললেন, তা তোমরা ডঃ চৌধুরীর কাছে যাচ্ছো না কেন? এ ব্যাপারে সে-ই বোধহয় সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি।

আমিই এবার বাঁধা দিই,—তা তোমরা বিগ্রেইডিয়ার গর্ডনকে কেন জিজ্ঞেস করলে না সমাধানটা?

করেছিলাম তো। —ফার্গুসন বলে, মুচকি হেসে উনি বললেন, ধুৎ আমি হলাম মিলিটারিম্যান, মাস্টারি কি আমার পোষায়? মরুকগে, এখন বলো তো চৌধুরী, ব্যাপারটা কী?

আমি তখন ভাবছি মিঃ গর্ডনের কথা। অদ্ভুত নিরহঙ্কারী একটি মানুষ। সবসময় ব্যস্ত নিজেকে লুকিয়ে রাখতে।

হ্যারিংটন তাড়া দেয়,—কি হলো চৌধুরী? আবার যে রওনা হবার সময় হয়ে এল।

আমি সজাগ হয়ে উঠি। বললাম,—তোমাদের দুটো ধারণাই ভুল। পেটের মধ্যে বা কুঁজে জল জমানোর কোনও ব্যবস্থাই উটের নেই। প্রয়োজনে জল সে নিজের শরীরের মধ্যেই তৈরি করে।

অ্যাঁ, বলো কী!—বিস্মিত ওরা তিনজনই।

হ্যাঁ,—ধীর কণ্ঠে আমি বলি, একটু লক্ষ্য করলে দেখবে, উটগুলোর কুঁজ এখন কিরকম

পুরুষ্টু ও শক্ত। উপযুক্ত খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো পাওয়ায় ওই কুঁজে তারা চর্বি জমিয়েছে প্রচুর পরিমাণে। প্রতিকূল অবস্থায় খাদ্য ও জল যখন দুষ্প্রাপ্য হয়, তখন এই সঞ্চিত চর্বির ভাণ্ডারকে তারা কাজে লাগায়। চর্বি তখন দেহের পুষ্টির জন্যে খাদ্য যোগায় এবং জারণ-ক্রিয়ার মাধ্যমে তা থেকে তৈরি হয় জল। ফলে দিনের পর দিন জল না খেয়ে সে থাকতে পারে। একাদিক্রমে ১৭ দিন না খেয়ে উট বেঁচে থেকেছে, এমন ঘটনাও আছে।

ওদের তা হলে জল খেতে দেওয়া হচ্ছে কেন? —ফার্গুসন উত্তেজিত।

—কারণ খাদ্য ও জল কোনওটাই এখন অমিল নয়। প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলার জন্য যে চর্বির ভাণ্ডার, তাতে কেন এখন হাত দেওয়া হবে? তবু লক্ষ্য করে দেখো, অত বড় প্রাণী কত অল্পে তুষ্ট, কত সামান্য জলে খুশি।

কয়েক মিনিট গুম হয়ে থাকে হ্যারিংটন। তারপর ভাবিত কণ্ঠে বলে,—সত্যি, সাহারার কল্যাণে কাণ্ডজ্ঞান যে কিভাবে বাড়ছে, কহতব্য নয়।

পরক্ষণে হুইস্‌ল্‌ বেজে উঠলো।

আবার রওনা হলাম আমরা। বর্হিদৃশ্যের সেই একই একঘেয়েমি সবদিকেই। আবহাওয়ারও সেই একই প্রচণ্ড তাপ ও রুক্ষতা। নির্মেঘ ধোঁয়াটে আকাশের নিচে রিক্ত নিঃস্ব এক নিস্তব্ধ ভয়াল দেশের ভেতর দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি।

দিন শেষ হয়ে আসছে। ক্লান্তিতে উটের পিঠে বোধহয় একটু ঝিম এসেছিল। হঠাৎ মিঃ গর্ডনের গলা কানে এল,—পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখো, চৌধুরী।

চমকে সেদিকে তাকাতেই স্তব্ধ হয়ে গেলাম, এ কি অপূর্ব দৃশ্য! দিনমণি পাটে নামছেন। রঙের খেলা শুরু হয়েছে সারা পশ্চিমাকাশ জুড়ে। রঙ পালটাচ্ছে ঘন ঘন। রঙের সমুদ্রের ঢেউ উঠছে যেন। বর্ণের বৈচিত্রে, সুষমায় ও সমারোহে মহিমাময় সে দৃশ্যের তুলনা হয় না। অনির্বচনীয়। কী এক গভীর তৃপ্তি ও প্রশান্তিতে দেহমন যেন জুড়িয়ে গেল।

আমাদের তাঁবু পড়লো সন্ধ্যার ঠিক আগেই। আর তার পরেই মনে হলো, সাহারাও বুঝি বিশ্রামের তোড়জোড় করেছে। দ্রুত কমে আসছে তার দেহের তাপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃদুমন্দ বাতাসে রাতের সাহারা হয়ে উঠলো স্নিগ্ধ মনোরম। কোথায় উবে গেছে তার সেই দুঃসহ তাপ। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সেদিন বুঝলাম—দিনের সাহারা চরম ভয়ংকর, নরকের মতো উত্তপ্ত যন্ত্রণাদায়ক। আর রাতের সাহারা পরম রমণীয়, স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা আরামপ্রদ।

উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরছি। হঠাৎ এক তাঁবুর পাশ থেকে কানে এল স্যামুয়েলের মিহি গলা, বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে এতে অবাক হবার কি আছে? রাতে সাহারা ঠাণ্ডা তো হবেই। প্রথমত স্থলভাগের তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা কম, উপরন্তু তা চূড়ান্ত শুকনো হলে তো কথাই নেই; দ্বিতীয়ত আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক ও স্বচ্ছ এবং তাতে আর্দ্রতা বা জলীয় বাষ্প প্রায় না থাকার মতো। ফলে তাপ দ্রুত উবে তো যাবেই। অনেক মরুভূমিতেই এটা ঘটে।

দ্বিতীয় জনের গলা শোনা গেল,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। আর মাস্টারি ফলাতে হবে না।

মনে হলো হ্যারিসনের গলা—ডেভিডদের দলের এক পাণ্ডা।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে স্যামুয়েল বললে,—তা যদি জানতে তো ওসব অলৌকিক-ফলৌকিকের কথা বলছিলে কেন?

॥ তিন ॥

তিন দিন কেটে গেছে।

সাহারার বুকে সূর্যাস্তের মতো সূর্যোদয়ও অপরূপ—অতুল—অনির্বচনীয়। কিন্তু তা শুধু অল্পক্ষণের জন্যই। তারপরেই সাহারা যেন খেপে আগুন হয়ে উঠতে থাকে। তাই সূর্যাস্তের পরবর্তী সাহারার সঙ্গে সূর্যোদয়ের পরের সাহারার পার্থক্য আকাশপাতাল।

কাফেলার চলার বিরাম নেই। এ পর্যন্ত আমরা ছাড়া দ্বিতীয় আর একটা প্রাণী চোখে পড়ে নি। আকাশে একটা পাখি দেখি নি। মাটিতে সচল একটা পোকা নড়ে নি। সরু একটা সবুজ ডাঁটা বা এককণা সবুজ ঘাস, তাও না। চারদিকে শুধু মৃত্যুর নিস্তব্ধতা। প্রচণ্ড রোদের তাপে ও গরমে ঝলসানো শুষ্ক রুক্ষ নিষ্প্রাণ এক অপার্থিব মহাপ্রান্তরের ভেতর দিয়ে যেন চলেছি আমরা। সে চলাও বুঝি অন্তহীন।

গতকাল দুপুরের পর থেকে পাথুরে জমি শেষ হয়ে শুরু হয়েছে বালি। যেদিকে তাকাও, শুধু বালি আর বালি—নিস্তরঙ্গ এক অকূল বালুসমুদ্র। কোন্ এক ডাইনি মায়ায় সে সমুদ্রের ছোট-ছোট ঢেউগুলো যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে। দূর দিগন্তের দিকে তাকালে মনে হয়, অকল্পনীয় বিরাট আকারের এক ধোঁয়াটে রঙের নৈসর্গিক কড়াই বা গামলা যেন উপুড় করে বসানো রয়েছে সুবিশাল এক গেরুয়া রঙের স্তব্ধ সমুদ্রের ওপর। আর সে কড়াই বা গামলার মাথায় প্রায় মাঝখানে ভাঁটার মতো দাউদাউ করে জ্বলছে বিশাল এক আগুনের কুণ্ড।

মাঝে-মাঝে বাতাস বইছে—আগুনের হলকা যেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে বালি উড়ছে আগুনের ফুলকির মতো।

উঃ, কী পিপাসা! সারা সাহারা জুড়ে আগুন জ্বলছে যেন। দূরে বায়ুস্তর কাঁপছে, তার চেহারা বদলাচ্ছে ক্ষণেক্ষণে। সময় সময় তাকে দেখাচ্ছে ঘষা কাচের তরল স্রোতের মতো।

ক্ষণেকের জন্যে বোধহয় একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ রিচার্ড, ডেভিড ও ম্যাকডোনাল্ডের জয়ধ্বনি কানে যেতে চোখ তুলে সামনের দিকে তাকাতেই চমকে উঠলাম—অ্যাঁ! মরূদ্যান।

হ্যাঁ, দূরে দেখা যাচ্ছে সেই পরমাকাঙ্খিত দৃশ্য—এক ছায়াশীতল রমণীয় মরূদ্যান।

হঠাৎ তালেব সায়েবের দিকে চোখ পড়লো। বৃদ্ধ নির্বিকার, মাথা নাড়ছেন শুধু। তেমনি নির্বিকার এদেশি লোকেরাও। ডঃ নিকল্‌সনের গলা কানে এল,—না, না, উত্তেজিত হয়ো না। ও মরূদ্যান নয়—মরীচিকা। দূরের কোন মরূদ্যানের প্রতিচ্ছবি বাতাসে জেগে উঠেছে।

ডেভিড, কোহেন, রিচার্ড, হ্যারিসন সবাই যেন আর্তনাদ করে উঠলো,—অ্যাঁ মরীচিকা! সবই অলীক মায়া মরীচিকা।

ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে সে মায়া মরূদ্যান।...

কাফেলা চলেছে। ভর দুপুর। কাফেলা তবু থামে না। কী হলো? আজ তাঁবু পড়বে না?

হঠাৎ দূরে—বহু-বহু দূরে চোখে পড়ে সরু কালো কিসের একটা রেখা যেন। দূরবীনে চোখ লাগাই—হ্যাঁ, বনময় একটা জায়গা মনে হচ্ছে। কী ওটা? মরূদ্যান?

তালেব সায়েবের দিকে তাকাই। চোখে চোখ পড়তেই তিনি মাথা নাড়লেন, অর্থাৎ হ্যাঁ, মরূদ্যান।

সমস্ত কাফেলার, বিশেষ করে আমরা যারা বিদেশি তাদের মধ্য দিয়ে যেন বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল। চঞ্চল হয়ে উঠেছে বুঝি উটগুলোও। তাদের গতি বেড়ে গেছে।

তারপর যখন সেই মরূদ্যানে এসে পৌঁছালাম, তখনকার সে আনন্দ ভাষায় ব্যক্ত করার নয়। প্রাণহীন নিস্তব্ধ ভয়ালতার মধ্যে মরূদ্যানটি যেন জীবনসঙ্গীতে মুখরিত নয়নাভিরাম এক অপরূপ নন্দনকানন।

মরূদ্যানটি আকারে একেবারে ছোট নয়। লম্বায় প্রায় তিন মাইল, চওড়ায় মাইল দুয়েকের মতো। দুটি গ্রামে বারব্যার ও আরবজাতির লোকদের বাস। উট ও ভেড়ার পাল চরছে এখানে-ওখানে। ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি, হুটোপুটি করছে। আর দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত মেয়েপুরুষ সবাই।

রুক্ষ দুস্তর প্রাণহীন সাহারার বুকে সবচেয়ে মনোরম এই সবুজ মরূদ্যানগুলো। সাহারায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। এমন অঞ্চলও আছে যেখানে পাঁচ বছরে/দশ বছরে হয়তো একবার বৃষ্টিপাত হয়। আবার এমন এলাকাও আছে, যেখানে দু-তিন পশলা বৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয়। সে যাই হোক, তাই বলে গোটা সাহারাই কিন্তু জলহীন নয়। বহু অঞ্চলে ভূগর্ভ দিয়ে অন্তঃসলিলা ছোট বড় স্রোতস্বিনী বয়ে গেছে। কোনও-কোনও জায়গায় সে জল আপনা থেকে ওপরে উঠে আসে। কোথাও বা তাকে ওপরে তোলা হয়। জলের জাদুস্পর্শ পড়তেই তাকে কেন্দ্র করে মাটিতে প্রাণের স্পন্দন জাগে, বন্ধ্যা মাটিতে দেখা দেয় সবুজের সমারোহ, জন্ম নেয় মরূদ্যান।

মরুমৃত্তিকার উর্বরা শক্তি সত্যিই বিস্ময়কর। যেখানেই জল মেলে, সেখানটাই ফুলেফলে ও প্রাণের প্রাচুর্যে বিকশিত হয়ে ওঠে গোলাপের মতো।

মরুদ্যানের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো খেজুর গাছ। প্রকৃতিজাত সবচেয়ে পুষ্টিকর খাদ্যগুলির মধ্যে এই খেজুর অন্যতম—মিষ্টত্বেও অতুলনীয়। খেজুর আমাদের ধান বা গমের সমতুল বা তার চেয়েও পুষ্টিকর।

কিন্তু শুধুই কি খেজুর? সাহারার এইসব মরূদ্যানের উর্বর মৃত্তিকায় খেজুরবীথির ঘন পাতার ছায়ায় জন্মায় খরমুজ, কমলা, কাপাস, তামাক, পিচ, ডালিম, জনার, যব এবং নানাজাতের শাকসবজি।

এখানে দেড়দিন-দু-রাত বিশ্রামের পর ক্লান্তি ও অবসাদ কেটে গেল। জল আর খাবারের ভাঁড়ার পূর্ণ করে আবার যাত্রা শুরু হলো আমাদের।

আবার সেই একঘেয়ে দৃশ্য—নিস্তরঙ্গ গেরুয়া বালির সমুদ্র।

মরূদ্যানটি ছেড়ে আসার তৃতীয় দিন সকালের দিকে কিছুদূর এগোতেই নজরে পড়লো এক নতুন দৃশ্য। শুরু হয়েছে বালিয়াড়ি—ছোট-বড় বালির পাহাড়। যত এগোচ্ছি, ততই বাড়ছে তাদের সংখ্যা। কোনও-কোনওটা বেশ উঁচু—আট নশো ফুটের কম তো নয়ই।

নতুন এই দৃশ্য দেখতে-দেখতে এগোচ্ছি সবাই। কানে আসছে কোহেন আর হ্যারিংটনের গলা। বালিয়াড়িগুলোর উচ্চতা নিয়ে তাদের মধ্যে তর্ক বেধেছে।

হঠাৎ এক দমকা হাওয়া বয়ে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গে চমকে উঠলাম সবাই। কানে আসছে এক গানের সুর, তার সঙ্গে বাজনাও।

বিজন মরুর বুকে গানবাজনা! সন্ত্রস্ত সচকিত অনেকেই। হ্যারিংটন ও কোহেনের গলা আর শোনা যাচ্ছে না। পেছন থেকে কনর‍্যাডের কাঁপা-কাঁপা গলা কানে এল,—এ কী ভুতুড়ে ব্যাপার রে, বাবা!

আপনারা ঘাবড়াবেন না। —তালেব সায়েবের উচ্চকণ্ঠ কানে আসে, এটাকে আমরা বলি 'বালির গান' বা বালির বাজনা।

পরক্ষণে চিৎকার করে বললেন ডঃ নিকল্‌সন্,—হ্যাঁ ভয়ের কিছু নেই। হাজার হাজার বালিয়াড়ির গা বেয়ে বালুকণার বিপুল স্রোত গড়িয়ে নামার কালে ঘর্ষণে সময় সময় এই আওয়াজের সৃষ্টি হয়। তারপর এইসব আওয়াজের সঙ্গে তাদের প্রতিধ্বনি যুক্ত হয়ে—

ডঃ নিকল্‌সনের কণ্ঠস্বর ডুবে গেল। ততক্ষণে শুরু হয়েছে তুলকালাম কান্ড। চারদিকে ভয়ংকর গর্জন—কান পাতা দায়। গোটা সাহারা জুড়ে যেন হাজার-হাজার ঢাক-ঢোল-দামামার তালে-তালে যুদ্ধের নাচ জুড়ে দিয়েছে। আর তার ভেতর দিয়ে এগোচ্ছি আমরা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছি তো চলেইছি। প্রচণ্ড রোদের অসহ্য দাবদাহে সিদ্ধ হতে হতে যেন অন্তহীন প্রাণহীন নরকের ভেতর দিয়ে চলেছি গুটিকয়েক প্রাণী।

বালি আর বালিয়াড়ি—বালিয়াড়ি আর বালি। বালিসমুদ্রের যেমন শেষ নেই, তেমনি বালিয়াড়িরও সীমাসংখ্যা নেই। তারই মধ্য দিয়ে নীরবে চলেছে আমাদের কাফেলা। সবাই যেন বোবা হয়ে গেছে।

হঠাৎ এক নতুন উৎপাত শুরু হলো। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা যে ভয়ংকর বিপদ হয়ে দেখা দেবে, তা কে ভাবতে পেরেছে! জোরে বাতাস বইতে শুরু করেছে, আর সেই বাতাসে উড়তে শুরু করেছে বালির মেঘ।

বিষম কাণ্ড! সাহারার দৃশ্যপট পাল্‌টাচ্ছে মুহুর্মুহু, বর্হির্দৃশ্যে রূপান্তর ঘটছে ক্ষণে ক্ষণে। এই যেখানে বালিয়াড়ি দেখছি, জোর হাওয়ায় পরক্ষণে তা উড়ে যাচ্ছে, অন্য জায়গায় তৈরি হচ্ছে নতুন বালিয়াড়ি। নিস্তরঙ্গ-নিষ্প্রাণ বালির সমুদ্রে যেন জীবনের চাঞ্চল্য জেগেছে। বালির ঢেউ উঠছে সাগরের বুকে।

তালেব সায়েবের চোখেমুখে গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ। বললেন,—আপনারা হুঁশিয়ার থাকবেন। সদা-পরিবর্তনশীল এই অশান্ত বালুময় অঞ্চলকে আমরা দেশি ভাষায় বলি 'ফেশ-ফেশ' এলাকা। বাতাস উঠলে এ এলাকা অনেকসময় বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।

হাওয়ার বেগ ক্রমেই বাড়ছে। দেখতে দেখতে যা শুরু হলো, তাকে প্রলয়তাণ্ডব বললেও অত্যুক্তি হয় না। সবদিকে শুধুই ধুলোবালির মেঘ। বালির মাঝে উটের পা ডুবে যাচ্ছে হাঁটু পর্যন্ত। দূরে দৃষ্টি চলে না। বাতাসের শাঁ-শাঁ শব্দ আর বালির গর্জনে কানে তালা লাগার অবস্থা। তবু তারই মধ্যে তালেব সায়েবের নির্দেশে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এগোতে হচ্ছে কাফেলাকে।

শেষপর্যন্ত এক উঁচু জায়গায় এসে পৌঁছোলো কাফেলাটি, তালেব সায়েবের নির্দেশে দাঁড়িয়ে পড়লো সেখানেই। হঠাৎ বহুদূরে উত্তর-পূব কোণের দিকে নজর পড়তেই আমি শিউরে উঠলাম! হলুদাভ ঘনকালো ছোট একখণ্ড মেঘ ধেয়ে আসছে। পলকে পলকে তা ক্রমেই বড় হচ্ছে।

আমার গলা চিরে বেরিয়ে এল আতঙ্ক-চিৎকার,—ভয়ংকর দানব! বালির মেঘ—

কিন্তু তালেব সায়েবের চিৎকারে ডুবে গেল আমার কণ্ঠস্বর। চিৎকার করতে-করতে তিনি ছুটছেন। ছুটছেন ডঃ নিকল্‌সন্ এবং মিঃ গর্ডন,—ঝড়! বালির ঝড় আসছে! শুয়ে পড়ো, উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো! উঠগুলোকে বসিয়ে দাও, তাদের পেছনে মাথা ঢেকে কনুইয়ে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ো এখনি!...

বালির নিচে কতক্ষণ চাপা পড়ে ছিলাম, খেয়াল নেই। ধাক্কা খেয়ে কবর ফুঁড়ে উঠে দাঁড়ালাম একসময়। সবাই উঠলো। উটগুলো আগেই উঠে পড়েছে। ঝড়-বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। সাহারা শান্ত।

তালেব সায়েবের দক্ষ পরিচালনায় খুব অল্পের জন্যে এবার আমরা রেহাই পেয়ে গেছি। ঝড়ের আগে ওই উঁচু জায়গায় যদি সময়মতো পৌঁছোতে না পারতাম, তা হলে নিচু জায়গায় বিরাট বালিস্তূপের নিচে চিরকালের মতো কবর হতো আমাদের। সে জীবন্ত সমাধি থেকে বাঁচার কোনও পথই ছিল না।

॥ চার ॥

দিনের পর রাত—রাতের পর দিন... কত দূর? আর কত দূর? পথের যেমন শেষ নেই, তেমনি শেষ নেই বুঝি যন্ত্রণারও। মাঝে-মাঝে ভয় হয়, গন্তব্যস্থলে শেষ পর্যন্ত পৌঁছোতে পারবো তো?

ইতিমধ্যে আরো দুটো মরূদ্যান আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। শেষ মরূদ্যান পার হবার পর তিন দিন কেটে গেছে।

দিন গড়িয়ে চলেছে দুপুরের দিকে।

হঠাৎ দূরে বহুদূরে দেখা গেল, সামনের দিক থেকে কী যেন এগিয়ে আসছে পিঁপড়ের সারির মতো। দূরবীন তুলে নিলাম, দীর্ঘ দুই কাফেলার সারি। কারা ওরা?

তালেব সায়েবের দৃষ্টি চিন্তাকুটিল, ওরা লুঠেরা ডাকাত নয়, ব্যবসায়ি। কিন্তু ওভাবে ছুটছে কেন?

আমাদের কাফেলা ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তালেব সায়েব, মিঃ বিতাত, মেজর বেলকাসেম, ডঃ নিকল্‌সন্ এবং ব্রিগেইডিয়ার গর্ডনের মধ্যে দ্রুত পরামর্শের পর আবার এগোই আমরা—তবে সম্পূর্ণ সশস্ত্র অবস্থায়। মেজর বেলকাসেম তাঁর সৈন্যদের নিয়ে থাকেন কাফেলার সামনে।

নবাগত কাফেলাটি এসে পৌঁছোলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। ব্যবসায়ীদের এক বিরাট দল, আসছে দক্ষিণ থেকে। আতঙ্কে পালাচ্ছে তারা। আতঙ্কের কারণটা বড় সাংঘাতিক। আমরা এখন যে মরূদ্যানটির দিকে যাচ্ছি, ওরাও সেখানে যাচ্ছিল দানাপানি ও বিশ্রামের প্রয়োজনে। কিন্তু পথে খবর পায়, বেলাইদ ডাকাত দলবল নিয়ে রওনা হয়েছে ওই মরূদ্যানটি লুঠ করতে।

তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচিত কয়েকটি মেষপালকদলের কাছ থেকে একের পর এক—একই খবর পেয়ে তারা নিশ্চিত হয় যে, খবরে কোনও ভুল নেই। বেলাইদ এ এলাকার নামকরা ডাকাত—যেন, দুর্ধর্ষ, তেমনি নিষ্ঠুর। তার দলের লোকসংখ্যা বোধহয় জনা চল্লিশেকের কম হবে না।

ব্যবসায়ীরা জোর দিয়ে জানাল যে, মরূদ্যানবাসীরাও জেনেছে খবরটা। একেবারে গোড়ায় তারা ঠিক করেছিল, বাধা দেবে। কিন্তু পরে বেলাইদের নাম শুনে সে মতলব ত্যাগ করেছে। তারা আপস করবে।

ব্যবসায়ীদের বক্তব্য অনুযায়ী তালেব সায়েব হিসেব করে দেখলেন, বেলাইদ ডাকাত মরূদ্যানটি থেকে এখনও খুব কম করেও ঘণ্টা চারেকের পথ দূরে আছে।

ব্যবসায়ীরা আর দাঁড়াল না। আমাদের কাছ থেকে কিছু দানাপানি জোগাড় করে যে মরূদ্যানটি আমরা পেছনে ফেলে এসেছি, রওনা দিল সেদিকে।

এবার দেখা গেল, বৃদ্ধ তালেব সায়েবের আর এক রূপ। কঠিন সংকল্পে পালটে গেছে তাঁর চোখমুখের চেহারা। আজ মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করলাম—তাঁর কাছে সাহারাকে ভালোবাসা মানে বালি-পাথরকে ভালোবাসা নয়, ভালোবাসা তার শান্তিপ্রিয় নির্বিরোধী বাসিন্দাদের অ্যালজিরিয় সাহারার প্রতি। মরূদ্যান ও তার বাসিন্দাদের চেনেন তিনি, চেনেন নিরীহ পশুপালকদের। ওদের তিনি ভালোবাসেন নিজের জনের মতো। ওরাও তাঁকে বিশ্বাস করে, ভালোবাসে প্রাণ দিয়ে।

ডাকাতদের সঙ্গে মোকাবিলার পুরো ছকটাই তিনি ইতিমধ্যে মনে-মনে ঠিক করে ফেলেছেন। বৈঠকে সেটা একবাক্যে মেনে নিলেন সবাই।

ছকটা হলো—দুটো দলে ভাগ হয়ে এখুনি রওনা হবো আমরা। মেজর বেলকাসেম তাঁর সৈন্যদল নিয়ে গোপনে চলে যাবেন ডাকাতদের পেছনে। কোন্ পথে কিভাবে যাওয়া সুবিধাজনক, তারও খুঁটিনাটি নির্দেশ দিলেন তালেব সায়েব। আর আমরা যাব মরূদ্যানটিতে। তবে ঢুকবো তার পেছন থেকে বা পশ্চিম দিক থেকে, যাতে বেলাইদ ডাকাত টের না পায়। একটু তাড়াতাড়ি করলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাবো। আমাদের সঙ্গে ডাকাতদের যখন মুখোমুখি সংঘর্ষ চলবে, তখন পেছন থেকে তাদের অতর্কিতে আক্রমণ করবেন মেজর বেলকাসেম। বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, কোনও ডাকাত যাতে পালাতে না পারে।

কিছু খাবার-দাবার ও জল নিয়ে সৈন্যদল সহ রওনা দিলেন মেজর বেলকাসেম। উট যে এত জোরে ছুটতে পারে, এই প্রথম দেখলাম। সত্যি, তাজ্জব বনতে হয়।

রওনা দিলাম আমরাও।

তার আগে তালেব সায়েবকে প্রাণভরা শ্রদ্ধা জানাতে যেতেই বৃদ্ধ আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ডঃ নিকল্‌সন্ এবং মিঃ গর্ডনকেও দেখা গেল তালেব সায়েব সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত।

রাইফেলটা কোলে নিয়ে উটে চেপে বসলাম। কোথায় উবে গেছে আমার ক্লান্তি ও অবসাদ!

সামনে লড়াই।...